প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস
৩/৫ আসফ আলী রোড
নয়াদিল্লী ১

প্রকাশক
শ্রী এন ভেঙ্কু আয়ার
রিজিওনাল ম্যানেজার
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

আঞ্চলিক অফিস
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট
বোম্বাই ১

৩৬এ মাউণ্ট রোড
মাদ্রাজ ২

বি-৩/৭ আসফ আলী রোড
নয়াদিল্লী ১

মুদ্রক
শ্রীচিত্তজিৎ দে
অরোরা প্রিণ্টার্স
৫৭ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা ১২

বিষয়সূচী

কলকাতার মন

যে মন নিয়ে যোব চার্নক সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন ক'রে ভবিষ্যৎ কলকাতা মহানগরের ভিত্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মন হল পাশ্চাত্ত্য বণিকের সজাগ ব্যবসায়ী মন। নিরাপদ বাণিজ্যে আর্থিক মুনাফার হিসেব ছাড়া কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মনে সেদিন আর কোনো মানবিক সুচিন্তা উদ্ভাসিত হয়নি। জন্মকালের এই মনই কলকাতা শহরের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে পরিপুষ্ট ও পাকাপোক্ত হয়েছে। ১৬৯০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিনশ বছরে এই অর্থলোলুপ বণিকের মন পুঁজিবাদীর গর্বোদ্ধত ভঙ্গিমায় আকাশস্পর্শী হয়েছে কলকাতা মহানগরে। কলকাতার মানুষের মনের কেন্দ্রস্থ চিন্তা ও অনুধ্যান আজ টাকা এব আজ মানবিক সাংস্কৃতিক গুণাগুণের যাচাই হয় টাকার কষ্টিপাথরে। মহানাগরিক জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হল টাকা। টাকা সচল তাই মানুষও সচল। এমনকি মানবহৃদয়ের যে সমস্ত আবেগ অনুভূতি ভাবানুভাব ও সহজবৃত্তিকে আমরা শাশ্বত সত্য বলে জানতাম এতদিন সেগুলিও আজ টাকার চাকচিক্যের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। স্নেহ মায়ামমতা প্রেম ভালবাসা শ্রদ্ধাভক্তি সমস্ত মানবিক হৃদয়বৃত্তিকে বণিকের মনোবৃত্তি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। ডালহৌসি চৌরঙ্গির প্রশস্ত রাজপথ ও স্কাইস্ক্রেপার থেকে নগরপ্রান্তের অখ্যাত অলিগলি বস্তি এবং শহরতলির সুদূর আনাচকানাচ পর্যন্ত এই বণিকবৃত্তির নির্লজ্জ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। চার্নকের দেশী ও বিদেশী উত্তরাধিকারীরা সমস্ত কলকাতা মহানগরকে ধীরে ধীরে এক বিশাল বাণিজ্যকুঠিতে পরিণত করেছেন এবং মহানগরের মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন বাণিজ্যের বেচাকেনার পণ্যরূপে।

কলকাতা শহরকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে দেখেছেন কিপলিঙ তাঁর কবিকল্পনায়—'as the fungus sprouts chaotic from its bed, so it spread'—কিন্তু এর অনেকটাই কল্পনা, ঐতিহাসিক সত্য নয়। বণিকের লাভলোকসানের মানদণ্ডে কলকাতার দাঁড়িপাল্লা নিঃসন্দেহে লাভের দিকে বেশি ঝুঁকেছিল, তাই চার্নক ও কোম্পানির কর্তারা কলকাতায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন ক'রে তার জমিদারিস্বত্ব কেনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। তিনদিকে গড়খাইয়ের মতো নদীবেষ্টিত এবং সমুদ্রের কাছাকাছি এরকম সুরক্ষিত বাণিজ্যবন্দর উত্তরভারতে দুর্লভ ছিল। তাছাড়া সোনার বাংলার অফুরন্ত সম্পদের আকর্ষণও নেহাত কম ছিল না। কাজেই কলকাতাকে কিপলিঙের ভাষায় 'chance-erected' বলা যায় না, তবে তাঁর কথার এইটুকু সমর্থন করা যায় যে 'palace, byre, hovel, poverty and pride side by side'—এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে কলকাতার নাগরিক রূপায়ণ হয়েছে এবং এই একই বৈশিষ্ট্য আজও কলকাতার মেট্রোপলিটন মহাবিকাশপর্বে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু এই রূপায়ণের মধ্যেও কোনো দৈবক্রমের ব্যাপার নেই ববং পরিকল্পনাই আছে এবং সবচেয়ে বেশি আছে বাণিজ্যতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বিধাগ্রস্ত যাত্রাপথের স্থূল পদচিহ্ন। কেবল কলকাতার বহিরঙ্গেই যে আছে তা নয়, তার মানসতার মধ্যেও এই স্থূলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

কলকাতার আদিপর্বে ইংরেজরা কেবল বণিক ছিলেন না, অধিকন্তু জমিদারও ছিলেন। কোম্পানির প্রতিনিধিদের মধ্যে 'জমিদার' পদে একজন ইংরেজ কর্মচারী অভিষিক্তও হতেন। এই জমিদারবণিকের মিশ্রমন আঠের শতকের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত কলকাতা শহরে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের এই অবাঞ্ছিত পরিণয়ের সামাজিক ফলাফল হয়েছে ভয়ানক শোচনীয়। এদেশের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অনেক উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা নতুন নগরমুখী জনজোয়ারের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়েছে। গোবিন্দরাম মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোকুল ঘোষাল, রামদুলাল দে, মদন দত্ত এবং আরো যাঁরা তখন কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে এসেছেন, তাঁরা বেনিয়ানি মুচ্ছুদ্দিগিরি ব্যবসাবাণিজ্য যাই করুন না কেন, তাতেই কমবেশি কৃতকার্য হয়েছেন এবং ধনদৌলতের অধিকাংশ হয় সামন্তসুলভ প্রমোদমত্ততায় অথবা জমিদার হবার বাসনা চরিতার্থের জন্য ব্যয় করেছেন। সামন্তযুগের প্রেতাত্মা তাঁদের সকলের স্কন্ধে ভর করেছে। তাঁরাই হয়েছেন নতুন কলকাতা শহরে আদিপর্বের অভিজাতশ্রেণী। এই অভিজাতদের সঙ্গে শিক্ষাসংস্কৃতির বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তখনকার ইংরেজ শাসকরাও আকৃতিতে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি স্থূল ছিলেন। ইংরেজদের সামাজিক ইতিহাসের একজন পণ্ডিত বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে প্রধানত দু'রকমের ইংরেজ দেখা

যেত, একরকম **robust** ও **boorish** টাইপ, আরএক রকম **thin** ও **quizzical** টাইপ। এই রোবাস্ট ও বুরিশ টাইপের ইংরেজদের মধ্যে একদল এদেশে আসেন কোম্পানির অধীনে রাইটার ফ্যাক্টরের চাকরি নিয়ে প্রধানত ভাগ্যের জুয়াখেলা খেলতে। জুয়াখেলায় জিত হয় যাঁদের তাঁরা প্রচুর ধনসঞ্চয় ক'রে স্বদেশে ফিরে যাবার পর সাধারণের কাছে 'নবাব' (**Nabobs**) নামে পরিচিত হন। বাস্তবিক এদেশে তাঁরা নবাবই ছিলেন এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে এখানকার নবাবি অভ্যাস ও মেজাজ ছাড়তে পারেননি। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি ব্যঙ্গসাহিত্যের এঁরা ছিলেন অন্যতম নায়ক। মানসিক সম্পদ এঁদের এমন কিছু ছিল না যা দান করবার যোগ্য। অবশ্য অর্থলোভ ছিল আর অমার্জিত প্রভুত্ববোধ ছিল এবং এগুলি এদেশের নতুন উপপ্রভুশ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছুটা সংক্রমিত হয়েছিল। তবে তার চেয়েও বেশি বোধহয় আমাদের এদেশীয় মানসভাব প্রভাব পড়েছিল ইংরেজদের উপর। তাঁরা এদেশের বাঈজীনাচ, হাতির লড়াই, মুরগির লড়াই, দুর্গোৎসবে ভোজ তামাশা থেকে আরম্ভ ক'রে হুঁকো গড়গড়ায় তামাক খাওয়া পর্যন্ত শিখেও ছিলেন আর আমরা কিছু কিছু ইংরেজি খানাপিনায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম মাত্র। উভয়ের মধ্যে তখন হৃদ্যতা ও মেলামেশা বেশ প্রাণখোলা ছিল যা দুই পক্ষই রোবাস্ট ও বুরিশ টাইপ হলে হয় তাই। ওদিকে ক্লাইভের যুগ এদিকে গোবিন্দরাম নবকৃষ্ণের যুগ। মুর্শিদাবাদ তখনো বাংলার রাজধানী আর বাংলার সংস্কৃতির মণিকেন্দ্র নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা। এই নবাবদরবার ও জমিদার-রাজসভার মানসিক প্রতিচ্ছবি হল আঠের শতকের কলকাতা কালচার।

কলকাতা শহরকে নতুন রাজধানী করার পরিকল্পনা ক'রে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে যে পত্র লেখেন (নভেম্বর ১৭৭৫) তাতে বলেন যে কলকাতা রাজধানী হলে অনেক দিক থেকে সুফল ফলার সম্ভাবনা আছে। কলকাতার জনসংখ্যা বাড়বে, ধনসম্পদ বাড়বে, এবং তার ফলে কি হবে?

> 'Which will not only add to the consumption of our most valuable manufacture imported from home but will be the means of conveying to the native a more intimate knowledge of our customs and manners and of conciliating them to our policy and Government'

হেস্টিংস-এর এই উক্তির তাৎপর্য গভীর। বেভারেজ ও কারমিঙ্গার-এর কথাই ঠিক যে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে যদি কলকাতার পত্তন ক'রে থাকেন যোব চার্নক, তাহলে হেস্টিংস 'political capital' হিসেবে কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র অর্থাৎ 'রাজধানী' হল কলকাতা হেস্টিংসের আমল থেকে। কোর্ট কাছারি আফিস সব কলকাতায় স্থাপিত হল, আর 'ইংলিশ' আইন অনুযায়ী বিচার আরম্ভ হল এবং এই

ইংরেজি আদালতের কাজকর্মের তাগিদে কিছু কিছু ইংরেজি ভাষার চর্চাও শুরু হল। তাকে ঠিক ইংরেজি শিক্ষা বলে না কারণ দু'তিন কুড়ি ইংরেজি শব্দ শিখতে পারলেই তখন কাজ চলে যেত। কেবল আদালতের কাজ নয়, তখনকার ইংরেজ শাসক ও বণিকদের সঙ্গে মেলামেশার কাজও তাতে চলে যেত। ইংরেজি শিক্ষার উপর ইংরেজরাও তখন কোনো মর্যাদা আরোপ করতেন না। বরং হেস্টিংস-এর আমলে এদেশীয় সংস্কৃত ফার্সী চর্চার মর্যাদা ছিল। উইলকিন্স, জোন্‌স, কোলব্রুক, ফরবিস, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, এঁরাই ছিলেন এই আমলের মর্যাদাবান ব্যক্তি, বিদ্যার দিক দিয়ে। বিত্তের দিক থেকে অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল ইংরেজদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড় বড় বাঙালি বেনিয়ান মুনশি দালাল গোমস্তা ও সরকারদের। ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালিদের মনের বা অভিরুচির বা শিক্ষাসংস্কৃতির কোনো পার্থক্য বিশেষ ছিল না এবং যেটুকু ছিল তাতে উভয়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব তেমন রচিত হয়নি। দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসতার দিক থেকে দুই পক্ষই ছিলেন বোরাস্ট ও ব্যারিশ টাইপ।

আঠার শতকের ইংরেজরা নিজেদের দেশে ইংলণ্ডে যে 'fuddling and punch-drinking', 'club and coffee-house boosing'-এর জন্য 'shortened their lives and enlarged their waistcoats'—বাংলাদেশের কলকাতা শহরেও ঠিক তাই না করলেও অনেকটা তাই করে তারা মেদবৃদ্ধি করেছেন এবং অকালমৃত্যুও বরণ করেছেন। কলকাতার পুরনো গোরস্থানে গেলে তার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌবাজার লালবাজার খিদিরপুর অঞ্চলে অনেক ট্যাভার্ন গজিয়ে উঠেছিল এবং হারমনিক ট্যাভার্নের মতো কয়েকটি ট্যাভার্ন বিখ্যাত হয়েছিল কোম্পানির ভিআইপিদের নিয়মিত সঙ্গলাভে। কিন্তু আশ্চর্য হল এই যে আঠের শতকের কলকাতার নামজাদা নেটিভ বাবুরা এই সব ট্যাভার্নে যাতায়াত করতেন না অথবা এই ধরনের কোনো প্রকাশ্য স্থানে সুরাপানাদি সহযোগে ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। অন্তত এই মেলামেশার কোনো সংবাদ কোথাও পাওয়া যায় না। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ, ভূকৈলাসের গোকুল ঘোষাল বা জয়নারায়ণ ঘোষাল, হাটখোলার মদন দত্ত, সিমলার রামদুলাল দে, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বা মল্লিকরা কেউ যদি এইসব ট্যাভার্নে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তাহলে উইলিয়াম হিকির মতো প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁদের স্মৃতিকথায় নিশ্চয় এবিষয়ে কিছু না কিছু লিখতেন। অথচ তখনকার এইসব বড় বড় বাঙালি বেনিয়ান বাবুরা ও রাজামহারাজারা নানাবিধ কাজকর্মে সর্বদাই ইংরেজদের সান্নিধ্য লাভ করতেন এবং দোলদুর্গোৎসবে নিজেদের গৃহে খানাপিনা ও নৃত্যগীতের আসরে ইংরেজদের সাদরে আহ্বান করতেন।

কিন্তু পাবলিক ট্যাভার্নের প্রমোদকক্ষে পদার্পণ করতে নেটিভ বাবুরা সাহস করতেন না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ সাহসী ছিলেন, বিশেষ ক'রে অর্থ উপার্জনের ফন্দিফিকির উদ্‌ভাবনে তাঁদের সমকক্ষ ধুরন্ধর ইংরেজরাও ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহলে ভয়টা তাঁদের কিসের ছিল?

ভয়টা হল সমাজের ভয়। কোম্পানির ডেপুটি-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র, পলিটিক্যাল বেনিয়ান মহারাজা নবকৃষ্ণ, ব্যবসায়ী বেনিয়ান রামদুলাল ও মদন দত্তের মতো দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদেরও একটি ভয় ছিল মনে—সমাজভয় এবং তারই সঙ্গে জড়িত ধর্মভয়। এই 'সমাজ' কোন্ 'সমাজ'? নবযুগের কোনো নতুন সমাজ নয়, পুরাতন সমাজ। মধ্যযুগের সমাজ। যাবতীয় বিধিনিষেধ সংস্কারকুসংস্কার টোটেমট্যাবু ইত্যাদি নিয়ে মধ্যযুগের সমাজ কলকাতা শহরে আঠের শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে বাহ্যত মধ্যযুগ ও নবাবী আমল অস্ত গেলেও, অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব তখনো ম্লান হয়নি। অর্থনীতিক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাণিজ্যিক বাধাবিপত্তি সামান্য কিছুটা অপসারিত হলেও, আধুনিক শিল্পায়নের কাজ আরম্ভ হয়নি। বিজ্ঞানের আলো সমাজের ও মনের বদ্ধ জানালা ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করেনি। কলকাতার মন পুরোদস্তুর তখন মধ্যযুগের অন্ধকারে বন্দী। যেমন ছিল কলকাতার মন তেমনি ছিল কলকাতার দৈহিক গড়ন। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক মাস আগে (৭ এপ্রিল ১৭৫৭) কলকাতার ইংরেজ জমিদার—'all Weavers, Carpenters, Bricklayers, Smiths, Tailors, Braziers etc. Handicraft, shall be incorporated into their respective bodies, one into each district of the town'—এই মর্মে এক দীর্ঘ ফতোয়া জারি করেন। ফতোয়ার বক্তব্য হল এই যে ছুতোর কামার কুমোর মিস্ত্রি দর্জি তাঁতি প্রভৃতি কারুবর্গ কলকাতার বিভিন্ন নির্দিষ্ট পাড়ায় স্বতন্ত্র বৃত্তিগত গোষ্ঠী হিসেবে বাস করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন ক'রে 'চৌধুরী' (headman) ও প্রত্যেক পাড়ায় একজন ক'রে 'মণ্ডল' থাকবে। এ হল পুরাতন গ্রাম্যসমাজকে পুরোপুরি কলকাতা শহরের উপর চাপানোর ব্যবস্থা। আঠের শতকের মধ্যে এই ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তার চিহ্ন আজও কলকাতায় রয়ে গিয়েছে। দর্জিপাড়া কাঁসারিপাড়া শাঁখারিপাড়া বেনিয়াটোলা পটুয়াটোলা ইত্যাদি আঞ্চলিক নামের মধ্যে তার চিহ্ন আছে। ইংরেজরা তখন কলকাতার 'জমিদার' এবং তাঁদের প্রসাদপুষ্ট উদীয়মান ও মধ্যগগনে উদ্দীপ্ত এদেশী অভিজাতশ্রেণী বিদেশী ফিউডাল লর্ডের 'ভ্যাসাল' ছাড়া কিছু নন। মন তাঁদের সামন্তযুগ থেকে একপাও অগ্রসর হয়নি।

পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন : 'There was no 'European Third' in the 18th century'—অর্থাৎ ইংরেজরা তখন এদেশের হিন্দুমুসলমানের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি শাসকশ্রেণী মনে ক'রে দূরে সরে থাকতেন না। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমল পর্যন্ত ইংরেজ-ভারতীয়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ববোধ তেমন সজাগ ছিল না। আসলে তখন এই চৈতন্যবোধের উদয় হয়নি। কর্নওআলিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ক'রে কেবল যে এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক নতুন এক হঠাৎ-অভিজাত জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন তাই নয়। তার সঙ্গে শাসকশাসিতের সামাজিক দূরত্ববোধও জাগিয়ে তুলেছিলেন এদেশের লোককে সরকারী কাজকর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রে। উনিশ শতকের অভ্যুদয়ে ওয়েলেসলি এলেন খাঁটি 'ইমপিরিয়াল' মেজাজ নিয়ে। তাঁর চালচলন হাঁকডাক ও জাঁকজমকে এই উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেল। লাটভবনে এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও উৎসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন। শাসকশাসিতের সামাজিক দূরত্ব তাঁর আমলে আরো প্রসারিত হল। এই দূরত্ব দেখে শ্রীমতী গ্রাহাম ১৮১০ সালে কলকাতায় এসে অবাক হয়ে লিখেছিলেন :

> The distance kept up between the Europeans and the natives…is such that I have not been able to get acquainted with any native family… Every Briton appears to pride himself on being outragoously a John Bull.

এই সময় থেকে ইংরেজরা সমাজমঞ্চে 'empire-builder'-এর উদ্ধত ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ালেন। এই ভঙ্গি তার পর থেকে প্রত্যেক লাটসাহেবই বজায় রেখে চলতেন, কেবল বেন্টিঙ্কের মতো দু'একজন কিছুটা ভিন্নপ্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু সেই প্রকৃতি লাটসাহেবদের ব্যক্তিগত মর্জির উপর নির্ভর করত এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার বলেই তা গণ্য হতো, সাম্রাজ্যশাসননীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এই শাসকোচিত মনোভাব ছাড়াও আরো একটি কারণে ইংরেজভারতীয়ের সম্পর্ক এই সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ইংরেজরা সপরিবারে এদেশে আসতে আরম্ভ করেন। যাঁরা সপরিবারে আসেন তাঁদের সঙ্গে আগেকার ফ্যাক্টর রাইটার ইণ্টারলোপারদের জীবনযাত্রার পার্থক্য অনেক। পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনে ইংরেজরা প্রধানত মেমসাহেবদের তাগিদেই কলকাতার সমাজের মধ্যেই পৃথক একটি অর্গলবদ্ধ আঞ্চলিক সমাজ গড়ে তোলেন। চৌরঙ্গির মতো স্বতন্ত্র ইংরেজপাড়ার প্রতিষ্ঠা হয় এই সময়। ইংরেজসমাজ এদেশীয় সমাজের মধ্যে 'rigid' ও 'insular' হয়ে থাকে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের পথ বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায়। নবাবি আমলের প্রতিনিধি নবকৃষ্ণদের যুগও শেষ হয়ে যায়। নতুন পথ খুলে যায় অন্যদিক থেকে। ইংরেজিভাষার ও ইংরেজিশিক্ষার উপর নতুন এক সামাজিক আভিজাত্য

এই সময় থেকে আরোপিত হতে থাকে। ইংরেজরাই এটি আরোপ করেন এবং যে মনোভাব থেকে করেন তাকে 'ইম্পিরিয়াল' মনোভাবেরই আর একদিক বলা যায়। সংস্কৃত ফার্সি ও প্রাচ্যবিদ্যার বদলে ইংরেজি ও পাশ্চাত্যবিদ্যাচর্চা আরম্ভ হয়। বাঙালী হিন্দুরা এই বিদ্যাচর্চার সুযোগ নেন এবং নতুন সামাজিক মর্যাদার বিদ্যালব্ধ মানদণ্ড সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে ওঠেন। সমাজের একটা বড় অংশ মুসলমানসমাজ এই সুযোগ রাজনৈতিক কারণেই সেদিন নিতে চাননি। কলকাতায় পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠানের (এবং ভারতবর্ষেও প্রথম) নাম দেওয়া হয় 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭)। নবযুগের বাংলার ট্র্যাজিডি হল এই যে এদেশের হিন্দুরা যে শিক্ষায়তন থেকে পাশ্চাত্যবিদ্যা আয়ত্ত ক'রে যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত ও উদারমতাবলম্বী হয়ে ওঠেন বলে দাবি করেন, সেই বিদ্যালয় কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের পরিচালকদের মধ্যে রাধাকান্ত গোপীমোহন রাধামাধবের মতো অধিকাংশই ছিলেন গোঁড়া হিন্দুয়ানির সমর্থক। তাঁদেব এই হিন্দুয়ানি প্রচণ্ড আক্রোশে হিন্দু কলেজের উদারধর্মী শিক্ষক ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের মাথার উপরে ফেটে পড়ে। সেই ফাটার শব্দে সমগ্র হিন্দুসমাজ সচকিত হয়ে ওঠে। তখনো হিন্দুসমাজের অভিভাবক ছিল 'ধর্মসভা', যেমন বর্তমানে আছে 'হিন্দুমহাসভা' ও 'জনসংঘ'। নব্যশিক্ষিত হিন্দু তরুণদের যুক্তিবাদ ও উদারতার বিরুদ্ধে সেদিন খড়্গ ধারণ কবেছিল 'ধর্মসভা'।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে ইউরোপীয়দের 'তৃতীয় দল' তৈরি হল এবং তার পাকাপোক্ত বনিয়াদও প্রতিষ্ঠিত হল। চৌরঙ্গি হল কলকাতা শহরে নতুন ইউরোপীয় কালচারের 'আইল্যাণ্ড'। প্রথম ও দ্বিতীয় দলের হিন্দুমুসলমানরা তার চারিদিকে ছড়িয়ে রইল। নতুন ইংরেজিবিদ্যা ও বিত্তের মানদণ্ডে নতুন সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতে থাকল। কেন্দ্রস্থল থেকে তৃতীয় দল ইংরেজরা এদেশের দুই দল হিন্দু ও মুসলমানদের নতুন সামাজিক মর্যাদার সোপানে ওঠানো নামানোর ঐতিহাসিক সুযোগ পেলেন। রাজনৈতিক অভিমানে ও অপমানে মুসলমানরা স্বভাবতঃই তখন ক্ষুব্ধ ও ইংরেজদের সাহচর্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। হিন্দুদের, অন্তত হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্তদের, এই ক্ষোভ ও অশ্রদ্ধার কোনো কারণ ছিল না। তাঁরা পূর্ণমাত্রায় তাই এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে বিত্ত ও বিদ্যা দুই দিক দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে সামাজিক মর্যাদার উপরের ধাপে দ্রুত উঠে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানেরা অনেক পিছনে পড়েছিলেন। সমাজের শ্রেণী-বিন্যাসে যে নবরূপান্তর ঘটল তা প্রধানত হিন্দুসমাজকে কেন্দ্র ক'রে। বাংলার সমাজে নতুন হিন্দু ধনিকশ্রেণী, হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য বিস্তৃত হল। বাংলার মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ সমাজের নিচের তলায় নেমে এলেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর সৈয়দ আহমেদের মতো পুরুষদের

প্রেরণায় মুসলমানসমাজ আত্মস্থ হয়ে ধীরে ধীরে যখন আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যা ও সামাজিক চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট হলেন, তখন থেকে তাঁদের মধ্যেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হতে থাকল। কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দীর বিলম্বের ফলে তাঁদের পক্ষে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা সম্ভব হল না। দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিতশ্রেণীর আয়তনের মধ্যে পার্থক্য থেকে গেল। এই পার্থক্য কলকাতার নাগরিক সমাজে প্রকট হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তার উপর অযোধ্যা মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নবাবসুলতানরা উৎখাত হয়ে তাঁদের বিশাল আশ্রিত পোষ্যবর্গসহ কলকাতা শহরে নির্বাসিত হলেন। কলকাতার দক্ষিণে ও পশ্চিমে টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে নতুন মুসলমানপল্লী প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার প্রসারবৃদ্ধিও দ্রুতহারে হতে থাকল। তার কিছুকাল আগে নবাবি আমলের অবসানকাল থেকে আলিপুর চিৎপুর কড়েয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানপল্লী কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে কলকাতা শহরের এইসব মুসলমানপল্লীর সাধারণ মুসলমানরা পুরাতন ক্ষমতাচ্যুত নবাববাদশাহদের পোষ্য সেবক ও দাসভৃত্যশ্রেণী। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর মধ্যে আধুনিক শিক্ষার আলোক কিছুই প্রবেশ করেনি বলা চলে। মনের সংকীর্ণ গবাক্ষ আজও প্রায় তাদের সম্পূর্ণ মোল্লামুখী হয়ে রয়েছে। নবাববাদশাহদের পরে কলকাতার নতুন ইংরেজপ্রভুরা প্রধানত এই শ্রেণীর মুসলমানদের যাবতীয় ভৃত্যের কাজে বহাল ক'রে তাদের সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। হাণ্টার তাঁর *The Indian Mussalmans* গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তার সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। এখানে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত করা যেতে পারে যে কলকাতার মতো নাগরিক সমাজে হিন্দুমুসলমানের সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেল কৃত্রিম উপায়ে ব্রিটিশ আমলে এবং মুসলমানদের ইংরেজবৈর ও পাশ্চাত্যবিমুখতার সুযোগ নতুন শাসকরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করলেন। হিন্দুসমাজে নতুন ভূসম্পত্তিনির্ভর ধনিকশ্রেণী তৎসহ কিছু 'কম্প্রাডোর' এবং বিপুল চাকুরিজীবী ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হল, আর অন্যদিকে মুসলমানসমাজে আরদালি বেয়ারা বাবুর্চি খানসামা প্রভৃতি ভৃত্যশ্রেণী নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণীর প্রসার হল। হিন্দুসমাজ খানিকটা গতিশীল হল কিন্তু মুসলমানসমাজ পূর্ববৎ প্রায় স্থিতিশীল হয়ে রইল। অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যের লৌহবর্মে হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাবোধ চালিত করার সুবিধা হল শাসকদের। অতঃপর রাজনীতির জ্বলন্ত চুল্লীতে তাকে উত্তপ্ত ক'রে সামান্য অজুহাতে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা করা কলকাতাতে তো বটেই, বাংলার যে কোনো শহরে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন যে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল বলেই আধুনিক যুগে 'রেনেসাঁস' ও 'রিফর্মেশন' সম্ভব হয়েছে। উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে সামাজিক নবজাগরণ ও কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন হয় তা মধ্যবিত্তের সৃষ্টি এবং প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্তের। মধ্যবিত্তের মধ্যে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই এই পথে অগ্রণী হন। এই সামাজিক নবজাগরণে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের দান নানাদিক থেকে স্মরণীয়। নবজাগরণ আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে নতুন হিন্দু ধনিকদের এবং কম্প্র্যাডোরদের একাংশ যোগ দিয়েছিলেন দেখা যায়। খানিকটা অন্তত ইউরোপের মতো নবজাগরণের একটা পরিবেশ তখন তৈরি হয়েছিল কিন্তু যেহেতু তার আধুনিক কালোপযোগী কোনো অর্থনৈতিক পশ্চাদভূমি রচিত হয়নি এবং মূলত তা শহর-কেন্দ্রিক ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপরের ও মধ্যস্তরের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই দেখা যায় যে তার প্রসারণ কলকাতার মতো মহানগরের সীমানার বাইরে খুব বেশি দূর পর্যন্ত হয়নি। এমন কি কলকাতার কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলও মধ্যযুগের তিমিরেই ডুবে ছিল। অথচ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতার আধুনিক নাগরিক রূপায়ণ আরম্ভ হয় এবং পথঘাট বাড়িঘর লোকজন যানবাহন ব্যবসাবাণিজ্য সবকিছুর প্রসার হতে থাকে। মধ্য-পর্বে রেলপথ স্থাপিত হবার পর কলকাতার কেন্দ্রীয় আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পবাণিজ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয়, বিশেষ ক'রে গঙ্গাতীরে পাটকলগুলির চিম্‌নির ধোঁয়ায় আধুনিক যুগের পদার্পণ ঘোষিত হতে থাকে। লোকজন ক্রমেই জমাট বাঁধতে থাকে কলকাতা শহরে ও তার পাশের শিল্পাঞ্চলে। ল্যুইস মামফোর্ড যাকে আধুনিক শহরের 'paleotechnic' পর্ব বলেছেন কতকটা সেই পর্বে প্রধানত লোহা-কয়লার কেন্দ্রগুলি জমজমাট হয়ে ওঠে। যেমন হয়ে উঠেছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চল। সেইদিক থেকে বিচার করলে কিন্তু উনিশ শতক থেকে কলকাতা বা তার আশপাশের শিল্পাঞ্চলে 'paleotechnic agglomeration' হয়নি। তবু এই বিকাশপর্বকেই এখানকার আদিটেক্‌নিক স্তরের 'জনকুণ্ডলায়ন' বা 'অ্যাগ্লোমারেশন' বলা যায় কারণ উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে মামফোর্ড বর্ণিত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায়। লক্ষণগুলি এই :

> ..a partly derivative thickening of population along the new railroad lines, with a definite clotting in the new industrial centres along the great trunk lines and a further massing in the greater junction towns and export terminals. Along with this went a thinning out of population and a running down of activities in the back country.

যানবাহন ও পথঘাটের প্রসারের ফলে কলকাতা শহরই বাংলাদেশে বৃহত্তম 'junction town' ও 'export terminal' হয়ে ওঠে এবং কলকাতার পাশের কারখানাকেন্দ্রে লোকজনের 'definite clotting' আরম্ভ হয় আর তার সঙ্গে

কলকাতার অন্তত ৫০।৬০ মাইল রেডিয়াসের মধ্যবর্তী 'back country'তে 'thinning out of population' ও তৎসহ 'running down of activities' দেখা দিতে থাকে। যদি ইউরোপের মতো স্বাধীন শিল্পপ্রধান দেশেই এই ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে কলকাতার মতো বিদেশীর পদানত ঔপনিবেশিক শহরে তা যে আরো কত ভয়াবহ আকারে ঘটতে পারে তা আজকের দিনেও কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল দেখলে বোঝা যায়। কেবল গ্রাম নয়, তার সঙ্গে পুরাতন কারুবর্গ ও কারুশিল্পকেন্দ্রিক 'producing town'ও একেএকে সমস্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে এবং তার পরিবর্তে কলকাতার মতো 'parasitic capital city' পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যেমন পৃথিবীর অধিকাংশ 'পরাধীন শহরে' হয়েছে তেমনি কলকাতাতেও হয়েছে। 'Centralisation of the organs of administration' এবং তার সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসনিক স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে 'the growing dependence of every type of enterprise, political educational economic, upon the process of administration itself' (Mumford)। এই প্রশাসনিক যন্ত্রটি চালু রাখার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা ইংরেজিশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ডিগ্রি প্রভৃতির যথারীতি ব্যবস্থাও করেছিলেন। কারণ এই যন্ত্রের আসল বস্তু হল 'কাগজ' ও 'ফাইল' যা ব্রিটিশ শাসকদের ঐতিহাসিক দান। কাগজ-ফাইলবহুল শাসনযন্ত্রের যন্ত্রী হলেন বিপুল অফিসারশ্রেণী ও কেরানীশ্রেণী। বিশ্ববিদ্যালয় হল তার উৎপাদনকেন্দ্র। কলকাতা শহর হল 'কাগজ' ও 'ফাইলের' শহর, অফিসার ও কেরানীর শহর, সাংবাদিক ও উকিল-মোক্তারের শহর, বিদ্যাবুদ্ধিজীবীর শহর—যাঁরা নিজেরা 'উৎপাদন' করেন না শুধু, চাষী-মজুরের উৎপাদন সুনির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে গলাধঃকরণ ক'রে জীবনধারণ করেন এবং কাগজের কারখানা থেকে উৎপন্ন হাজার হাজার টন কাগজ 'কন্‌জিউম' ক'রে সমাজে 'সার্ভিস' দেন।

মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা। কলকাতার মনও মধ্যবিত্তের মন। তার মধ্যে হিন্দুমন ও মুসলমানমন গোড়া থেকেই ব্রিটিশ কৌশলে প্রায় বিপরীতমুখী। নতুন সামাজিক মানমর্যাদা প্রভাবপ্রতিপত্তির দিক থেকেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য গোড়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই শ্রেণীগত বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বর্তমান। শহরে তা এমনভাবে জোট পাকিয়ে আছে যে দু'টিকে পৃথক করা বেশ কঠিন। তা ছাড়া হিন্দু বা মুসলমান কোনো সমাজেরই বিকাশ বাংলাদেশে সমতা বজায় রেখে হয়নি। দুই সমাজের ভিতরেও অনেক ছোটবড় ব্যবধান রয়েছে যদিও হিন্দুসমাজের মধ্যেই তা বেশি। কারণ শ্রেণীগত ব্যবধান ছাড়া মুসলমানসমাজে ধর্মীয় বন্ধনের জন্য আর কোনো বড় ব্যবধান

নেই। হিন্দুসমাজের উর্ধ্বাধ স্তরবিন্যাসে অনেক খালনালা নদনদীর ব্যবধান রয়ে গিয়েছে যেগুলির উপর কালভার্ট ও ব্রিজ চাপিয়ে আমরা একসঙ্গে চলেছি। কিন্তু সামান্য ধাক্কাতেই দেখা যায় যে কালভার্ট ব্রিজগুলি ধসে পড়ে, যেহেতু মেকলের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতির ঠিকাদারিতে তার গোড়ার স্তম্ভগুলি মজবুত হয়নি এবং তলায় যাবতীয় সামাজিক গোঁড়ামির চোরাবালিস্তর রয়ে গিয়েছে। কথায় কথায় বিশেষ ক'রে রাজনীতির চোঙ্গা ফুৎকারে আজও তাই চিরকালের জাতিবর্ণভেদবোধ (Casteism), ধর্মীয় আচারআতিশয্য (Cultism) সবই বীভৎস আকারে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নবজাগরণের সূচনা থেকেই হিন্দুমন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ছিল, সেই রামমোহন ইয়ংবেঙ্গল ধর্মসভা বিদ্যাসাগর সত্য ধর্মপ্রচারিণী সভা ব্রাহ্মসমাজ ও হরিসভার সময় থেকে। ক্রমে উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই দেখা গেল ধর্মসভা হরিসভার প্রভাব বাড়ছে আর তার প্রচারধারা প্রবলতর হচ্ছে এবং রামমোহন বিদ্যাসাগর ও ইয়ংবেঙ্গল তত্ত্ববোধিনীর ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। এমনকি মেকলেনীতির নবজাতকরাও তাঁদের মনের তলাকার চোরাবালির স্তর লুকিয়ে রাখতে পারেননি। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জোয়ারে অনেকেই 'Caste' ও 'Cult'-এর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দিশাহারা হয়েছেন। এই জোয়ারের মুখেই আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রবল প্রকাশ হল একেবারে 'কংগ্রেসে'র প্রতিষ্ঠা থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্বের 'স্বদেশী আন্দোলন' পর্যন্ত। পুনরুত্থানবাদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি যে জাতীয়তাবাদের সবল প্রতিষ্ঠা একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। এও মধ্যবিত্তের এবং প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্তের অন্যতম কীর্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে গোড়া থেকেই এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে 'হিন্দুয়ানি' এমন ভাবে মিশে রইল যে পরে অনেক চেষ্টা করেও জাতীয় কংগ্রেস তাকে ভেজাল-মুক্ত করতে পারল না, অন্তত মুসলমানসমাজের মনে তার দাগ কাটল না। তার ফলে অখণ্ড বাংলাদেশকে এবং অখণ্ড ভারতকেও আমরা শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত করতে বাধ্য হলাম, যদিও 'অখণ্ড' ভারতবোধ আজও একটা 'আইডিয়া' মাত্র, ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য কিনা বিচার্য।

কিন্তু সে বিষয় আপাতত আলোচ্য নয়। কলকাতার নাগরিক সমাজের চরম দুর্গতি ও অবনতি আরম্ভ হল। যত তার বহিরঙ্গের ইটপাথরলোহার বিকাশ ও বাহার বাড়তে থাকল তত এই অবনতি ত্বরান্বিত হল। তাই হওয়াই স্বাভাবিক কারণ শহর হল 'a collective work of art' (Mumford) এবং 'a specialized organ of social transmission' (Geddes), কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের প্রশাসনিক ও শোষণনীতির ফলে কলকাতা শহর কোনোটাই হল না। এদিকে নানাবিধ সার্ভিসের প্রলোভনে চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে লোক জীবিকার ধান্ধায় কলকাতায় এসে জমা হতে থাকল, যার ফলে

শহরের ভিতরে বস্তির পর বস্তি গজিয়ে উঠল এবং শহরতলি অঞ্চল এলোপাতাড়ি ফাঁপতে লাগল আর জনকুণ্ডল অমানুষের মতো চাকবদ্ধ হতে থাকল শহরের ভিতরে যত্রতত্র ও প্রান্তে। তার ফলে বিশৃঙ্খলাও জমাট বাঁধতে থাকল— 'What followed was a crystallization of chaos' (Mumford)। এই জমাটবদ্ধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে কলকাতা শহর হল সর্বপ্রকারের মানসিক বিকৃতি ও অস্বাভাবিক মানসতার মহাকেন্দ্রস্থল। 'As pace of urbanisation increased, the circle of devastation widened' (Mumford)।

কলকাতার বর্তমান 'মেট্রোপলিটন' জীবনপর্বে যথারীতি ত্রিমূর্তির আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই ত্রিমূর্তি 'finance, insurance, advertising'। যে কোনো ক্যালকাটানকে আজ একজন টিপিক্যাল 'মেট্রোপলিটন' বলা যায়। আজ তার চারিদিকে কাগজ সেলুলয়েড সেলোফেন রবার গ্লাস প্লাস্টিক টেবিলিন দিয়ে ঘেরা একটা স্বচ্ছ তন্তুময় অবাস্তব জগৎ ও স্বর্ণমৃগবৎ জীবন। সবার উপরে কাগজ ও রাসায়নিক তন্তু সত্য তার উপরে দারিদ্র্য। 'When the metropolitan lives most keenly, he lives by means of paper' (Mumford)। কাগজের মধ্যে 'খবরের কাগজ' চরম সত্য এবং নাগরিক জীবনের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের সর্বময় কর্তা। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করার এরকম জাদুকরী ক্ষমতা আদিম যুগের ম্যাজিসিয়ানদেরও ছিল না। বড় বড় কাগজ ও প্রেসের কোটিপতি মালিকরা কলকাতার মতো মেট্রোপলিস্ থেকে সমগ্র দেশের 'কালচার্' 'পলিটিক্স' ও 'ইকনমিক্স' কনট্রোল করেন। কাগজ ও সেলুলয়েডের অশরীরী অবাস্তব জগতে প্রত্যেক নাগরিক আজ স্কন্ধকাটা প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায় এবং আস্কন্ধ দেহাংশের নিত্যনৈমিত্তিক জৈবিক ধর্ম পালন করে, তার উপরে মাথা বা মগজের জৈবিক ক্রিয়া বলে করণীয় আর কিছু থাকে না। মহানগরের মর্যাদাপ্রতীকসর্বস্ব নামগোত্রহীন সমাজে জমাটবদ্ধ জনতার মধ্যে তাই প্রত্যেক মানুষের নির্জনতা-বোধ যত তীব্র হচ্ছে তত তার বিচারবুদ্ধিহীন গড্ডলিকাবৃত্তি প্রখর হচ্ছে। ঔপনিবেশিক কলকাতার মেট্রোপলিটন জীবনসায়াহ্নে এই গড্ডলমানসতারই উৎকট প্রকাশ দেখা যায়। পৌত্তলিকতার প্রবল উত্তেজনায় বলো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'কাল্ট' ও 'ওকাল্ট'এর পুনরুজ্জীবনে বলো, রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস উন্মত্ততায় বলো, বিকৃত যৌনসাহিত্যের উদগ্র ভোজন-লালসায় এবং চলচ্চিত্র ও খেলার মাঠের হিস্টিরিয়ায় বলো, সর্বত্র কলকাতা শহরে ক্রমে এই গড্ডলমনই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। সত্যনিষ্ঠ বিচারশীল ব্যক্তিমানস ভয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করছে অথবা সংকুচিত হয়ে শামুকের মতো নিজের খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকছে।

টাকা আর টাকা আর মন

'মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই, টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে।' বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের উক্তি। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান এই মন যা টাঁকশালে ভাঙে গড়ে।

টাকা স্বর্গ টাকা ধর্ম টাকাই জপ তপ ধ্যান। অটোমোবিল ও স্কাইস্ক্রেপারের যুগে মেট্রোপলিটন মহানগরে আর কোনো টান মানুষকে টানতে পারে না। এককালে মা ছিলেন স্বর্গাদপি গরীয়সী এবং পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাই ছিলেন পরম তপস্যার বস্তু। তখন মানুষের টানে মানুষ চলত, গরুর টানে গাড়ি চলত মাটির পথে। ইট পাথর লোহার পথ ছিল না, বাড়ি ঘর ছিল না, অটোর মতো যন্ত্র মানুষকে প্রচণ্ড বেগে টানত না। মাটির টানে মানুষের টানে মানুষ চলত। ক্রমে মাটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকল মানুষ, মাটি থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকল, কংক্রীটের স্পর্শে মাটির স্পর্শবোধ চলে গেল। গৃহসীমানায় প্রাচীর উঠল, ছোট প্রাচীর বড় বড় প্রাচীর। বড় বাড়ি ছোট বাড়িকে আড়াল ক'রে দিল। মনের মধ্যেও প্রাচীর উঠল। ইটের উচ্চতার আড়ালে মনও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর 'গ্রামের আলো নিবল। শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলল—সে আলোয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সংগীত নেই। প্রতি সূর্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্যাস্তে যে আরতির প্রদীপ জ্বলত, সে আজ লুপ্ত, ম্লান। শুধু-যে জলাশয়ের জল শুকোলো তা নয়, হৃদয় শুকোলো' (রবীন্দ্রনাথ)। মন হল একমুখী। লোভ ও স্বার্থের সওয়ার হয়ে অর্থের দিকে ধাবিত হল মন কলকাতা শহরে।

লোভের টানে স্বার্থের টানে অর্থের টানে গ্রাম থেকে শহরমুখী হল মানুষ ও মানুষের মন। সুতানুটির গঙ্গাতীরে কতকগুলি তাঁবু কুঁড়েঘর ও নৌকো নিয়ে যোব চার্নক যখন প্রায় বন্য যাযাবরের মতো বাস করছিলেন তখন তাঁর সপ্তদশ শতকী কল্পনার দিগন্তেও কলকাতার বর্তমান মেট্রোপলিটন মূর্তি ভেসে ওঠেনি।* চার্নকের মৃত্যু হল ১৬৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে। তার পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে সুতানুটি টাউনের দ্রুত সমৃদ্ধি দেখে উল্লসিত হয়ে কোম্পানির ডিরেক্টররা ১৬৯৭ সালে লিখলেন : "We are glad to hear your Town of Chuttanuttee increases so exceedingly' এবং তার আরো দু'বছর পরে ১৬৯৯ সালে কলকাতার কর্তারা লিখে জানালেন 'Chuttanuttee very much increased within these 5 years'। সুতানুটির গঙ্গার ঘাটে পদার্পণ করার পর যোব চার্নক জানান—'endeavouring to bring the trade down from Hughly to Sootanuttee' (August 1688) এবং অষ্টাদশ শতকের গোড়াতেই ডিরেক্টররা খুশি হয়ে লেখেন 'It is enough our Cash feels the benefit' (26 February 1703)।

'Our Cash feels'—কথাটি কোম্পানিব ডিরেক্টরদের বটে কিন্তু মনে হয় যেন কালের ইতিহাসের মর্ম থেকে উৎসারিত। কে ফীল করে? ক্যাশ। জন্তু নয়, মানুষ নয়—ক্যাশ! নবাবকে নগদ 'ক্যাশ' দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধরদের জমিদারি কলকাতা গোবিন্দপুর সুতানুটি কোম্পানির নামে কিনতে হয়েছে, সেই জমিদারি 'টাউন' হয়ে গড়ে উঠছে, তার লোকসংখ্যা বাড়ছে, বাণিজ্যের উন্নতি হচ্ছে। কাজেই যে ক্যাশ টাকাটা দিয়ে জমিদারি কেনা হয়েছে সেই টাকাটাই অনুভব করছে যে সে উপকৃত। টাকার যে শুধু চক্রগতি আছে তা নয়, তার অনুভূতি আছে হৃদ্‌স্পন্দন আছে। টাকার অনুভূতি ও মানুষের অনুভূতি একাকার হয়ে মিশে গেল। মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক আর্থিক সম্পর্কে পরিণত হল। কলকাতা শহরের পত্তন হল ক্যাশের উপর এবং ক্যাশ নেক্সাস হল সামন্তধনতান্ত্রিক কলকাতার মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক।

কোনো বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লণ্ডন শহর সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'London has never acted as England's heart but often as England's intellect and always as her moneybag', কলকাতা শহর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যায়। লণ্ডন যেমন কোনোদিন ইংলণ্ডের হৃদয়ের কাজ

* They live in a wild unsettled condition at Chuttanuttee neither fortifyed houses nor godowns, only tents, hutts and boats (May 25, 1691).

করেনি, কেবল তার মননশক্তি ও মনিব্যাগের কাজ করেছে, কলকাতা শহরও তেমনি কোনোদিন বাংলাদেশের হৃদয়ের পরিচয় দেয়নি, তার মননশক্তি ও মনিব্যাগের পরিচয় দিয়েছে। এই হৃদয়হীন অর্থের অন্বেষণ অষ্টাদশ শতকের কলকাতার ইতিহাস। পঞ্চানন ঠাকুর, ব্ল্যাকডেপুটি গোবিন্দরাম, নবকৃষ্ণ দেব, মদন দত্ত, রামদুলাল দে এবং অন্যান্য দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দিরা এই অর্থের লোভে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে এসেছেন অষ্টাদশ শতকে। নিরাপদ জীবনযাত্রা ও নির্লিপ্ত অর্থান্বেষণের সুযোগ কলকাতার মতো আর কোথাও তখন ছিল না। যুগসন্ধির বিশৃঙ্খলায় গ্রাম্যজীবন বিপর্যস্ত। ভারতের ও বাংলার রাজদরবারের পরিবেশে স্বার্থের হীন হানাহানি ও চক্রান্ত। বিদেশী বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে উদ্যত। ইংরেজরা ক্রমে ছোট জমিদার থেকে বড় জমিদার হয়ে উঠছেন এবং ধাপে ধাপে বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করছেন। তাঁদের সুতানুটির বাণিজ্যকুঠি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। গ্রাম থেকে নগরের রূপ ধারণ করেছে কলকাতা এবং রূপায়ণের প্রথম পর্বে মধ্যযুগের নগরের যাবতীয় ঐতিহাসিক উপাদান নিয়েই তার বিকাশ হয়েছে। নগরের চারিদিকে প্রহরীমোতায়েন বেষ্টনী ও গড়খাই, পশ্চিমে নদীতীরে কেল্লা ও তার চারদিকে শত্রুমুখী কামান। কলকাতার বাল্যকালের এই রূপ 'The original town of Calcutta was at one time at least a fenced city....Every road issuing from the town was secured by a gate'—প্রাচীন মানচিত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি প্রায় ক্যাপটেন উইলিয়াম হলকুম্ব (১৭৪২) কলকাতার নির্বিঘ্নতার পরিকল্পনা করেছিলেন কামান ও বেষ্টনী দিয়ে। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে উত্তর কলকাতায় শেঠদের বাগানের কাছে ছয়টি কামানের ব্যাটারি থাকবে, তার মধ্যে দু'টি গঙ্গামুখী ও চারটি উত্তরমুখী। কেল্লা ও কুঠির কাছে থাকবে চারটি কামান, জ্যাকসন ঘাটে তিনটি, জেলখানার কাছে তিনটি, অন্যান্য কয়েকটি রাস্তার মুখে, পুবে ও পশ্চিমে আরো প্রায় দশ বারোটি কামান বসানো থাকবে। নগরসীমার মধ্যে প্রবেশপথগুলির সামনে থাকবে দেওয়াল, তার পরে গড়খাই। তা ছাড়া কামানের প্রত্যেকটি ব্যাটারির চারিদিকেও পরিখা থাকবে। কলকাতা শহর সাদা ও কালো রঙের মানুষ হিসেবেও ভাগ করা হল—'সাদা বা হোআইট টাউন' ও 'কালো বা ব্ল্যাক টাউন'। ব্ল্যাক টাউনের ফটকগুলির চারিদিকে দেয়াল থাকবে এবং তার উদ্দেশ্য হল যাতে সাদা-কালোয় না মিশে যায়। সাদা সাদা, কালো কালো। সাদা 'মাস্টার', কালো 'স্লেভ'। সাদা শাসক শোষক অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর 'হোমো স্যাপীয়েন্স' আর কালো 'নিগার' 'নেটিভ' ও কতকটা যেন 'অ্যানথ পয়েড এপ্'। সাদা 'হোমো' ও কালো 'অ্যানথ্রপয়েডরা' কলকাতা শহরে বিভক্ত হয়ে গেল। নতুন

কলকাতার নাগরিক সমাজে প্রথম বৈষম্যের দাগ পড়ল চামড়ার রঙের উপর দিয়ে। কলকাতা শহরের দেহ থেকে সে দাগ আজও মিলোয় নি।

শুধু চামড়ার রঙের দাগ নয়, আরো অনেক দাগে কলকাতার নাগরিক দেহ ক্ষতবিক্ষত হল। দাগের উপর দাগ তার উপর আবার দাগ। প্রত্যেকটি দাগ কলকাতার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর হয়েছে, বিস্ফারিত হয়েছে, যেমন গাছের গায়ে কাটা দাগ হয় তেমনি। সামাজিক বৈষম্যের দাগ। সাদার মধ্যে 'ক্রিশ্চান টাউন' তার মধ্যে পর্তুগীজ আর্মেনিয়ান টাউন, ইংরেজ ফরাসী ডাচদের টাউন। টাউন মানে এখানে অঞ্চল। গির্জার ভেদ নয় কেবল, বসতির ভেদ জীবনের ভেদ এবং সবার উপর চরম সত্যের মতো সামাজিক ভেদ। শ্রেণীগত ভেদ স্টেটাসগত ভেদ। কলোনিয়াল টাউন কলকাতায় ঊর্ধ্বাধ সামাজিক ভেদরেখা একটার পর একটা প্রলম্বিত হতে থাকল। খণ্ডিত নাগরিক সমাজ মৌচাকের রূপ ধারণ করল। রকমটা মধ্যযুগের কারুজীবী নগরের মতো কতকটা। যেমন কুমোরদের জন্য কুমোরটুলি, কলুদের জন্য কলুটোলা, জেলেদের জন্য জেলেপাড়া, ডোমদের জন্য ডোমটুলি, গোয়ালদের জন্য গোয়ালটুলি, বিহারী গোয়ালা বা আহীরদের জন্য আহীরি-টোলা, কসাইদের জন্য কসাইটোলা, পটুয়াদের জন্য পটুয়াটোলা, শাখারীদের জন্য শাখারীটোলা, খুদে ব্যবসায়ী বা ব্যাপারীদের জন্য ব্যাপারীটোলা, কম্বলীদের (যারা কম্বল কেনাবেচা করে) জন্য কম্বলীটোলা, হাড়িদের জন্য হাড়িপাড়া, কাঁসারীদের জন্য কাঁসারীপাড়া, কামারদের জন্য কামারপাড়া, মুসলমানদের জন্য মুসলমানপাড়া, ওড়িয়াদের জন্য ওড়িয়াপাড়া, দর্জিদের জন্য দর্জিপাড়া, খালাসীদের জন্য খালাসীপাড়া, ধোপাদের জন্য ধোপাপাড়া, তেলিদের জন্য তেলিপাড়া, ছুতোরদের জন্য ছুতোরপাড়া, বেনিয়াদের জন্য বেনিয়াটোলা, যুগীদের জন্য যুগীপাড়া, শিকদারদের জন্য শিকদারপাড়া। এরকম আরো অনেক আঞ্চলিক বিভাগ হল কলকাতা শহরে এবং মধ্যযুগের জাতিবর্ণবিভক্ত সমাজটাকে তুলে এনে নবযুগের নির্মীয়মাণ নগরের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর নতুন নগরপত্তনের কথা মনে হয়। কবিকঙ্কণের মতো কোনো কবি যদি একালে 'কলিকাতা মঙ্গল কাব্য' রচনা করতেন, কলকাতার দৈহিক বিকাশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসের বিষয় নিয়ে, তাহলে তার মাহাত্ম্যও লোকমুখে যথেষ্ট প্রচারিত হত। বৃত্তিগত বর্ণভেদ জাতিভেদ খণ্ডিত করল কলকাতার দেহ এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার মনও খণ্ডিত হল।

তারপর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বণিক তেলি তিলি শুঁড়ি সকলে কাঁধ ঘষাঘষি ক'রে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। প্রতিযোগিতার চেহারা আলাদা। নবাব বা জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতার ভয় নেই এবং ইংরেজরা

যতই নবাবি আদবের অনুকারী হন, এমনকি আচারআচরণে পর্যন্ত, তাতেও নবাবি আমল আর ইংরেজ আমলের সামাজিক প্রতিবেশের ঐতিহাসিক পার্থক্য উপলব্ধি করতে নগরবাসীদের অসুবিধা হয়নি। নতুন কলকাতার হাওয়ার মধ্যে সেই পার্থক্যের আমেজ রয়েছে এবং তারই মধ্যে নতুন জীবন আস্বাদনের হাতছানি। যুগের সাইনবোর্ডের উপর হাতের ইঙ্গিতে দেখানো —কলকাতা শহর। তার উপরে লেখা

শহরে যাও—কলকাতায়
স্বাধীন হবে
লাভবান হবে

কিসের স্বাধীনতা? লাভ কিসের? জীবন ও জীবিকার স্বাধীনতা এবং টাকায় লাভবান হওয়া। সমাজে এই স্বাধীনতা আগে ছিল না এদেশের গ্রাম্যসমাজে। কলুটোলা পটুয়াটোলা প্রভৃতি টোলা টুলি ও পাড়াতে পুরনো গ্রাম্যসমাজের জীর্ণ কাঠামোটাকে কলকাতার নতুন নাগরিক সমাজে আরোপ করা হল বটে কিন্তু বর্ণগত বৃত্তিবন্ধনের কঠোরতা রইল না, অন্তত শহরের মধ্যে নয়। ক্রমে টাকার মানদণ্ডে যখন নতুন যুগের লোকসমাজে মর্যাদার পরিমাপ হতে থাকল তখন নাগরিক সমাজের 'অ্যানোনিমিটি' বা নামগোত্রহীনতার যে বিশিষ্ট রূপ সেটাও পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। যত সমাজের অজ্ঞাতকুলশীলতা বাড়তে লাগলো তত নগরের লোকের পক্ষে সহজ হল কুলবৃত্তিগত বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার। বর্ণগত বৃত্তির সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এল মানুষ জীবনের বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে। জীবিকার পথ অনেকটা মুক্ত, জীবনযাত্রাও অনেকটা স্বাধীন। কলুর ছেলে গ্রামে কলু, গ্রাম্যসমাজে তার মর্যাদা নির্দিষ্ট একেবারে বংশানুক্রমে, কিন্তু কলকাতা শহরে সে মোটামুটি একজন মানুষ, তার স্বাতন্ত্র্য আছে স্বাধীনতা আছে এবং নতুন একটা সামাজিক মর্যাদার স্বাদও সে পেয়েছে, যে মর্যাদার মানদণ্ড বর্ণবৃত্তিগত ততটা নয়, যতটা বিত্তগত। কুল নয় বর্ণ নয় টাকাই নতুন নাগরিক মানমর্যাদার বড় মাপকাঠি। এই টাকার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে কলকাতার সমাজের যে রূপান্তর হতে থাকল তার আভাস দিয়েছেন ভবানীচরণ তাঁর 'নববাবুবিলাস' রচনায় (১৮২২-২৩ সাল):

> ...ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার কর্মকার বর্ণকার চর্মকার চটকার পটকার মটকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্ধ দাস্য

দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···

'বহুতর দিবসাবসানে' বলতে পুরো অষ্টাদশ শতকটাকে ধরা যেতে পারে। এই শতকের মধ্যে কলকাতার লোকসংখ্যা দশ বারো হাজার থেকে (১৭১০ সাল) বেড়ে পাঁচ ছয় লক্ষ পর্যন্ত (১৮০০ সাল) হয়। বৃদ্ধির হার কম নয়। কিসের টানে শহরে এই গ্রামছাড়া জনস্রোত বয়ে এল অনর্গল ধারায়? টাকার টানে। গিরিনির্ঝরের স্রোতের টানের মতো এর প্রাবল্য। বড় বড় বোল্ডার সেই টানে গড়িয়ে চলে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং তার শব্দের প্রকম্প চারিদিকে বিকীর্ণ হতে থাকে। গোবিন্দরাম রামদুলাল মহারাজ নবকৃষ্ণ সকলেই বোল্ডারের মতো গড়াতে থাকেন এবং ভাঙতে থাকেন টাকার টানে। অনেকেই 'অধিকতর ধনাঢ্য' হন এবং টাকার উপরে গড়াতে গড়াতে তাঁদের মানবসত্তা ভাঙতে থাকে। 'বেতনোপভুক' হয়ে 'সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী' ক'রে অথবা 'অগম্যাগমন মিথ্যাবচন ভাঁড়ামি দাস্য দৌত্য' ক'রে, কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারি কিনে, হাট-বাজার বসিয়ে নিমক পোক্তানের দালালি ও দেওয়ানী-বেনিয়ানি ক'রে যাঁরা ধনাঢ্য হন তাঁরা ক্রমে মন ও বিবেকটাকে বাজারের বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত করেন। টাকার কাছে নির্বিকার চিত্তে তাঁরা মনটাকে উৎসর্গ ক'রে দেন। টাকার মন্থনদণ্ডে মন থেকে শুধু বিষ ওঠে, অমৃত নয়। বিবাহে-শ্রাদ্ধে দোলদুর্গোৎসবে আমোদ-প্রমোদে অনাথ-আতুর সেবায় পুণ্যকর্মে দেবালয়প্রতিষ্ঠায় ধনাঢ্যরা যে অনর্গল অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না তার কারণ বাইরের লোকসমাজে তাঁরা নিজেদের বদান্যতা ও উদারতাপ্রবৃত্তি প্রচার করতে চান। তার চেয়েও বড় কারণ হল নানাবিধ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের ফলে তাঁদের মনের তলায় যে পাপ ও অন্যায়বোধের ময়লা জমে সেই ময়লাটাকে তাঁরা নিষ্কাশন করতে চান সমাজসেবায় দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ও পুণ্যকর্মে অঢেল অর্থব্যয় ক'রে। একশ বছর আগে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এবিষয়ে জমিদারদের প্রসঙ্গে লিখেছেন (২০ শ্রাবণ ১২৬৯ সন, আগস্ট ১৮৬২):

জমিদারদিগের মধ্যে আর একটি দল হইয়াছে তাঁহারা বড় পাকা লোক। তাঁহারা কুকার্য্য পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন দলের একটি সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদিগের এই শিক্ষাটি হইয়াছে। এই সম্প্রদায় না করেন এমন কুকর্ম্ম নাই, পরদারগমন, উৎকোচ গ্রহণ ও কৃতঘ্নতা করিয়া পরের সর্ব্বস্ব হরণ প্রভৃতি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহাদিগের এই সকল কুক্রিয়া জীর্ণ করিবার মহৌষধ আছে। সে ঔষধ এই, গঙ্গাস্নান ও নামাবলী গ্রহণ।

কলকাতা শহরে যাঁরা নতুন সামাজিক আভিজাত্যের তকমা পেলেন তাঁরা প্রায় সকলেই একশ্রেণীর নতুন জমিদার হলেন। গ্রাম্য ভূসম্পত্তির জমিদাররা

'অ্যাবসেণ্টি' হয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যবিলাসে শহরে কালহরণ করতে লাগলেন। ইংরেজ শাসকরা এই জীবনযাত্রার সমস্ত বাধা দূর ক'রে দিলেন ভূমিসংক্রান্ত বিধানে 'সাবইনফিউডেশন' বা উপস্বত্ব সৃষ্টির সুব্যবস্থা ক'রে দিয়ে। এই বিধানের ফলে গ্রাম ও শহর একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মধ্যে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল অভ্রভেদী টাকা। শহর ও গ্রামের মতো দেহ ও মনও বিচ্ছিন্ন হল। এ বিচ্ছেদ আর ঘুচল না কোনোদিন। টাকার অভ্রংলিহ মদগর্ব তা ঘুচতে দিল না। দেখা গেল 'এক জায়গায় একদল মানুষ অন্নউৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর-একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে—অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয়, তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ-উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ, অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন ও ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে।' (রবীন্দ্রনাথ : 'উপেক্ষিতা পল্লী'।)

টাকার পথে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিচ্ছেদ ঘটল এবং তার ব্যাদান ক্রমেই বাড়তে লাগলো কলকাতার নাগরিক সমাজে। শুধু গ্রামের সঙ্গে আধুনিক শহরের বিচ্ছেদ নয়, এ হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরের সঙ্গে আধুনিক শহরের বিচ্ছেদ। গ্রাম জীর্ণশীর্ণ পরিত্যক্ত হল এবং সেকালের নগরেরও শ্রীসমৃদ্ধি ম্লান হয়ে এল। ঢাকা মুর্শিদাবাদের মতো নবাবী আমলের রাজধানী শহর, অন্যান্য বাণিজ্যনগর কারুজীবীনগর তীর্থনগর সকলের আকর্ষণ স্তিমিত হয়ে এল নতুন কলকাতা শহরের টাকার দুরন্তচক্রগতি ও ঔজ্জ্বল্যের কাছে। সেকালের আমেদাবাদ শহর দেখে রবীন্দ্রনাথের যা মনে হয়েছিল কলকাতার পাশে ঢাকা মুর্শিদাবাদ দেখেও তা'ই তাঁর মনে হত :

> এই প্রথম দেখলুম, চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো-ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের।
>
> সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবতখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচ্‌কাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা

তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনানি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো—তার চারদিকে কোথাও নেই সেই রং, নেই সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি। (রবীন্দ্রনাথ : 'ছেলেবেলা'।)

কলকাতা শহরেও নতুন ইংরেজ বাদশাহদের দরবারে লাটভবনে এর চেয়ে কম জমকালো উৎসব হয়নি। আঠের-উনিশ শতকে উৎসবের ফোয়ারা ছুটত লাটভবনে। ভারতজয়ের উৎসবই বেশি। একটার পর একটা প্রদেশে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির জয়ের উৎসব। উনিশ শতকের গোড়ায় এরকম একটি উৎসবে শুধু যে আতশবাজির খেলা দেখানো হয়েছিল তার বর্ণনা দিচ্ছি (ফেব্রুআরি ১৮০৩): 'আতশবাজীতে হাতির লড়াই দেখানো হল আকাশে। উপরে বাজি ফাটল তার ভিতর থেকে আগুনের মালায় দুটি হাতি বেরিয়ে এল এবং লড়াই করল। আগুনের একটি আগ্নেয়গিরি থেকে কিছুক্ষণ ধরে আকাশে রংবেরংয়ের রকেট উদ্‌গীরিত হতে থাকল। আবার একটি বাজি ফাটল আকাশে এবং তার ভিতর থেকে আগুনের রেখায় আঁকা দুটি মন্দির ভেসে উঠলো চোখের সামনে, ভারতের দেবদেউল। মন্দিরের পাশে একটি বাজির ঝর্ণা থেকে অজস্র ধারায় আগুনের বিন্দু ঝরতে থাকল এবং বিন্দুগুলি নীল রঙের। অবশেষে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো বাজির আকাশে এবং তার ভিতর থেকে একটি বৃত্তাকার আগুনের ভূমণ্ডল ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে বেরিয়ে এল এবং তার ভিতর থেকে আবার অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হতে থাকল। আশ্চর্য হল, আগুনের মধ্যে ফার্সি হরফে লেখা : 'কল্যাণ হোক সকলের'।'

আতশবাজির এই খেলা পুরো উৎসবের অঙ্গবিশেষ এবং এর মধ্যে বাদশাহী আমলের প্রমোদাবশেষ যে বেশ কিছুটা আছে তা বোঝাই যায়। যেমন হাতির লড়াই বাদশাহের কাছে খুবই প্রিয় ও উপভোগ্য ছিল এবং মোগল চিত্রকলায় পর্যন্ত তার বহু নিদর্শন আছে। এ ছাড়া রকেট দেবদেউল ভূমণ্ডল এগুলির মধ্যে বিদেশী সুদক্ষ বাজিকরদের কলাকৌশল দেখানো হয়েছে। তবু ইংরেজদের লাটভবনের অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে খোজাদের দেখা যেত না। তার বদলে দেখা যেত বন্দুকসঙ্গীনধারী প্রহরীদের। তাদের পোশাক অন্যরকম, দাঁড়াবার ভঙ্গি অন্যরকম, যেন যন্ত্রের মানুষ। লাটভবনের অন্দরমহলের বেগমদের হামামে গোলাপজলের ফোয়ারা ছুটত না অথবা বাজুবন্ধ কাঁকনের ঝনঝনানিও শোনা যেত না। বোঝা যেত যে চলতি ইতিহাস কলকাতার লাটভবনে চলছে কিন্তু শাহিবাগে থেমে গিয়েছে। শাহিবাগ স্থির দাঁড়িয়ে আছে আর লাটভবন বেগের আবেগে অস্থির। শাহিবাগ—আমেদাবাদ মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা যেখানকারই হোক না কেন—এখন ভুলে যাওয়া গল্পের মতো কারণ তার সেই রঙ নেই ধ্বনি নেই। যেন শুকনো দিন রস ফুরিয়ে যাওয়া রাত্রি,

আর লাটভবনের গল্প নতুন, তার রঙ আছে ধ্বনি আছে দিন ও রাত্রি সবসময় সেখানে নতুন যুগজীবনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রবৎ প্রহরীরা সঙ্গীন হাতে পাহারা দিচ্ছে, কামান দিয়ে ঘেরা আছে লাটভবন। শাহিবাগের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়েছে, তার উৎসব ম্লান হয়ে গিয়েছে। এখন লাটভবনের যুগ এবং তার ইম্পিরিয়াল ঔদ্ধত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হচ্ছে আতশবাজির বিজয়োৎসবে।

সাম্রাজ্যলোভী অর্থলোভী বণিকবুদ্ধি ইংরেজ শাসকদের নতুন দম্ভের যুগ এল আর তার সঙ্গে এল অর্থলোভী নির্জীব শাসিতদের নতুন গোলামির যুগ। বণিকের মানদণ্ডই বড, তার উপরে সতর্ক পাহারা রাজদণ্ড। বণিকের বুদ্ধিই রাজনীতির আদর্শ, সমাজনীতির আদর্শ, শিক্ষানীতির আদর্শ। এই নবযুগ ও আদর্শের অভ্যুদয় হল কলকাতা শহরে। বণিকের স্বার্থবুদ্ধি সংক্রমিত হল কলকাতার জনমনে। স্বার্থ টাকার ও মুনাফার। মানবিক স্বার্থ সামাজিক স্বার্থ কোনো স্বার্থই তার চেয়ে বেশি বড নয়। আগেকার কালেও মোহর ছিল মুদ্রা ছিল পয়সা ছিল কড়ি ছিল। কিন্তু বিনিময়টা প্রধানত ছিল বস্তুর সঙ্গে বস্তুর। পয়সা কড়ি মোহর মুদ্রা কালেভদ্রে হাত ঘুরত। হাতঘোরার ক্ষমতাই তাদের ছিল না, সামান্য একটু ঘুরেফিরে পরম নিশ্চিন্তে সিন্দুকের বা কলসির গহ্বরে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ত। বর্তমান মুদ্রা তা নয়। তার চক্রগতির শক্তি অফুরন্ত। তার ঘুমিয়ে থাকার সময় নেই। সিন্দুক বা হাঁড়ি-কলসির কন্দরে তাকে "হোর্ড' করা হয় না, ব্যাঙ্কে 'সেভ' করা হয় এবং ব্যাঙ্ক বা বীমার 'সেভিং' আবার 'ইনভেস্টমেন্টে'র ভিতর দিয়ে ঘুরতে থাকে। টাকার গতির বিরাম নেই। আমার নিষ্ক্রিয় সঞ্চিত টাকা অন্যের হাতে সক্রিয় হয়ে ঘুরতে থাকে, তবেই ব্যাঙ্ক চলে বীমা চলে শাসন চলে শোষণ চলে এবং সমস্ত কিছু টাকার বিনিময়ে মাপাজোকা যায়। সকলকেই একটা 'কমন মেজরে' আনা যায়, কোয়ালিটিকে একনিমেষে কোয়ানটিটিতে পরিণত করা যায়। অঙ্কের ব্যাপার। সমাজের চারিদিকে দাঁড়িপাল্লা, টাকার ওজনে মাপা যায় না এমন কিছু নেই। জর্জ সিমেল বলেছেন : '....it asks for the exchange value, it reduces all quality and individuality to the question 'how much ?'.

মানুষের জীবনের সমস্ত উপকরণ দোষগুণ মানবিক পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক প্রেম ভক্তি স্নেহ ভালবাসা পাপপুণ্য সবই টাকার বিনিময়-মূল্যে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। সমাজটাই একটা বড মার্কেটের মতো এবং মার্কেটে যেমন দ্রব্যমূল্যের তালিকা থাকে, বর্তমান সমাজের মার্কেটেও বহুবিধ মনুষ্যের মূল্যতালিকা সর্বদাই তেমনি লটকানো থাকে। জ্ঞানীগুণী মানী প্রেমিক প্রেমিকা গুরু শিষ্য স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা ভাই বোন উচ্চশিক্ষিত-

মধ্যশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত পণ্ডিত মূর্খ সকলের দাম টাকার বিনিময় হিসেবে সমাজের বাজারে টাঙানো আছে। এ টাকা একালের গতিশীল টাকা, সদাজাগ্রত সতত সঞ্চরণশীল টাকা, সেকালের মন্থরগতি জরদ্গব মোহরমুদ্রা নয়। এই টাকাই কলকাতার টাকা। এই টাকার ভিত্তির উপরেই কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত। এ টাকার হৃদ্‌স্পন্দন আছে অনুভূতি আছে 'ক্যাশ ফীলস'। এবং এই গতিশীল টাকার স্পন্দন অনুরণন ও অনুভূতি যত বেড়েছে, ক্যাশের ফিলিং যত গভীর ও ব্যাপক হয়েছে, কলকাতা শহরের মন তত অসাড় ও অবরুদ্ধ হয়েছে এবং কলকাতার ইটপাথরের নীরেট ছাঁটাকাটা স্থাপত্যে সেই মনের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নাগরিক মন হয়েছে টাকার মতো ক্যাল-কুলেটিং, ইটপাথরের মতো কঠিন।

নগরবিজ্ঞানী মামফোর্ড বলেছেন যে আধুনিক জীবনের বিকাশের এই ছন্দ নগরস্থাপত্যের বিভিন্ন পর্বে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্বের নাগরিক স্বাধীনতা কতকটা যেন বোজানো চোখ খুলে আলো দেখার মতো। নগরে এলে সকলে স্বাধীন—এই অনুভূতি হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো। সেই আলো দেখাতে হবে কাজেই স্থাপত্যে তার প্রতীক হল 'রাউণ্ড আর্চ', গোলাকার খিলান। স্তম্ভের উপর তোরণ তোরণপথ তোরণাকৃতি বাঁক। তোরণের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যায়, অনন্ত আকাশ দেখা যায়, দূর দিগন্তের আভাস পাওয়া যায়। তারপর যত জীবনের গতি দ্রুততর হতে থাকে যন্ত্রের বেগে, জীবন যত 'স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড' হয় ততই জীবন ও মনের চেহারা মুদ্রিত অক্ষরের মতো একমাপের একধাঁচের ছাঁচেঢালা ছাঁটাকাটা হতে থাকে। সেনাবাহিনীতে আইনকানুনে টাকাপয়সায় আমলাতান্ত্রিক শাসনে এই ছাঁচেঢালা জীবন প্রতিফলিত হয়। শহরের পথঘাট এই সময় বিস্তৃত ও প্রসারিত হয় এবং নগরের ঘরবাড়ির 'ফাসাদ' বা মুখটা স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড হয়, বিশ্বভুবন তার মোহিনী রূপ নিয়ে গিল্টপ্লাস্টারে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকাশের চরম পর্ব হল শহরের প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন। প্রকৃতির সঙ্গে শহরের বিচ্ছেদ যখন অনিবার্য হয়ে উঠলো তখন স্থাপত্যের চক্রান্ত হল প্রকৃতির পায়ে শিকল দিয়ে শহরের পাথরস্তম্ভে বেঁধে রাখা। শহরে পার্ক উদ্যান হল, পথের ধারে ধারে গাছ বসল, ঝোপঝাড় গজিয়ে তোলা হল। সবটাই হল প্রকৃতিকে জ্যামিতির ছককাটা ডিজাইনে বেঁধে ফেলার চেষ্টা। ঘাসছাঁটা ঝোপঝাড়ছাঁটা গাছছাঁটা এবং সেই ছাঁটাঝোপ আর ছাঁটাগাছের ভিতর দিয়ে সোজা বাঁধানো পথ আর তার দু'পাশে একধাঁচের সারবন্দী বাড়ি। শহরের পার্ক-উদ্যানগুলি সবুজ ন্যাকড়ার ফালির মতো অথবা সবুজ কালিতে ছোপানো কাগজের টুকরো। ঝোপের সারি গাছের সারি যেন সবুজ রংয়ের দেয়াল। গৃহসীমানার

দেয়াল জেলখানার দেয়াল আর পথের দেয়ালের মধ্যে তফাত শুধু রংয়ের। এ যেন মামফোর্ডের ভাষায় : **'the deformation of life in the interest of an external pattern of order····'**।

যেন গ্রীক দস্যু প্রকাস্টিস্ শিল্পী র‍্যাফেলের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে নগরোন্নয়ন কমিটি লটারী কমিটি এবং পরে কর্পোরেশনের পরিকল্পনায় কলকাতা শহর স্থাপত্যের এই পর্বগুলি অতিক্রম ক'রে ক্রমে এক বিকৃত ও বিবর্ণ জীবনের বিশ্রী প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। তাই বিকৃত ও বিবর্ণ মনের প্রতিচ্ছবি হয়েছে কলকাতা।

এই তো কলকাতার মনের গড়ন। স্তরিত শিলার মতো এই মনের প্রত্যেকটি স্তরের বিশ্লেষ সম্ভব। ভিত্তিস্তরে টাকা অর্থাৎ 'ক্যাশ'। ক্যাশের স্পন্দন আছে গতি আছে টান আছে প্রবল। মানুষের বুদ্ধি বিচারবোধ বিবেক মনুষ্যত্ব এই টাকার টানে ভেসে যায় এবং টাকা দিয়ে মানুষকে মাপা যায়। টাকা যেমন টাকশালে স্টাণ্ডার্ডাইজড, মনও ঠিক তেমনি মানুষের স্টাণ্ডার্ডাইজড মহানগরে। মানবিক পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত সম্পর্ক টাকার সম্পর্ক। এই ভিত্তিস্তরের পরে ভেদবৈষম্যের স্তর। কলোনিয়াল শহর কলকাতায় প্রথম বৈষম্য শাসকশাসিতের যা গায়ের চামড়ার রংয়ের বৈষম্য এবং যা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরযুগেও সমাজে অচিন্তনীয় ছিল। তার সঙ্গে এল নতুন যুগের ধনবৈষম্য যা আগেকার বর্ণবৃত্তিগত বৈষম্যের চেয়ে আরও ভয়ংকর। অবশ্য আধুনিক শিক্ষার স্বর্ণকাঠিস্পর্শে সেকালের জাতিবর্ণের বৈষম্যের অবসান হল না বরং শাসকদের কৌশলে শহরেও তা জাঁকিয়ে বসল আর তার সঙ্গে ধনবৈষম্যের বৈকট্য যুক্ত হল। এই দুই বৈষম্যের আঘাতে কলকাতার মন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। কলকাতার দৈহিক বিকাশ হল 'বারোক' শহরের কিম্ভূতকিমাকার রূপে। গড়নের মধ্যে যান্ত্রিকতা ফুটে উঠলো সর্বত্র যেমন বাড়িঘরে পথেঘাটে উদ্যানে ও ময়দানে। প্রকৃতিকে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক'রে ছড়িয়ে দিয়েও এই যান্ত্রিকতা ঢাকা গেল না বরং তা আরও বিকৃত ও কুৎসিত হল। কলকাতার জীবনের ব্যাপক বিকৃতি রূপায়িত হল তার দৈহিক স্থাপত্যের মধ্যে। কলকাতার মন হল বিবর্ণ বিকৃত যান্ত্রিক। কলকাতার সমাজ হল একস্‌চেঞ্জ-মার্কেট বিনিময়ের বাজার যেখানে টাকার বিনিময়ে সবকিছু কেনা যায় এবং সবই বিনিময়যোগ্য পণ্য, মানুষ পর্যন্ত। শুধু যে মানুষকেই কেনা যায় তা নয়, মানুষের মনও কেনা যায় টাকার বিনিময়ে। মর্যাদা খ্যাতি প্রতিপত্তি এসব সমাজের নিলেমে ডাক দিয়ে উচ্চদামে কেনার বস্তু মাত্র। নিলেমের মাল। খেতাব উপাধি এসব বাহারে প্যাকেট বা মোড়ক, মালবিকোনোর জন্য। যত পচা মাল তত বেশি তার মোড়কের বাহার। নাগরিক মন যত বিবর্ণ ও বিকৃত

হতে থাকে তত তার নিত্যনতুন লেবেল ও মোড়ক বদলায় এবং বোঝা যায় যে লেবেলের তলায় যে মন তা শীতের পাষাণের মতো হিমশীতল, কোনো উত্তাপ নেই তার মধ্যে। তাই কৃত্রিম তাপের জন্য কলকাতার মন সর্বদাই উন্মুখ।

অটোমোবিল মন

'But I don't want to go among mad people,' Alice remarked. 'Oh, you can't help that,' said the Cat : 'We're all mad here. I'm mad. You're mad.'

Alice in Wonderland

অটোমোবিলের ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে আমরা স্পীডের জন্য পাগল বিজনেসের জন্য পাগল স্টেটাসের জন্য পাগল। রাস্তার ট্র্যাফিক সিগন্যাল দেখে ডাইনেই যাই আর বাঁয়েই যাই, ট্র্যাফিকপুলিশবেশী মার্জার আমাদের যেন বলে দেয়—'In *that* direction lives a Hatter , and in *that* direction lives a March Hare. Visit either you like : they're both mad.' ওদিকে যান—ক্যাডিলাকমালিক। এদিকে যান—স্কুটারমালিক। যাঁর কাছে ইচ্ছা যেতে পারেন দু'জনেই পাগল। যেমন 'হ্যাটার' তেমনি 'হেয়ার'। যেমন নেকড়েবাঘ তেমনি বেড়াল। প্রত্যেকেই পাগল এবং গোলাকার বলের মতো জীবনবৃত্তে ঘূর্ণায়মান। অটোমোটিভ যুগের গতির direction মাত্র দু'টি। একটি ঊর্ধ্বগতি আর একটি নিম্নগতি। হয় উঠতে হবে নাহয় নামতে হবে। উঠবার সময় মনে হয়

Up above the world you fly,
Like a tea-tray in the sky,
Twinkle-twinkle—

এবং নামবার সময় মনে হয় যেন টানেলের মতো শশকের গর্তের ভিতর দিয়ে দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি—'that would be four thousand miles down'.

ওঠারও শেষ নেই, নামারও শেষ নেই। শহর থেকে বিচ্ছুরিত রিবনরোডে কুশোর মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বাস করি এবং শামুকের মতো অটোর খোলকের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রেখে বেগের আবেগশিহরণ অনুভব করি এবং

> And no man knows or cares who is his neighbour
> Unless his neighbour makes too much disturbance,
> But all dashed to and fro in motor cars,
> Familiar with the roads and settled nowhere ··
>
> T. S. Eliot

প্রতিবেশীদের আমরা জানি না চিনি না জানতেও চাই না চিনতেও চাই না যদি না অবশ্য প্রতিবেশীরা ভয়ানক কোনো গণ্ডগোল ক'রে নিজেদের জানাতে চায় অথবা চেনাতে চায়। আমাদের সময় নেই। আমরা যাই আব আসি এবং আসি আব যাই দুরন্ত বেগে মোটরে। আমরা কিছু পথ চিনি আর কিছু চিনি না শুধু ঝড়ের বেগে ছুটে চলি সেই পথের উপর দিয়ে অথচ আমাদের স্থিতি নেই কোথাও। আমাদেব পরিবাব চৈতালি ঘূর্ণির মুখে ঝরাপাতাব মতো ছিন্নভিন্ন তাই ছেলেরা মোটরসাইকেলে হাওয়ার বেগে ঘুরছে আর মেয়েরা তাদের বন্ধুর অটোসাইকেলের পেছনে উধাও কে জানে কোথায়—

> Nor does the family even move about together
> But every son would have his motorcycle
> And daughters rideaway on casual pillions
>
> Eliot

> যুবাবা সব যে যার ঢেউয়ে,
> মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
> কোথায় আছে জানি না তো ..
>
> জীবনানন্দ দাশ

যখন পাখির ডাকে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত যখন পাখির ডাকে মানুষ জাগত তখন গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়ে গরুব গাড়ি চলত এবং রাখালরা গান গেয়ে গেয়ে গরুর পাল নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত। তারপর একদিন পাখির ডাকে মানুষের ঘুম যদি আর না ভাঙে এবং রাতের শেষ প্রহরের মোরগের ডাকে মানুষ যদি আর না জাগে, যদি ঘোড়াব খুরেব খটখট শব্দে মানুষের ঘুম ভাঙে তাহলে জানলা দিয়ে ভোরের আলোয় সে প্রথম দেখবে আধুনিক শহরের মুখ, গ্রামের মুখ নয়। গ্রাম ভেঙে নতুন শহর গড়ে উঠেছে, ধনতান্ত্রিক যুগের শহর। গ্রাম আছে, কিন্তু গ্রামের যুগ আব নেই, শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়া ঘোড়সওয়ার ও ঘোড়ার গাড়িব উদীয়মান তেজীয়ান বুর্জোয়া মালিকরা কদমগতিতে আধুনিক শহর সর্বপ্রথম দখল ক'রে ফেলেছে। যেমন আঠেরো শতক ও উনিশ শতকের কলকাতা শহর করেছিল।

মধ্যযুগের শহরে ধনীদরিদ্র উচ্চনিম্নশ্রেণীর লোকজন অনেকটা গা ঘেঁষাঘেষি ক'রে চলত। চলতে তারা বাধ্য হত কারণ চলার পথের সংকীর্ণতা ছিল মধ্যযুগের শহরের বৈশিষ্ট্য। ধনিকরা ষোল বেয়ারার পালকি ক'রে অথবা তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে চড়ে যে ভাবেই চলুন না কেন তখন অলিগলিতে সাধারণ লোককে চলবার মতো একটু পথ তাদের ছেড়ে দিতে হত। ঘোড়ার লাগাম টেনে তারা অন্তত একটু সরে দাঁড়াত। আধুনিক যুগের শহরে যখন বড় বড় অ্যাভিনিউ ও রাজপথ তৈরি হল তখন আর সাধারণ লোকের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন রইল না। এখন শুধু ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ার নয় তার সঙ্গে ঘোড়াগাড়িও চলবে। সরুপথ তাই চওড়া হল। ধনীদরিদ্রের বিভেদবৈষম্য বিস্ফারিত ক'রে আধুনিক শহরের রাজপথ বিস্তৃত হল। এই আধুনিক ধনতান্ত্রিক শহরের রাজপথের প্রশস্ততা মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণীব্যবধানের প্রশস্ততার প্রতীক। আধুনিক শহরের রাজপথের উপর দিয়ে বড়লোকরা 'ড্রাইভ' ক'রে যাবেন আর তার পাশে সাত হাত দূরে সাধারণ লোকরা ভয়ে ভয়ে পায়ে হেঁটে চলবে। শহরের গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউয়ের উপর দিয়ে যাবে বিত্তবানদের বেগবান অশ্বযান আর বিত্তহীনরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পথ ছেড়ে দেবে এবং হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পাশের খানানরদমায় পড়বে :

> Now, with the development of the wide avenue, the dissociation of the upper and the lower classes achieves form in the city itself. The rich drive : the poor walk. The rich roll along the axis of the grand avenue : the poor are off-centre in the gutter : and eventually a special strip is provided for the ordinary pedestrian, the side-walk. —Mumford

সতেরো শতকে ফ্রান্সের পথে স্টেজকোচ চলতে আরম্ভ করে। হঠাৎ এই চলার গতি—যন্ত্রের নয়, দ্রুতগামী অশ্বের গতি—সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিষম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তা কল্পনা করা যায় না। এই সময়কার একজন ফরাসী লেখক লিখেছেন : 'অশ্বযান থেকে সাবধান! কালো কোট পরে ফিজিসিয়ান যাচ্ছেন chariot-এ, ড্যান্সিং মাস্টার যাচ্ছেন cabriolet-এ, ফেন্সিং মাস্টার যাচ্ছেন diable-এ, প্রিন্স যাচ্ছেন ছ'ঘোড়ার গাড়িতে গ্যালপ করতে করতে। সকলের গাড়ির চাকার তলায় রক্তের দাগ, ঘোড়ার খুরে রক্তের দাগ, পথের খোয়ায় রক্তের দাগ। বিভ্রান্ত পথিকের ফাটা মাথার রক্ত, ভাঙা হাড়গোড়ের রক্ত।' এটা মোটেই অতিরঞ্জিত উক্তি নয়। বাস্তবিক সতেরো শতকে ফ্রান্সে স্টেজকোচ চলবার পর ঘোড়ার খুরের দাপটে পথে যত দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে রেলরোডের যুগেও ঘটেনি। অবশ্য আট দশ বারো ষোল অশ্বগতির (horse-power) অটোমোবিলের যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শহরের রাজপথে ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘটছে।

কলকাতা শহরে আঠেরো শতককে মোটামুটি পালকির যুগ বলা যায়। এদেশী ও বিদেশী অভিজাতরা সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী নানারকমের পালকিতে চড়ে বেড়াতেন। আঠেরো শতকে ঘোড়াগাড়িরও প্রচলন হয়েছিল কিন্তু প্রাধান্য ছিল পালকির। উনিশ শতকের কলকাতাকে অশ্বযানের যুগ বলা যায়। যদিও পালকি অন্তর্ধান করল না তাহলেও প্রাধান্য হল অশ্বযানের। জীবনে নতুন গতি সঞ্চার করল ঘোড়া। দুই ঘোড়া চার ঘোড়া ছয় ঘোড়া আট ঘোড়া নানারকমের গাড়ি নিয়ে দৌড়তে লাগল কলকাতার রাস্তায়। মাটির রাস্তা হল খোয়াবাঁধানো রাস্তা, সরু রাস্তা হল চওড়া রাস্তা। অশ্বযানের চলার গতি বাড়ল। কতরকমের অশ্বযান কলকাতা শহরের রাস্তায় চলত। ব্রিৎসকা বরুচ ল্যাণ্ডো কেরাঞ্চি চ্যারিয়ট ফিটন ব্রাউনবেরি পালকিগাড়ি। ব্রিৎসকা বরুচ ও ব্রাউনবেরি ছিল ফিটনল্যাণ্ডোর রকমভেদ মাত্র। কেরাঞ্চি ও পালকিগাড়ি প্রায় একরকমের ছিল। কেরাঞ্চি ও পালকিগাড়ি ছিল একজাতের এবং তাদের সংখ্যাও ছিল সবচেয়ে বেশি। একজন বিদেশী পর্যটক উনিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার রাস্তায় কেরাঞ্চির চেহারা ও চলা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে নেটিভরাই কেরাঞ্চিতে বেশি চড়ে এবং সাধারণত গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে। রাস্তায় একসঙ্গে ছ'সাতখানা কেরাঞ্চি চলতে দেখা যায় বিশেষ ক'রে পূজোপার্বণ বা শহরে কোনো উৎসবের সময়। এসব দেখে তিনি অবাক হননি কিন্তু অবাক হয়েছেন কেরাঞ্চির অস্থিচর্মসার ঘোড়াগুলোকে দেখে—'**The ponies that draw this sorry vehicle are mere skin and bone.**'। এই কেরাঞ্চি ও পালকিগাড়ির চলতি বাংলা নাম ছিল 'ছ্যাকরা' বা 'ছক্কোড়'। শহরের মধ্যবিত্তদের প্রিয়তম যান। পালকির চেয়েও প্রিয়। কারণ ছ্যাকরার হাড়গোড়সার ঘোড়ারও চলার একটা গতি ছিল ছন্দ ছিল যা পালকির ছিল না বা গোগাড়িরও ছিল না।

তখন গঙ্গার ধারে কলকাতা শহরে বায়ুসেবনের আদর্শ স্থান ছিল স্ট্র্যাণ্ড রোড—'**The streets leading thither are resounding with the tramping of horses, the rolling of carriages, the cracking of whips and the shouts of the sable Jehus**' (১৮৩০-৪০ সাল)। আজকের দিনে ময়দানে অথবা ভিক্টোরিয়া হলের চারিদিকে আগাগোড়া গঙ্গার ধারে অথবা রবীন্দ্রসরোবরে আমোদপ্রিয়দের যে ভিড় হয় তা সেকালের স্ট্র্যাণ্ডে হত না, হবার কথাও নয়, কারণ কলকাতার লোকের সংখ্যাই তখন এর বিশভাগের একভাগ ছিল কিনা সন্দেহ। যানবাহনের সংখ্যাও অশ্বযান ও পালকি মিলিয়ে অনেক কম ছিল। এখন ময়দানে বা সরোবরে মনে হয় লোকের চেয়ে অটোমোবিলের সংখ্যা বেশি কিন্তু তখন স্ট্র্যাণ্ডের ছ্যাকরা ল্যাণ্ডো বগি ও পালকির ভিড় দেখে তা মনে হত না। শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস তাঁর

Wanderings of a Pilgrim (লণ্ডন ১৮৫০) গ্রন্থে লিখেছেন : 'even the most petty-European shop-keeper in Calcutta has his buggy, to enable him to drive out in the cool of the evening' (১৮২৩-২৪)। বগি ও ল্যাণ্ডো সাধারণত সাহেবদেরই প্রিয় ছিল এবং সাহেব দোকানদাররা পর্যন্ত সন্ধ্যায় বগিতে চড়ে বেড়াতে বেরুতেন। গাড়ির মালিকের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি ছিল না। এমনকি আনুপাতিক হিসেবেও বলা যায় যে আজকের দিনের কলকাতার জনসংখ্যা অনুপাতে অশ্বযান ও পালকির মিলিত সংখ্যাও কম ছিল। তাহলেও সাধারণ লোকের যদি ঘোড়া বা ঘোড়াগাড়ি চড়ার ইচ্ছা হত তাহলে তা জোগাড় করতে তাঁদের অসুবিধা হত না। গাড়ি ও ঘোড়া দুই-ই ভাড়া পাওয়া যেত, শুধু একদিনের জন্য নয়, একমাস বা মাসাধিককালের জন্যও। ইংরেজরা তার জন্য কলকাতা শহরে বেশ বড় বড় স্টেবল তৈরি করেছিলেন। ধর্মতলা বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের বড় বড় আস্তাবল ছিল এবং সেখানে ভাড়া দেওয়ার জন্য নানারকমের গাড়ি ও ঘোড়া থাকত। হাণ্টার অ্যাণ্ড কোম্পানি, কুক অ্যাণ্ড কোম্পানি, এঁরা ছিলেন শহরের নামজাদা 'স্টেবল-কীপার' এবং তখনকার সাময়িকপত্রে গাড়ি ও ঘোড়ার ভাড়ার 'রেট' জানিয়ে তাঁরা বিজ্ঞাপন দিতেন। এরকম একটি বিজ্ঞাপনের নমুনা এই :

ঘোড়া একজোড়া	দৈনিক ১০ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা
ঐ এবং একজনের মতো গাড়ি	দৈনিক ১৬ টাকা মাসিক ২৫০ টাকা
ডবল সিটের চ্যারিয়ট	দৈনিক ২০ টাকা মাসিক ৩০০ টাকা
একজনের ক্যারেজ	দৈনিক ৪ টাকা মাসিক ১২০ টাকা
দুজনের ক্যারেজ	দৈনিক ১০ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা
বগি ও ঘোড়া	দৈনিক ৮ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা
ঘোড়া একটি	দৈনিক ৫ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা

The Bengal and Agra Annual Guide and Gazetteer for 1841

এরকম ভাড়া দিয়ে যাঁরা ঘোড়া বা ঘোড়াগাড়ি চড়তেন তাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত নন, রীতিমত বিত্তবান। অটোমোবিলের যুগেও অটোকিপার ও অটোগ্যারাজ অনেক আছে এবং সেখান থেকে প্রাইভেট অটো দৈনিক ও মাসিক হারে ভাড়াও পাওয়া যায়। কিন্তু একালের অটোগ্যারাজের সঙ্গে সেকালের লিভারিস্টেবলের কোনো তুলনা হয় না। অশ্বযান ও অটোযানের মধ্যে যেমন পার্থক্য, ঠিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও সেই পার্থক্য। জীবনের পথে চলার গতি ও ছন্দের পার্থক্য তো আছেই।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা যায় কলকাতা শহরের রাস্তায় দু'-একটি পোষা হাতিও চলে বেড়াত। হাতি হল ফিউডাল যুগের দীর্ঘস্থায়ী symbol

এবং কলকাতা শহরে তখনো হাতি ছিল যথেষ্ট কারণ কলকাতার নাগরিক সমাজে তখনো ফিউডাল সমাজের প্রভাব ছিল ব্যাপক। হাতি তারই প্রতিভূরূপে ঘুরে বেড়াত কলকাতার পথে। সামন্তযুগের গথিক গজমূর্তি স্বভাবতই নতুন যুগের ঘোড়াকে সন্ত্রস্ত করত। এমন দুর্ঘটনা কলকাতার পথে অনেক হয়েছে যে শহরের পথে হঠাৎ গজেন্দ্রগামী গজমূর্তি দেখে ভীতআতঙ্কিত ঘোড়া পথের পাশে বা নালানরদমায় চলন্ত গাড়ি যাত্রীসমেত উলটে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছে। আরো অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে কলকাতার রাস্তায় উনিশ শতকের অশ্বযানের যুগে। সাহেব ও এদেশী ধনিকদের ল্যাণ্ডো ফিটন চ্যারিয়টের মেজাজী ঘোড়ার চলার দ্মামাকে খোয়াবাঁধানো কলকাতার পথ যেমন কেঁপে উঠেছে তেমনি সাধারণ লোকের বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠেছে ভয়ে। তারা বুঝেছে যে একটা যুগ অস্ত গিয়েছে সেটা হল ঢিমেতালের গোযানের যুগ এবং তার বদলে আর একটা নতুন যুগের অভ্যুদয় হয়েছে সেটা হল কদমতালের অশ্বযানের যুগ। আসল যান্ত্রিক অটোমোবিলের যুগ তখনো কিন্তু অনেক দূরে। শুধু কলকাতায় নয়, ইংলণ্ড-ইয়োরোপের শহরেও।

ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন: **'The common use of the motor car and motor bicycle was still in future when Victoria died.'**। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর সময় (১৯০১) মোটর ও অটোসাইকেলের প্রচলন ইংলণ্ডেও বিশেষ হয়নি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে ফিউডাল সমাজের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল যদিও ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় **'the penetration of village life by forces and ideas form the cities'** কিছুটা সম্ভব হয়েছিল প্রধানত বাষ্পীয় রেলওয়ের বিস্তারের ফলে। পরবর্তী 'জেনারেশনে' অর্থাৎ আরো পঁচিশ তিরিশ বছর পরে **'With the coming of motor transport, the intrusion of urban life upon the rural parts, became aflood, turning all England into a subusb.'**। অর্থাৎ বিশ শতকের প্রায় যৌবনকালেই বলা চলে প্রকৃত অটোমোটিভ যুগের সূত্রপাত হয়। শহর ও গ্রামের ব্যবধান দূর ক'রে দিয়ে অটোমোবিল গ্রামের দিকে নাগরিক জীবনধারার প্রবাহপথ মুক্ত ক'রে দেয়। তখন শুধু লণ্ডন নয় অথবা ম্যাঞ্চেস্টারের মতো শিল্পনগরও নয় সারা ইংলণ্ড দেশটাই যেন একটা শহরতলিতে পরিণত হয়ে যায়। ইংলণ্ড তখন কলকাতার শাসকদের দেশ। সেখানেই যদি বিশ শতকের বিশ পঁচিশ বছর উত্তীর্ণ হবার আগে প্রকৃত অটোমোবিল যুগের সূচনা না হয়ে থাকে তাহলে কলোনিয়াল কলকাতায় নিশ্চয়ই তা হবার কথা নয়। তা হয়ওনি।

উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৫ সালে দেখা যায় কারখানায় মাত্র ৩০০ মোটর তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯০০ সালে ৫০০০। ১৯০৫ সালে ২৫০০০।

১৯১০ সালে ১৮৭৩০। ১৯১৫ সালে ৮৯২৬১৮। ১৯২০ সালে ২২ লক্ষ মোটর তৈরি হয়। তাহলে দেখা যায় ১৯১৫-২০ সাল থেকেই অটোমোটিভ যুগের সূচনা হয়েছে। খুব বেশি হলে অটোমোবিল যুগের বয়স ৫০ বছরের বেশি নয়। অথচ গত হাজার হাজার বছরেও মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের জীবনে যে গতি সঞ্চার করা সম্ভব হয়নি, তা এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সম্ভব হয়েছে। এই গতি শুধু বিস্ময়কর বলে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কি বৈপ্লবিক বললেও অর্ধেক বলা হয়। নৃবিজ্ঞানী রবার্ট লাউই (Robert Lowie) সুন্দর ভাষায় সভ্যতার এই অগ্রগতির একটি ইমেজ রচনা করেছেন :

> 'We may liken the progress of mankind to that of a man of one hundred years old, who dawdles through kindergarten for eighty-five years of his life, takes ten years to go through the primary grades, then rushes with lightning rapidity through grammar school, high school and college.'

আজ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির বয়স যদি একশ বছর ধরা যায় তাহলে বলতে হয় যে পঁচাশি বছর ধরে কিণ্ডারগার্টেনে আমরা শিশুদের মতো কলকাকলি করেছি তার পরের দশ বছর প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছি এবং তার পরের পাঁচ বছরে তড়িৎগতিতে একেবারে উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত সোপান পার হয়ে এসেছি। অটোমোবিলের সঙ্গে বিমানের যুগের কথা ভাবলে শেষের পাঁচ বছরকে পাঁচ মাস বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উনিশ শতক শেষ হবার দু'চার বছর আগে যখন পৃথিবীতে কারখানায় তৈরি মোটরের সংখ্যা তিন চারশোর বেশি ছিল না তখন কলকাতার পথে প্রথম মোটরগাড়ি চলতে আরম্ভ করে। কলকাতার প্রথম মোটরগাড়ি দেখেছেন এরকম অনেক লোক আজও বেঁচে আছেন। তাঁদের বয়স ৮০ বছরের বেশি নয়। ১৯০৪ সালে কলকাতায় মাত্র চারজন লোকের নামে চারখানি মোটরগাড়ি রেজেষ্ট্রি করা ছিল। এই চারজন মোটরের মালিকের মধ্যে তিনজন ইংরেজ এবং একজন বাঙালি 'বসাক'। ১৯১০ সালের আগে কলকাতার রাস্তায় 'ট্যাক্সি' চলত না। ১৯১০ সালের শেষে দেখা যায় সতেরোখানা 'ট্যাক্সি' কলকাতায় চলাফেরা করছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে কোন উদ্যোগী ব্যক্তি (A. Shovan) দু'খানি খোলা ট্রাকের উপর বেঞ্চি পেতে প্রথম 'পাবলিক বাস' চালাবার চেষ্টা করেন খিদিরপুর থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত। তারপর ১৯২১ সালে ট্রামওয়ে কোম্পানি ১৪খানি বাস কলকাতায় চালাতে থাকেন। বিশ শতকের বিশের পর থেকে কলকাতা শহরে অটোমোবিল যুগের সূচনা হয়েছে দেখা যায়। তিরিশের শেষ পর্যন্ত তার খুব

দ্রুত প্রসার হয়নি। কলকাতায় তখন পালকি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেও ঘোড়াগাড়ির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশ থেকে অটোমোবিলের অতিদ্রুত প্রসার হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তার সঙ্গে এসেছে বিমানের যুগ। জলপথের পর স্থলপথ তারপর আকাশপথ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গত কুড়ি বছরের মধ্যে কলকাতা শহরের মেট্রোপলিটন জীবনের মতো অটোমোটিভ জীবনেরও বৈদ্যুতিক বিকাশ হয়েছে।

লাউই শিক্ষাব স্তর দিয়ে অগ্রগতির 'ইমেজ' তৈরি করেছেন। মানুষেব লোকোমোশনের স্তর দিয়ে কলকাতার চলার গতির এরকম একটা 'ইমেজ' তৈরি করা যায়। যেমন বলা যায় যে গরু পালকি হাতি আর কিছু ঘোড়া নিয়ে আঠেরো শতকের কলকাতা শহর শৈশবেব দোলনায় দোল খেয়েছে। তারপর উনিশ শতকে পালকি ল্যাণ্ডো ফিটন চ্যাবিয়ট ও ছ্যাকোড নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। বিশ শতকে প্রায় তিরিশের শেষ পর্যন্ত ওরাং-শিম্পাঞ্জীর মতো 'brachiation' বা হেলেদুলে চলার পর্ব কেটেছে। চল্লিশ থেকে কলকাতা শহরের 'bipedal locomotion' বা সোজা হয়ে দুপায়ে দাঁড়িয়ে চলার পর্ব শুরু হয়েছে। গত কুড়ি বছরেব মধ্যে কলকাতা শহর যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে শিখেই দু'চার পা চলে একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করেছে। কোথায় দৌড়চ্ছে কেন দৌড়চ্ছে তার কিছুই জানে না। কলকাতা শহর কেন লণ্ডন প্যারিস বার্লিন নিউইয়র্ক মস্কো টোকিও পৃথিবীর কোনো ধনতান্ত্রিক শহরই তা জানে না। 'অটোমোবিলিটি' বা আত্মগতির যুগ এবং আত্মগতি যান্ত্রিক গতি। এই গতির কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই কোনো সীমানা নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—আছে শুধু ছক্‌কাটা শানবাঁধানো পথেব উপর দিয়ে টাকা ও মুনাফাব ধান্ধায় অন্ধবেগে চলার গতি। কেবল গতি আর গতি। এ কিন্তু ঝঞ্ঝামদরসমত্ত বলাকার পাখার গতি নয়, শুধু স্বতঃগতিশীল অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন দিশাহারা জীবনের দুর্দান্ত অন্ধগতি, প্রচণ্ড আত্মঘাতী সর্বনাশে যার শেষ। মনোপলি ক্যাপিটাল ও টেকনোলজির যুগের চূড়ান্ত দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যতা।

অটোমোবিলযুগের মেট্রোপলিটন শহরের সঙ্গে রেলরোডযুগের নগর-বিন্যাসের পার্থক্য আছে। রেলরোডযুগে কলকাতার মতো যে-কোনো বড় শহব হয় রেলপথের প্রান্তীয় কেন্দ্র। জলপথের প্রান্ত ও রেলপথের প্রান্ত হয়ে যে শহর গড়ে ওঠে সেখানে জনবসতি স্বভাবতই ঘনীভূত হয় অর্থনৈতিক কারণে। মানচিত্রে শহরটাকে মনে হয় যেন একটা জমাটবাঁধা জনপিণ্ড। চারিদিকের জনবিরল গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরাট একটা পর্বতপ্রমাণ ইটপাথরের স্তূপের মতো জনবহুল শহর দাঁড়িয়ে থাকে এবং স্তরে স্তরে তার জনপুঞ্জ যেন ফেঁপে উঠতে থাকে। কিন্তু অটোমোবিলযুগে শহর যখন চারিদিকে প্রসারিত

মোটররোড দ্বারা বাহুর মতো বেষ্টিত হয় তখন তার আসল মেট্রোপলিটন রূপের বিকাশ হতে থাকে। শহরকেন্দ্র থেকে দূরে এইসব মোটরপথের আশপাশে নতুন নতুন জনবসতি গড়ে ওঠে। তাতে মূল শহরকেন্দ্রে জনপুঞ্জের চাপ যে কমে যায় তা নয়, বরং দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের ভিতরের ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে আগেকার শহরতলির সীমানা ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত নতুন নতুন শহরতলি ও জনবসতি গড়ে ওঠে। রেলপথের দূরত্বের উপর এই ধরনের নতুন জনবসতিকে আর একান্ত নির্ভর করতে হয় না, কারণ অটোপরিবহন তাদের রেলবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেয়। সুনির্দিষ্ট রেলপথমুক্ত মেট্রোপলিটন শহরের আকৃতি হয় বহুপাকে জড়ানো মোটাদানার হারের মতো, যার মধ্যে বিরাজ করে পরস্পরসংলগ্ন শিরার মতো বিস্তীর্ণ অটোপথ। হারের মোটাদানাগুলি হলো নতুন সব জনবসতি।

ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন যে অটোমোবিলের যুগে গোটা ইংলণ্ড দেশটাই যেন একটা বিরাট শহরতলির রূপ ধারণ করছিল এবং **'the intrusion of urban life upon the rural parts'** যেন বন্যার বেগে আরম্ভ হয়েছিল। একথা যে কতখানি সত্য তা বর্তমান কালের কলকাতার রূপ দেখলেই বোঝা যায়। কলকাতার দশপনেরবিশ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত গ্রামাঞ্চল আজও দেখা যায় সেগুলি শহর থেকে উদ্গীর্ণ জনপুঞ্জের চাপে, নাগরিক জীবনের প্রবল অটোপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রুত তাদের গ্রামত্ব বিসর্জন দিয়ে নয়াশহরতলির রূপ ধারণ করছে। কেবল যে শহরমুখী নতুন জনবসতির চাপেই এটা হচ্ছে তা নয় কিন্তু, মেট্রোপলিটন শহরের অবিরাম আত্মপ্রসারের গতি কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলের জমিব্যবহারপদ্ধতিও **(land-utilization-pattern)** একেবারে বদলে দিচ্ছে। নতুন নতুন কলকারখানা কর্মকেন্দ্র বাজার স্কুল কলেজ হাসপাতাল সিনেমা আবাসিক বিদ্যালয় যত মেট্রোপলিটন শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, যত বাঁধা রেলপথ ও অবাধগতি মোটর-পথের চারপাশে নতুন জনবসতি তৈরির চাহিদা বাড়ছে, তত আবাদী জমির প্রান্তরেখা দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শহরের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী **(city-market-oriented)** কিছু হয়ত পণ্যফসলের আবাদ হচ্ছে, কিছু পোলট্রি-ডেয়ারি হচ্ছে কিন্তু খাদ্যশস্যের এলাকা ক্রমেই পশ্চাতে অপসারিত হচ্ছে। এইভাবে মেট্রোপলিটন শহর অটোমোবিলের অবাধগতির ফলে বহুদূর পর্যন্ত পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের গ্রামত্ব ধ্বংস ক'রে ফেলছে। শহর থেকে কাছে রেলপথের আশপাশে হয়তবা এখনো গ্রামের শ্যামলশ্রী একটুআধটু দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ মধ্যে মধ্যে সবুজ ধানের ক্ষেতও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু মেট্রোপলিটন সীমানার মোটরপথে গ্রাম্য নিসর্গের এই রূপ আর বড় একটা দেখা যায় না। কলকাতা শহর থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল

দূর পর্যন্ত আজও রেলযাত্রী যে দৃশ্য দেখতে পান, মোটরযাত্রী ঠিক তা দেখতে পান না। রেলপথ ও মোটরপথের মাঝামাঝি যে শূন্যস্থানটুকু আজও রয়েছে, অদূরভবিষ্যতে অটোমোবিলের গতিপথের শাখাপ্রশাখা বিস্তারে তা ভরাট হয়ে যাবে। এগুলি হলো অটোমোবিলের সামাজিক জীবনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কথা। রেলরোডের রেডিয়াস ধ'রে বাষ্পীয় পরিবহনের যুগে শহর তার প্রভাব বিস্তার করত গ্রামাঞ্চলে এবং সেই প্রভাব কখনো ব্যাপক রূপ ধারণ করত না। অটোমোবিলের যুগে চারিদিকে প্রসারিত অটোপথে রবিরশ্মির মতো শহরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামাঞ্চল ক্রমে প্রসার্যমান শহরতলিতে রূপায়িত হতে থাকে। মানুষের জীবন শহরমুখী ও শহরনির্ভর হয়ে ওঠে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান ভেঙে যায়। শহরের অভাব-অভিযোগ শহরের দাবিদাওয়া শহরের জীবনযাত্রা শহরের নীতি-দুর্নীতি শহরের ভোগবিলাস এবং সবার চেয়ে বড় সত্য শহরের নির্বিকার যান্ত্রিক মন অবাধগতিতে গ্রামাঞ্চলেও প্রবেশ করে। অটোমোটিভ যুগে গ্রাম্য মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় 'auto-complex' ও মেট্রোপলিসের মেকানিকাল মর্মরের মধ্যে সেই মনের মতো গ্রামের মানুষটিও যেন হারিয়ে গিয়েছে। সারল্য ও সভ্যতার সেই উচ্ছলতা, অকৃত্রিম মানবিকতার সেই বনফুলের মতো সৌরভ, ডিজেল গেসোলিনের ধোঁয়ার দুর্গন্ধে চাপা পড়ে গিয়েছে। আর কোনোদিন তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ্রামের গ্রামত্ব মানুষের মনুষ্যত্ব জীবনের রূপরসগন্ধস্পর্শ অটোমোবিল ও অটোমেশনের পেষণে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষভ্রষ্ট যান্ত্রিকতার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবে মানুষের নির্লিপ্ততা ও নির্জনতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে অটোমোবিল আর একদিকে নতুন অটোমেশন। চলার গতি থেকে কর্মের গতি পর্যন্ত নিরন্ধ্র যান্ত্রিকতা। তার উপর যত দিন যাচ্ছে তত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়ছে এবং জ্যামিতিক প্রগ্রেসনে মানুষ বাড়ছে। জীবন ক্রমে শহরমুখী ও শহরনির্ভর হয়ে উঠছে। মানুষের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে শহর। বড় বড় শহর তাই 'পলিস' থেকে 'মেট্রোপলিস' ও 'নেক্রোপলিসে'র মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পদে পদে যান্ত্রিকতা এবং তার সঙ্গে পাশাপাশি দৈত্যের মতো বিপুল জনতার দলনমর্দন। এর মধ্যে পড়ে মানুষ তার নিজস্ব মানবিক মূল থেকে কখন যে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা সে নিজেই জানতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণিগত সম্পর্কের ক্ষীণ সূত্রটুকুও লোপ পেয়ে যায়। স্থূল দৈহিক সান্নিধ্য আছে—সান্নিধ্য কেন, দৈহিক দলন বলা চলে—যেমন পাবলিক বাসের ভিড়ে, দৈনিক প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অথবা স্থলপথে যেকোনো যান্ত্রিক পরিবহনে। বহু মানুষ একত্রে চলাফেরা করছে কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে কারও

সঙ্গে কোনো আত্মিক সংযোগ নেই। মনোবিজ্ঞানী বারো (Trigant Burrow) বলেছেন : 'Today human relations are throughout superficial and not fundamental. They are psycho-social, not biological.' মানুষেব সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—সামাজিক হোক আব ব্যক্তিগত হোক—একটা বাহ্য আচার-সর্বস্ব গতানুগতিক সম্পর্ক মাত্র। এমন কোনো গভীব সম্পর্ক নয়, প্রাণ পর্যন্ত যার শিকড় প্রসাবিত। এই বাহ্য সম্পর্ক আধুনিক মানুষেব, বিশেষ ক'রে ধনতান্ত্রিক যুগেব নাগবিক মানুষেব লোকেকাত্মতাবোধ (community feeling) নষ্ট ক'বে দিচ্ছে। লবেন্স একবাব চিঠিতে বাবোকে লিখেছিলেন : 'I believe as you do...... that it is our being cut off that is our ailment, and out of this ailment everything bad arises.' আমাদেব আসল ব্যাধি হলো আজকেব দিনে অত্যন্ত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও মানুষে-মানুষে দূবত্ব কমছে না ববং প্রতিদিন বাড়ছে। মানবিক সম্পর্কেব এই দূরত্ববোধ থেকে সামাজিক জীবনে সববকমেব কদর্যতা ফুটে উঠছে এবং কদর্যতার বীভৎস বৈচিত্র্যও বাড়ছে।

মহানগবেব উত্তাল জনসমুদ্রে প্রত্যেকটি মানুষ যে-যার জীবননৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ঢেউয়েব আঘাতে ওঠানামা কবছে, কোথাও কোনো কূল নেই কিনারা নেই দ্বীপ নেই যেখানে সে নোঙব কবতে পাবে। নোঙবহীন নৌকার যাত্রীব মতো সাবাজীবন যদি জনসমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হয় তাহলে সামাজিক মানুষ হিসেবে তো বটেই, একান্ত ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবেও জীবনেব পূর্ণতাবোধ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এই পূর্ণতাবোধেব অভাবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতকটা প্রকৃতিব প্রতিশোধের মতো দেখা দিতে থাকে। অথচ নাগবিক জীবনে জনসমাবেশের সুযোগ অফুরন্ত। আজ জনসভা কাল প্রদর্শনী তাবপব কোনো বাজনৈতিক নায়কের আগমন উৎসব পার্বণ এরকম শত শত অনুষ্ঠান জনসমাকীর্ণ হয়। কিন্তু এই জনতা মিছিল বা শোভাযাত্রা কোনোটাই সত্যকার সমাজসংবদ্ধতা (socialization) সামাজিক জনসংযোগ (social participation) ও মানবিক একাত্মতাবোধ জাগ্রত কবে না বরং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (de-socialisation) পথ সুগম ক'রে দেয়।

বাণিজ্যিক বা আর্থিক স্বার্থ ছাড়া শহরে যখন মানুষের সঙ্গে মানুষ কথা বলে তখন মনে হয় যেন না বললে নয় অথবা বলতে হয় তাই বলে। অতিপরিচিত লোকের সঙ্গেও পথ চলতে দেখা হলে পবস্পর সম্ভাষণ জানিয়ে যখন কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে তখন শুধু চোখ আর ঠোঁটের বাইরের যান্ত্রিক ক্রিয়াটুকু ছাড়া তাতে বিশেষ আর কিছু থাকে না। সংযোগশূন্য আত্মনির্বাসিত জীবনের

ক্লান্তিতে আমরা এতদূর অবসন্ন হয়ে পড়ি যে কারো সঙ্গে কারো সামান্য একটু কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। দূর থেকে কোনো কথা বলার মতো লোক দেখলেই ভয় পাই এবং কি ক'রে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করি। প্রত্যেকেই আমরা দ্বীপান্তরিত হতে চাই অর্থাৎ একলা থাকতে চাই। এলিয়টের ককটেল পার্টির Celia-র স্বীকারোক্তির কথা মনে হয়—

'……Do you know—
It no longer seems worthwhile to speak to anyone !
No……it isn't that I want to be alone,
But that everyone's alone—or so it seems to me.
They make noises and think they are talking to each other ,
They make faces, and think they understand each other.
And I'm sure that they don't….. '

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে 'গ্রামবাসীদের প্রতি' রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন : 'ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ—হাজার হাজার, বহু শত সহস্র। তারপর যান্ত্রিক সম্পৎ প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরি করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস ক'রে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে—শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই—কলকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।'

বাস্তবিক তাই। মহাসাগরের জনসমুদ্রে প্রতিদিনের জীবনতরঙ্গের গর্জানির মধ্যে আমরা বুদ্‌বুদের মতো বিলীন হয়ে যাই। সেই নিত্যনৈমিত্তিক জেগে ওঠা সেই ট্রাম বাস মোটর আফিস কারখানা খাওয়া আফিস কারখানা দশটা পাঁচটা আটটা ছ'টা সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার রবিবার ঘুম আবার সোম মঙ্গল ট্রাম বাস মোটর আফিস কারখানা—

'Waking, tramcar, 4 hours in office or factory, meal, tramcar, 4 hours work, meal, sleep, and monday, tuesday, wednesday, thursday, friday and saturday in the same rythm, this road in general is easily followed. But one day the 'why' comes out, and everything starts in this weariness mingled with surprise. 'Starts'—this is important. Weariness is the end of the actions of a machine-like life, but it inaugurates at the same time a movement of consciousness.'

—Albert Camus

ক্লান্তি অবসাদ নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তি বিরামহীন যান্ত্রিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। হঠাৎ একদিন প্রশ্ন জাগে মনে 'কেন?' কেন এই অলাতচক্রে চক্রমণ? চারিদিকের কুয়াশার দিকে চেয়ে তখন মনে হয় 'আমি আছি!' কুয়াশা ভেদ ক'রে একটা চেতনার আলোকবিন্দু চোখের সামনে ভেসে ওঠে। **'At the end of the awakening comes, in time, the consequence : suicide or recovery' (Camus).** অবশেষে হয় আত্মোদ্ধার না হয় আত্মবিলোপ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শেষ ব্যক্তিগত সমাধান।

কলকাতা শহরের নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন টেলিফোন ভবন অথবা আর-কোনো আটদশতলা ভবন থেকে অথবা হাওড়া ব্রিজ থেকে শানবাঁধানো পথের উপর কি জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যখন কোনো যুবক তার পরিবার আত্মীয়স্বজনদের ফেলে রেখে অচৈতন্যের অতল অন্ধকারে চিরদিনের মতো তলিয়ে যেতে চায় তখন শুধু দারিদ্র্যের সংগ্রামের ভয়ে সে তা করে না, পরন্তু একটা হৃদয়হীন যান্ত্রিক জীবনযাত্রার বিভীষিকা অসহনীয় হয়ে ওঠে বলে করে। চোখের সামনে জীবনটা যখন একটা দুস্তর মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে, কোথাও একটু সবুজ ঘাসের মধ্যেও প্রাণের স্নিগ্ধ স্পর্শ যখন পাওয়া যায় না তখন, শুধু তখন এদিকের এই জীবন আর ওদিকের ঐ মৃত্যুর মধ্যে সীমারেখাটুকু সে মুছে ফেলতে চায়। যে তা না পারে সে আবার প্রাত্যহিক জীবনের চাকায় ঘুরতে থাকে।

হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের প্রতিদিনের দু'লক্ষ শহরযাত্রীর সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আবার কলকাতার পথে চলতে থাকে। তারপর কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের আরো অন্তত তিরিশ লক্ষ লোক বাসে ট্রামে ট্রাকে মোটরে বাহিত হয়ে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনতার যে বিশাল ঢেউ সৃষ্টি করে তার মধ্যে সে হারিয়ে যায়। তার সঙ্গে বাস ট্রাক ট্যাক্সি অটোসাইকেল ও প্রাইভেট অটোমোবিল মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক চলন্ত যন্ত্রের খরস্রোতও মিলিত হয়। তখন এই যন্ত্রজোয়ার ও জনজোয়ারের মধ্যে সেই লোকটিও ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে—গর্জন হুংকার কান্না চীৎকার হাসি হর্ন হল্লা ঘণ্টা গুঞ্জন বিস্ফোরণ শিস্ গান স্লোগান হরিবোল রেডিও লাউডস্পীকার হাম্বা হাহাকার উল্লাস করতালি ঘর্‌ঘর্ ঘ্যান্‌ঘ্যান্—হাজার রকমের আওয়াজের মধ্যে সকলেই জাগে কিন্তু তার 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' আর জাগে না। দশগুণ বিশগুণ বেশি যাত্রীবাহী ট্রেনে বাসে ট্রামে যারা সবেগে আফিসে কারখানায় ঘরে গমনাগমন করে, তাদের 'আত্মা' হাজার হ্যাঁচকানিতেও জাগে না। জাগে শুধু 'রিপু' ষড়রিপু কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। ক্যাপিটালিস্ট মেট্রোপলিসে শুধু রিপু জেগে থাকে আর আত্মা যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেই আদিম ও

সনাতন ছয়টি রিপু কলরব করতে থাকে মেট্রোপলিসের পথে পথে আফিসে আফিসে কারখানায় কারখানায়। কামুক মানুষ ক্রুদ্ধ মানুষ লোভী মানুষ মোহান্ধ মানুষ মদমত্ত মানুষ মাৎসর্যদগ্ধ মানুষ মেট্রোপলিসে চলে বেড়ায়। রিপুর জোয়ারে জনতার ঢেউয়ে তাদের 'অহম্' তাদের 'আত্মা' আত্মপ্রকাশের কোনো পথ খুঁজে পায় না। অথচ তারা সকলে 'আত্মহত্যা' করে না। মেট্রোপলিসের এই কুৎসিত ভুবনেও তারা 'সৌন্দর্য' খুঁজে পায় এবং তাদের এই 'সুন্দর ভুবনে' তারা মরতে চায় না। তাই জীবনযন্ত্রের চাকায় তারা আবার ঘুরতে থাকে—সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি বাস ট্রাম ট্রেন ট্যাক্সি অটো আফিস কারখানা খাওয়া ঘুম জাগা দশটা পাঁচটা নটা ছ'টা—

'চৈতন্য' শুধু তাদেরই জাগে অথবা 'আত্মা' যাই হোক যারা অটো-ওনার যারা ব্যক্তিগত অটোমোবিলের মালিক। ওনার বা মালিকদের ব্যক্তিগতভাবে কেউ চেনে না জানে না, তাদের সগোত্র যারা তারা ছাড়া, কিন্তু তাদের অটোমোবিলকে চেনে। মালিক টল্-স্লিম সুদর্শন যুবক হোক আর গোলগাল বেঁটেখাটো কদাকার প্রৌঢ় হোক তাতে কিছু আসে যায় না। যে অটোমোবিলে মহানগরের পথে সে চলে বেড়ায় তার রূপ ও মডেলটাই আসল। সেটা হাম্বার না হাডসন, অস্টিন না মরিস, ক্যাডিলাক না প্যান্টিয়াক, ক্রাইসলার না স্টুডিবেকার না বুইক, প্রেসিডেন্ট না শেভ্রোলেট ওপালা, তাই দিয়ে তার ভিতরকার ব্যক্তিটিকে চেনা যায়। যারা প্রধানত মোটর নিজেদের চলাফেরার সুবিধার জন্য ব্যবহার করে, প্রতিবেশীদের কাছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁদেরও একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে কিন্তু সেটা শুধু একটি মোটরগাড়ির মালিকানার মর্যাদা। দশ-পনের কুড়ি বছর আগেকার মডেলের অস্টিন বা মরিস হলেও তাদের কাজ চলে যায়—তারা মোটামুটি মেট্রোপলিসের ভিড়ের মধ্যে গতিশীল থাকতে পারে এবং তাতেই তারা খুশি। দরিদ্র আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছে অবশ্য সেই পুরনো অস্টিন ও মরিসেরই যথেষ্ট স্টেটাস আছে কিন্তু তার বাইরে যে দুরন্ত গতিশীল অটোসমাজ সেখানে তার কোনো স্টেটাস নেই। অভিজাত অটোসমাজ তাদের প্রলেটারিয়েটের মতো উপেক্ষা ক'রে চলে। বিশ শতকের আবির্ভাবকালে (১৯০০ সাল) যখন অটোমোবিল মাত্র ৫০০০ হাজার তৈরি হয়েছিল তখনকার সামাজিক অবস্থা, আর আজকের সামাজিক অবস্থা যখন ১৯৬৭ সালে লক্ষাধিক অটোমোবিল বছরে উৎপন্ন হচ্ছে এবং কোটি কোটি মোটর সারা পৃথিবীর শহরের রাজপথে ছুটোছুটি করছে, কখনই এক হতে পারে না। কলকাতার রাস্তায় দশখানা মোটরও চলত না ১৯০০ সালে আর এখন দশ হাজারের দশগুণেরও বেশি মোটর চলে কলকাতার পথে। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা সেই 'baroque' শহরের মতো আছে অথচ তার বাইরের রূপটা হয়েছে মেট্রো-

পলিসের মতো। অটোমোবিলের চাপে কলকাতার রাস্তায় যখন 'ট্র্যাফিক জ্যাম' হয়—ডালহৌসি বড়বাজার চৌরঙ্গি প্রভৃতি অঞ্চলে—তখন শহরের লক্ষ লোকের মিছিল ও জনতার মতো মনে হয় যেন অটোমোবিলের মিছিল ও জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতএব পঁচিশ বছর কি পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার লোকসংখ্যার মতো যখন অটোমোবিলের সংখ্যাও অনেক কম ছিল তখন মানুষের মধ্যে অটোমানসতার বিকাশ হয়নি। কিন্তু গত পচিশ বছরের মধ্যে এই অটোমানসতার (auto-mentality) অতিদ্রুত বিকাশ হয়েছে, শুধু কলকাতা শহরে নয়, সারা পৃথিবীর মেট্রোপলিটন শহরে।

বিশ শতকের পঞ্চাশের শেষ দিক থেকে অটোমোবিল ক্রমেই মানুষের কাছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্টেটাসের সবচেয়ে বড়ো প্রতীক হয়ে উঠেছে। এদিকে শহরের স্থাপত্যের মধ্যে যখন সমস্ত দিক থেকে একটা যান্ত্রিক একঘেয়েমি প্রতিফলিত, তা সে বসবাসের ঘরবাড়ির স্থাপত্যেই হোক আর প্রতিষ্ঠান অথবা কলকারখানার স্থাপত্যেই হোক, তখন শুধু গৃহের গড়নবৈশিষ্ট্যে নিজেদের স্টেটাস আর বাইরে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। গৃহের চাইতে তার আসবাবপত্তর গ্যাজেট এবং সবার চেয়ে বড়ো অটোমোবিল হয়ে উঠছে স্টেটাসের প্রকৃত নিদর্শন। সমাজবিজ্ঞানীরা নাকি অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন যে সত্যিকার মর্যাদার নিদর্শনের মতো যাঁরা অটোমোবিলের মালিক তাঁরা বাড়ির গ্যারেজে গাড়ি না ঢুকিয়ে রেখে বাড়ির সামনে রাস্তায় 'পার্ক' করাতে ভালবাসেন। তার কারণ রাস্তা দিয়ে চলার সময় গাড়ির দিকে তাকিয়েই লোকে বুঝতে পারে যার বাড়ির সামনে গাড়ি তার স্টেটাসের স্তর কতটা উঁচুতে। শুধু নাকি বাড়ি দেখে তা বোঝা যায় না।

পৃথিবীর বড়ো বড়ো অটোমোবিল ব্যবসায়ীরা সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাহায্যে অনুসন্ধান ক'রে দেখছেন যে **'nothing appeals more to people than themselves, so why not help people buy a projection of themselves?'** মানুষের কাছে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হলো নিজের রূপ। অন্য কেউ যত রূপবান বা রূপসী হোক না কেন, নিজের চেয়ে নিজের কাছে কাউকে বেশি রূপবান বা রূপসী মনে হয় না। মানুষ যখন কোনো শখের জিনিস কেনাকাটা করে তখন ঠিক নিজের রূপের মতোই জিনিস নির্বাচন ক'রে কেনে। কেনা জিনিসের মধ্যে নিজের রূপটি অভিক্ষেপ করে অর্থাৎ তার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। মহানগরে জনস্রোতের মধ্যে মানুষ যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, যখন তার নিজেকে চেনবার বা চেনাবার কোনো সুযোগ থাকে না, যখন অজ্ঞাত অপরিচিতদের বিপুল তরঙ্গের মধ্যে তার নিজের সত্তাটিও বুদ্বুদের মতো বিলীন হয়ে যায় তখন তার আত্মপ্রকাশের উপায় থাকে কোথায়? অথচ কোনো একসময় জনতার মধ্যেই হোক অথবা

নির্জনতার মধ্যেই হোক যখন তার জনতাচৈতন্যের জড়ত্ব কেটে গিয়ে আত্ম-চৈতন্য ফিরে আসে এবং 'আমি আছি' এই বোধ জেগে ওঠে তখন যে ভাবেই হোক তাকে প্রকাশ করারও একটা পথ খুঁজে বার করতে হয়। বর্তমান মনোপলি ক্যাপিটাল ও ক্রমোন্নত টেকনোলজির যুগে সেই পথের সন্ধান দিয়েছে অটোমোবিল। নিজের 'ইমেজ' তৈরি করার এমন সুযোগ এর আগে মানুষ আর পায়নি। অহম্‌সর্বস্ব ফাঁকা মানুষের ইমেজ।

পালকির যুগে ঘোড়াগাড়ির যুগেও এই 'ইমেজ' মানুষ তৈরি করত। নানারকমের পালকি ও নানারকমের ক্যারেজের সঙ্গে তখনো মানুষের সামাজিক স্টেটাসের সম্বন্ধ ছিল। ব্যক্তিগত যানবাহন চিরকালই সমাজে 'status symbol'-এর কাজ করেছে। ঝালর দেওয়া জরি-ভেলভেটের গদি আঁটা ষোল বেয়ারার পালকি এবং সাধারণ ডুলি বা দু'চারজন বেয়ারার পালকির মধ্যে নিশ্চয় যাত্রীদের সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য থাকত। সুসজ্জিত খানদানি জোড়া ঘোড়ার বা চারঘোড়ার ল্যাণ্ডো আর দশ-বারো-ষোল ঘোড়ার গতিযুক্ত অটোমোবিল পাণ্টিয়াক ক্যাডিলাক ওপালা বিভিন্ন যুগের 'স্টেটাস সিম্বল' মাত্র। কলকাতা শহরে রাজা রামমোহনের পালকি, মহারাজা নবকৃষ্ণের পালকি এবং সাধারণ রাম বা হরির পালকি দেখলে নিশ্চয় তাব মালিকদের সামাজিক মর্যাদার স্তর অনেকটা বোঝা যেত। বিদ্যাসাগরের পালকি আর পাইকপাড়ার রাজাদের পালকি নিশ্চয় একরকমের ছিল না। ঘোড়াগাড়ি হলে বিদ্যাসাগব বড়জোর ক্যারাঞ্চি বা ছ্যাকরাতে চড়তেন কিন্তু শহরের বড়ো বড়ো বেনিয়ান ও মুচ্ছুদ্দিরা চ্যারিয়ট অথবা ব্রাউনবেরি ছাড়া চড়তেন না। পালকি ও ক্যাবেজের যুগের মতো অটোমোবিলের যুগেও ব্যক্তিগত যানবাহন আত্মমর্যাদার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। অটোমোবিলের যুগে শতগুণ বেশি হয়েছে কারণ চলাব গতি বেড়েছে অনেক, যাদের সঙ্গে চলতে হয় তাদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক এবং যেখানে থাকতে হয় শহরে তার আকারও হয়েছে অনেক বেশি বিরাট ও বিকট। সেটা ছিল ধনতন্ত্রের শৈশবকাল আব এটা হলো ধনতন্ত্রের বার্ধক্য যা মনোপলি ও টেকনোলজির সঞ্জীবনীশক্তিতে উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। এই বিরাট ও বিকট মহানগরে এই প্রচণ্ড বেগ ও ব্যস্ততার যুগে এবং মেট্রোপলিসে এই বিপুল জনগণবন্যার উদ্দাম স্রোতে অটোমোবিলই যে ডুবন্ত মানুষের বিলীয়মান ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রতীক হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। হ.েছেও তাই এবং যাঁরা অটোমোবিল বেচে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছেন তাঁরা কয়েক কোটি টাকা খরচ ক'রে মানুষের মন যাচাই ক'রে দেখেছেন যে জনতাপ্রধান সমাজে অটোমোবিল দিয়ে মানুষ নিজের 'ইমেজ' রচনা করতে চায়। মানুষ তার হারানো ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চায় অটোমোবিলের মধ্যে এবং যেহেতু অন্যত্র প্রকাশ করতে পারে না সেইজন্য সদম্ভে প্রকাশ করতে চায়। নামহীন

পরিচয়হীন সমাজে, যেখানে শুধু সংকেত ও প্রতীক দিয়ে মানুষকে চিনতে হয় সেখানে স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত অটোমোবিল ব্যক্তিপরিচয়ের সবচেয়ে বড়ো সংকেত ও প্রতীক হয়ে ওঠে।

অটোমোবিল শুধু চলার বাহন নয়, যিনি চলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের বাহন, তাঁর সামাজিক স্টেটাসের বাহন, আর্থিক স্টেটাসের তো বটেই। একজন নামজাদা বাজারবিজ্ঞানী পিয়ের মার্তিনো অটোমোবিল সম্বন্ধে বলেছেন :

> 'The automobile tells who we are and what we think we want to be···It is a portable symbol of our personality and our position...the clearest way we have of telling people of our exact position. In buying a car you are saying in a sense, 'I am looking for the car that expresses who I am.'

অটোমোবিল জানিয়ে দেয় আমি কে এবং আমি কি হতে চাই। আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার চলন্ত প্রতীক হলো অটোমোবিল। এত পরিষ্কার ক'রে এত সহজে অন্য কিছু দিয়ে কাউকে বোঝানো যায় না কে কিরকম ব্যক্তি, যত সহজে যত পরিষ্কার ক'রে নিজের অটোমোবিলটি দেখিয়ে বোঝানো যায়। যখন আমি কোনো গাড়ি কিনি তখন সেই গাড়িটাই আমি কিনি যেটা চলার সময় বাইরে বলতে বলতে যাবে 'আমি কে?' 'বুইক' তাই তার বিজ্ঞাপনে জানিয়ে দেয়—'It makes you feel like the man you are'. আমেরিকার একটি বিখ্যাত Social Research Association অটোমোবিল ব্যবসায়ীদের অর্থানুকূল্যে দীর্ঘদিন গবেষণা ক'রে Automobiles : What They Mean to Americans নাম দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সামাজিক জীবনের এরকম বিচিত্র দলিল বোধ হয় আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। গাড়ির 'মডেল' ও 'মেক' অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রুচি মেজাজ ইত্যাদি নাকি বিচার করা যায়। যেমন

ক্যাডিলাক :	দাম্ভিক Flashy মধ্যবয়সী, সামাজিক জীবনে গতিশীল, ভাল রোজগার, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন।
ফোর্ড :	দানবীয় গতি, ভাল রোজগার, বয়সে তরুণ, উদ্ধত, Upper-lower class, কাজের লোক, প্র্যাকটিকাল।
ডি সোটো :	রক্ষণশীল, ভাল রোজগার, দায়িত্ববোধ আছে, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, গর্বিত।
স্টুডিবেকার :	ছিমছাম, শহুরে, বুদ্ধিজীবি, প্রফেশনাল, তরুণ, তৎপর।
পান্টিয়াক :	নিশ্চিন্ত, উচ্চশ্রেণীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যপন্থী, 'কনভেনশনাল', কর্মব্যস্ত।
মার্কারি :	সেলস্‌ম্যান, 'assertive', অবস্থাপন্ন, আধুনিক।

এই রিপোর্টে মার্তিনোর কথা সমর্থন ক'রে বলা হয়েছে যে অটোমোবিল ক্রেতারা যখন গাড়ি কেনেন (যাঁরা শুধু 'conveyance' বা চলাফেরার সুবিধার জন্য কেনেন তাঁরা ছাড়া) তখন এই কথা মনে করেই কেনেন—'I am

looking for the car that expresses who I am ?' গাড়ির মালিকদের চরিত্র বিচার ক'রে তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে যে-সমস্ত লোক খানিকটা স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল, যাঁরা বাইরে নিজেদের অত্যন্ত 'serious' ও responsible' বলে পরিচয় দিতে চান তাঁরা সাধারণত প্লিমাউথ ডজ ডিসোটো প্যাকার্ড চার দরজার সিডন্ গাঢ় রং এবং যতদূর সম্ভব কম গ্যাজেট পছন্দ করেন। যে-সমস্ত লোক সমাজে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে চান, এবং সর্ব ব্যাপারে আধুনিক হতে চান অথচ একটু মধ্যপথ ঘেঁষে চলেন তাঁরা সাধারণত শেভ্রোলেট পান্টিয়াক বুইক ক্রাইসলার দুই দরজার সিডন্ এবং হালকা রং পছন্দ করেন। যে-সমস্ত লোক একটু বেশি মাত্রায় নিজেদের জাহির করতে চান, যাঁদের মধ্যে উদ্ভট স্বাতন্ত্র্য ও আধুনিকতা প্রকট তাঁবা কিনতে চান ফোর্ড মার্কারি ওল্ডসমোবিল লিন্কন উজ্জ্বল রং (দু'রকম) এবং যতরকমের সম্ভব উদ্বৃত্ত গ্যাজেট ফ্যাড ইত্যাদি। যে-সমস্ত লোক নিজেদের উঁচু স্টেটাস সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন তাঁরা ক্যাডিলাক স্টুডিবেকার হাডসন ন্যাশ এবং এই ধরনের সব গাডি পছন্দ করেন। লাল হলদে সাদা যাই হোক তাদের গাড়ির রং খুব 'ব্রাইট' হওয়া প্রয়োজন। একদল লোক আছেন যাঁরা সংখ্যায় কম তাঁদের উচু স্টেটাস অটোমোবিলে প্রকাশ করতে চান না বরং তাঁরা তাঁদেব বিশেষত্ব ছোট সাধাবণ গাড়িতে অনেক সময় প্রকাশ ক'বে থাকেন। খুব ধনীলোক কিন্তু হয়তো জীপ স্টেশন ওয়াগান বা পুরনো মডেলের কোনো গাডিতে চডে বেডান। এটা অবশ্য বড়লোকের খেয়ালেব ব্যাপাব। রিপোর্টেব মূল বক্তব্য হলো, যেকোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 'portable symbol' হলো অটোমোবিল এবং A car can sell itself to different people by presenting different facets of its personality'.

ধনতান্ত্রিক বিলাসের অমরাবতী আমেরিকাব নাগবিক সমাজের সঙ্গে আমাদের দেশের নাগরিক সমাজের পার্থক্য আছে। কিন্তু এই পার্থক্য হলো প্রধানত অর্থসামর্থ্যের পার্থক্য। তার জন্য কলকাতার মতো শহরে হয়তো নিউইয়র্ক শিকাগোর মতো ক্যাডিলাক প্যাকার্ড ক্রাইসলার ও অন্যান্য বড় বড় অটোমোবিল হাজার হাজার দেখা যায় না অথবা সামাজিক স্টেটাসের সঙ্গে অটোর মডেলের সামঞ্জস্য সবসময় রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বিরাট ধনী লোক বা উঁচু স্টেটাসের লোককে অনেক সময় অটোমোবিলের অভাবের জন্য হয়ত বাধ্য হয়ে 'আামব্যসেডর মার্ক টু' অথবা ভ্যানগার্ড বা মার্সেডিজ চড়ে বেড়াতে হয় এবং এইসব গাড়িতে সবসময় তাঁদের ব্যক্তিত্ব চরিত্র বা মেজাজ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু অটোমোবিলের বৈচিত্র্য ও সরবরাহের অভাব থাকা সত্ত্বেও কলকাতার নাগরিক সমাজে অন্তত একটা বিশিষ্ট স্তরের মধ্যে মোটর দেখলে মানুষ চেনা যায় এবং মানুষ দেখলে তার মোটরের 'মডেল' ও 'মেক'

বলে দেওয়া যায়। কলকাতার বড়ো বড়ো ক্লাবে যেমন ক্যালকাটা ক্লাব লেক ক্লাব হিন্দুস্থান ক্লাব অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব ইত্যাদি—কোনো একজিবিসন ককটেলপার্টি গেট-টুগেদার সংগীত অনুষ্ঠান ফিল্মের উদ্‌বোধন ঘোড়দৌড়ের মাঠ সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ ক্রিকেটম্যাচ এবং এই ধরনের নানারকম অনুষ্ঠানে ও সমাবেশে বোঝা যায় যে অটোমোবিল শুধু ব্যক্তির বাহন নয় ব্যক্তিচরিত্রেরও বাহন।

ট্রাউজার বুশসার্টপরা যুবক সাতাশ আটাশ থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স, সঙ্গে অতিআধুনিক সহধর্মিণী পোশাক রাজস্থানী-ছত্রিশগড়ীর সংমিশ্রণ, ক্লাবে এসেছেন সামাজিক উৎসবে যোগদান করতে। দেখলেই বোঝা যায় যে ভদ্রলোক কোনো বিদেশী কোম্পানির দেড় দু'হাজারী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বা সেলস্-ম্যানেজার এবং তাঁর সহধর্মিণী তারই সুযোগ্য সঙ্গিনী। ক্লাবের সভ্যবৃন্দ ভদ্রলোক সম্বন্ধে যত না সচেতন তার চেয়ে শতগুণ বেশি সচেতন তাঁর সহধর্মিণী সম্বন্ধে। তিনি অর্থাৎ মিসেস্ এক্স উৎসবের সামাজিকতা রক্ষা করছেন এবং সামান্য একটু মদিরা সিপ্ ক'রে যখন ফ্লোরে পার্টনারের সঙ্গে নাচতে নেমেছেন, তখন ভদ্রলোক দূর থেকে সবান্ধব দেখতে দেখতে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখেচোখে এরকম স্ত্রীর স্বামীত্ববোধের একটা লাল আভা সাদা আলোর মধ্যেও ফুটে উঠেছে। যদি অভিজ্ঞ অটোমানসবিজ্ঞানী কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় এই ভদ্রলোক ও মহিলা কি গাড়িতে (মোটর) ক'রে এসেছেন তাহলে তিনি চোখ বুজে বলবেন লেটেস্ট মডেলের ফিয়াট অথবা স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড এবং মালিক-চালিত গাড়ি ড্রাইভার নেই। সাধারণত এই ধরনের দম্পতি অ্যামবাসেডরে চলবেন না। যদি দেখা যায় বেশ একটু ভারিক্কি লোক, বয়স চল্লিশের উপর, কোনো কোম্পানির ডিরেক্টার বা ম্যানেজার, মাথার মাঝখানে খানিকটা টাকের আভাস, সঙ্গে প্রফুল্লবদনা স্ত্রী আর্থিক নিরাপত্তায় সদাহাস্যময়ী বেশ একটু গা-ঢালাভাব অথচ খুব বেশি কৃত্রিম নন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা নতুন অ্যামব্যাসেডরে ক'রে এসেছেন এবং ভদ্রলোক নিজে চালালেও সঙ্গে ড্রাইভার আছে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছেছেন, মাথার টাক আকপাল বিস্তৃত, বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছগুলি অধিকাংশই সাদা, আকর্ণবিস্তৃত মুখের হাসি, দুটো কি তিনটে মিলের মালিক, সঙ্গে বিপুলকায়া স্ত্রী প্রৌঢ়া, পোশাক প্রসাধনে বছর দশেক বয়স কামাবার ইচ্ছা, বেশ সুমিষ্ট সম্ভাষণ জানিয়ে অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন তাহলে তাঁর অটোমোবিল স্টুডিবেকার বুইক ক্রাইসলার অথবা ডানামেলা আর যে-কোনো মডেলের অটোমোবিল হওয়াই সম্ভব। বাকি সব আগেকার মডেলের ফিয়াট অ্যামব্যাসেডর থেকে বহু পুরোনো মডেলের অস্টিন মরিসের ভিড়। অটোর এই সাধারণ ভিড় দেখলে বোঝা যায় যে ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে মধ্যস্তরের মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশি, কিছু আপস্টার্ট

স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডপন্থী চলতি-হাওয়ার পথিক আর কিছু পরম নিশ্চিন্ত ধনীলোক। এই ধরনের ক্লাবে বা অনুষ্ঠানে ভিতরের মানুষ দেখার দরকার হয় না কারণ বাইরের অটোমোবিলের সমাবেশ দেখে একেবারে প্রায় সঠিক বলে দেওয়া যায় যে সমাজের কোন্ স্তরের লোক এখানে মিলিত হয়েছেন। নমুনা হিসেবে দুই-একটি বিশিষ্ট অটোমোবিলের মডেল দেখে তাঁর মালিকের বয়স পেশা পোশাক আর্থিক ও সামাজিক স্টেটাস সব প্রায় নির্ভুল বলা যেতে পারে। একথা বললে ভুল হয় না যে মেট্রোপলিটন কলকাতায় পৃথিবীর অন্যান্য মেট্রোপলিসের মতো ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে অটোমোবিল—যান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের যান্ত্রিক প্রতিমূর্তি। মেট্রোপলিটন কলকাতায় একটা নতুন অটো-মানসের বিকাশ হচ্ছে।

অটোমোবিল ও অটোমানসের যুগে প্রেমের রং ও রোমান্স 'প্রিমিটিভ' বলে মনে হয়। প্রেমের কবিতা লিখে বা আবৃত্তি ক'রে কেউ যদি আজকাল প্রেম নিবেদন করে তাহলে মনে হয় সে গোযান ও বৈষ্ণব পদাবলী যুগের উদ্‌ভ্রান্ত লোক, অটোমোবিল ও বীট্‌লেদের যুগের লোক নয়। অটোমোবিল যুগের প্রেম হলো যান্ত্রিক ও 'ভাল্‌গার'—'vulgar promiscuities of automobile' (Mumford)। গোযান ও অশ্বযানের যুগে প্রেমের কাহিনী অনেক রোমান্সের উপাদান যুগিয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। তবে মধ্যে মধ্যে ক্যারেজ ও অটোমোবিলের সন্ধিক্ষণে বাইসাইকেলের কথা মনে হয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে সেফটি বাইসাইকেল তৈরি হয়। তারপর একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন : '**It took its place as an instrument of the new freedom as we glided forth in our thousands into the country, accompanied by our sisters and sweet hearts and wives……**' অটোমোবিলের কিছু আগে বাইসাইকেল সামাজিক জীবনে চলার পথে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক হয় বাইসাইকেল। তার আগেকার ক্যারেজ এবং পরবর্তী অটোমোবিলের ফিউডাল বা বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়। বাইসাইকেলের মালিক তার প্রেমিকাকে বলতে পারতেন

> **'I'm half crazy all for the Love of you !**
> **It won't be a stylish marriage,**
> **I can't afford a carriage,**
> **But you'll look sweet.**
> **Upon the seat**
> **Of a bicycle made for two !**

অটোমোবিলের যুগে বাইসাইকেল মজুরদের চেয়েও উপেক্ষিত। যদিও অটোসাইকেল ও স্কুটারের যুগে বর্তমানে এক নতুন ধরনের 'অ্যাটমিক' প্রেমের সূচনা হয়েছে তাহলেও বাইসাইকেলের অকৃত্রিম রোমান্স তার মধ্যে নেই। রোমান্স আছে স্পীডের হঠাৎ বাম্পিং-ক্র্যাশের। কিন্তু অটোমোবিলের যুগে **'vulgar promiscuity'** বাছবিচারহীন স্বেচ্ছাচারী যৌনসম্ভোগ ছাড়া আর কিছু নেই। ট্যাক্সির মিটারের দিকে চেয়ে প্রেমের মিটার ওঠানামা করে, তারপর যে যার দৈনন্দিন কাজে চলে যায়। অতঃপর সেই সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ট্রাম আর বাস আর ট্রেন সেই আফিস আর কারখানা দশটা আর পাঁচটা স্লোগান আর বক্তৃতা খবরের কাগজ আর সিনেমা রেডিও আর রেসকোর্স এই করতে করতে যদি পুনরায় প্রেমিক প্রেমিকার চোখের দেখা হয় মেট্রোপলিসের রাস্তায় তাহলে আবার সেই ট্যাক্সি আর প্রেম সেই ভি আই পি রোড আর স্ট্যাণ্ড সেই চীনে হোটেল আর স্কাইরুম ট্যাক্সির মিটার ওঠে প্রেমের মিটার ওঠে তার পর যে যার ডেরায় চলে যায় ঘুমোয় জাগে দশটা পাঁচটা ট্রাম বাস সোম মঙ্গল বুধ অটোমেটিক জীবনের চাকায় ঘুরতে থাকে। নিজস্ব অটোমোবিলে প্রেমের 'মোবিলিটি' শতসহস্রগুণ বেড়ে যায় মেট্রোপলিসে, বিশেষ ক'রে কলকাতার মতো মেট্রোপলিসের দু'তিনটি বহির্গমনাগমনের অটো-পথে—জি. টি, বি. টি, আর যশোহর রোড ডায়মণ্ড হারবার রোড বা বজবজ রোডে। প্রেম তখন হংসবলাকার মতো পক্ষবিস্তার করে **'swept-wing'** ডজ স্টুডিবেকারে যতটা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি টু-ডোর সিডান স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডে নতুন মডেল 'ফোর-ডোর' ফিয়াটে অথবা মার্ক টু অ্যাম্ব্যাসেডরে। তারপর যে যার আস্তানায় চলে যায় এবং শাওয়ার-বাথের পর অঘোর অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়। ভোরের সূর্য ওঠার পর থেকে টেলিফোন বেজে যায় কিন্তু কালা কান দু'টোয় তার শব্দ পৌঁছয় না। অটোমোবিলপ্রেমের 'মোবিলিটি' বা গতির শেষ হয়ে যায় তখন। ইঞ্জিন চলে অটো চলে না, চালক নেই কারণ শুধু ইঞ্জিনের ধুক্-ধুক্ ধিক্-ধিক্ শব্দ শোনা যায় বুকের মধ্যে। স্টার্ট-দেওয়া পরিত্যক্ত অটোমোবিলের মতো পড়ে থাকে পথের প্রান্তে মেট্রোপলিসের প্রেমিক ও প্রেমিকা এবং ধুক্-ধুক্ ধিক্ ধিক্ ক'রে।

অটোমোবিল ব্যক্তির 'ইমেজ'। অটোমোবিল 'পোর্টেবল পার্সোনালিটি' অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের চলন্ত প্রতীক। গতি আর বেগ, চলার জন্য চলা, বেগের জন্য বেগ, আবেগহীন বেগ আত্মগতি 'অটোমোবিলিটি'। মনে হয় মেট্রোপলিসের বিপুল জনতার গড্ডলপ্রবাহে ডুবন্ত মানুষের বেঁচে থাকার আঁকড়ে ধরার শেষ তৃণখণ্ড যেন অটোমোবিল। অটোমোবিলের মালিকানার সৌভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত অর্থাৎ শতকরা নব্বুই জন মানুষ—তাদের জন্য জি. টি আর বি. টি রোডের মতো

জীবনের দু'টি পথ খোলা—একটি আত্মহত্যার পথ আর একটি নৈরাজ্য ও ধ্বংসের পথ। কলকাতার মতো অভিশপ্ত মেট্রোপলিসে তা ছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই। জীবনের সমস্ত ভালমন্দের মানদণ্ড সমস্ত ন্যায়-অন্যায় নীতি-দুর্নীতির পার্থক্য বিচারবোধ সমস্ত নিটোল সোনালি স্বপ্ন ও আদর্শ ধ্যানধারণা ও কল্পনা সব যেন বঞ্চিতরা স্টীমরোলার দিয়ে পিষে ফেলে ধুলিসাৎ ক'রে দিতে চায়। দিচ্ছেও তাই। দিলেও তাদের বিরুদ্ধে আজ তাই অভিযোগ করা যায় না কারণ অভিযোগ করার মুখ নেই। যে-মুখ দিয়ে অভিযোগ করব তার উপর কলঙ্কের চুনকালির দাগ বসন্তের দাগের মতো চিহ্নিত হয়ে আছে। যারা ভাঙছে তারা ভাঙবেই। কোনো কলরব অথবা নীতিশাস্ত্রের কোনো শ্লোকের আবৃত্তিতে তারা কর্ণপাত করবে না। তাদের বিশ্বাস আজকের ভাঙনের শূন্যস্থান ভবিষ্যতে একদিন তারা ভরাট ক'রে দিতে পারবে। কিন্তু যাঁরা অটো-মোবিলবিলাসী ভাগ্যবান এবং মেট্রোপলিসের হৃদয়হীন বিবেকহীন নির্মানস মানুষ তাঁরা যা ভাঙছেন তা আর ভরাট হবে না কোনোদিন। মেট্রোপলিটন শহরের সামাজিক জীবনের শূন্যতা তাঁরা অটোমোবিল দিয়ে পূর্ণ করতে চাইছেন। অটোমোবিল তাঁদের আয়না, কলঙ্কিত মুখ ও বিকৃত ব্যক্তিত্বের আয়না। অটোমোবিলেব উজ্জ্বল রঙের চক্‌চকে আয়নায় নিজের মুখ নিজে দেখে তাঁরা তৃপ্তি পেতে চান স্বস্তি পেতে চান। কাচের (glass) যুগে অহম্-বোধ (Ego) যেমন অত্যুগ্র হয়েছিল তেমনি অটোমোবিলের যুগেও হয়েছে তবে তার উগ্রতা আরও অনেক বেশি। স্বচ্ছতা ও প্রতিফলনতার দিক দিয়ে যখন এমন কাচ তৈরি করা সম্ভব হলো যাতে নিজের ছায়া নয় শুধু নিজের হুবহু নকলরূপ পর্যন্ত দেখা যায় তখন মানুষের অহম্‌বোধও একেবারে রূপান্তরিত হয়ে গেল। *Techniques and Civilisation* গ্রন্থে মামফোর্ড তাই বলেছেন : **'Glass had a profound effect upon the development of the personality : indeed, it helped to alter the very concept of the self.'** মানুষের অহম্‌বোধের ক্রমবিকাশে সতের শতকের স্বচ্ছ কাচের আয়না যদি একটি যুগান্তকারী পর্বান্তর হয় তাহলে বিশ শতকের অটোমোবিলের আয়না তার আর একটি যুগান্তকারী পর্বান্তর। দু'টি পর্বান্তরের মধ্যে প্রভেদ অনেক কিন্তু সাদৃশ্যও আছে যথেষ্ট। শোনা যায় যে সতের শতকের একজন স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিক সামন্তরাজা চারিদিকের প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যখন নিজের শক্তি জাহির করার আর কোনো উপায় খুঁজে পাননি তখন তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদে বন্দী হয়ে থেকে একটি বড় হলঘরের চারিদিকের দেয়ালে বড় বড় কাচের আয়না ঝুলিয়ে নিজের রূপ নিজে দেখতেন আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই তম্বিগম্বি করতেন হাত-পা নেড়ে এবং এই ভেবে সান্ত্বনা পেতেন যে তাঁর চেয়ে শক্তিমান বীর্যবান পুরুষ আর কেউ নেই। বিশ শতকেও

অটোমোবিলের আয়নার দিকে চেয়ে আমরা যেন বলতে চাই যে মেট্রোপলিসের বিপুল জনস্রোতের মধ্যে আমরা একজন 'বিশিষ্ট ব্যক্তি' এবং নাম-গোত্রহীন মেট্রোপলিটন সমাজে আমাদের নামও আছে গোত্রও আছে এবং আমরা কে তা আমাদের অটোমোবিল দেখলেই চেনা যায়। বাইরে যখন উত্তাল জনতার জোয়ার বইতে থাকে মহানগরে তখন এই বিপুল জনসমাজ থেকে নিজেদের ছিনিয়ে এনে অটোমোবিলের আয়নায় আমরা নিজেদের মুখ নিজেরা দেখে সান্ত্বনা পাই মনে হয় যেন আমরা এরা-ওরা-আরও অনেকের মতো নই যেন আমরা আমাদের অটোমোবিলের মতোই মূল্যবান এক-একজন মানুষ।

মেট্রোপলিটন শহরে অটোমোবিল হলো মানুষের 'ইমেজ'। অটোমোবিল মানুষের আত্মার আয়না। অটোমোবিল মানুষের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বের প্রতীক। এবং সবার চেয়ে বড় সত্য অটোমোবিলের মতো মানুষের মন। নার্সিসাস বনদেবী ঈকোর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অ্যাফ্রোদিতে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তার জন্য। ঝরনার জলে নিজের রূপের প্রতিফলিত রূপ দেখে নার্সিসাস মুগ্ধ হয়ে আত্মবিলাপে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তারপর থেকে জনপ্রবাদ এই হলো যে স্বচ্ছ জলের উপর নিজের রূপ নিজে দেখলে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই বরণ করতে হয়। ঝরনার জলে আজ আর কেউ নিজের রূপ দেখে না। স্বচ্ছ কাচের আয়নায় দেখে কিন্তু তারও কোনো বিকীরণ হয় না বাইরে। ধনতান্ত্রিক মেট্রোপলিটন সমাজে মানুষ নিজের রূপ দেখে অটোমোবিলের আয়নায়। যারা দেখে মৃত্যু তাদের কপালে লেখা। অটোমোবিলের দুরন্ত গতিতে তারা আজ মেট্রোপলিস্ থেকে নেক্রোপলিসের (City of the dead) দিকে ছুটে চলেছে। তাদের গতিরোধ করবে কে ?

১৯৬৭

মেট্রোপলিটন মন

কেবল রমণ করেছে এবং খবরের কাগজ পড়েছে এমন এক জীব হলো আধুনিক মানুষ। ক্যামু বলেছেন যে, এই একটি বাক্যেই নাকি আধুনিক মানুষের 'ডেফিনিশন' শেষ হয়ে যায় তারপর আর কিছু বলার থাকে না। দুটোই যান্ত্রিক অভ্যাস কোনোটাতেই প্রাণ নেই মন নেই যেমন রমণের ধরন তেমনি খবরের কাগজ পড়া। ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সমাজে এই হলো মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি। এই কথাটুকু ক্যামু যদিও বলেননি তাতে ক্ষতি নেই।

তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি
পুলক হ তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহুক বলআ ভাঁগু।
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন যায়।

'দেহের প্রস্বেদে প্রসাধন ভেসে গেল, এমন পুলক জাগল যে কাঁচুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ফেটে গেল বলয় ভাঙল। বিদ্যাপতি বলছেন তারপর যা হলো তা আর বলা যায় না হাত কাঁপছে।' তখন কবিরও হাত কাঁপত 'সেই' কথা লিখতে। এখন আমাদের হাত কাঁপে না। অটোমোবিলের মতো অটোমেটিক লেখায় শুধু আধুনিক মানুষের জীবনের রমণ ও ভোজনের কথা অনর্গল বলা যায়। অথচ মানুষের সেই দেহ তো দেহই আছে কিন্তু সেই প্রস্বেদ নেই, যা আছে তার নাম ঘাম এবং দুর্গন্ধ ঘাম। অথচ সেই মানুষের গোনাগুনতি নার্ভগুলো একই আছে, একটিও বাড়েনি বা কমেনি। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ নেই সেই পুলক নেই সেই শিহরন নেই যার

ঝংকারের প্রতিধ্বনিতে একদা কাঁচুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ফেটে যেত, একদা বাহুর বলয় খানখান হয়ে ভেঙে যেত। ক্লান্তি আর অবসাদের বেড়া দিয়ে ঘেরা স্নায়ুগুলো যেন জীবনের সমস্ত নিবিড় অনুভূতি থেকে বঞ্চিত এবং মানুষ একটা নির্মম ঔদাস্যের দ্বীপে দ্বীপান্তরিত।

জর্জ সিমেল আধুনিক মানুষের এই মনোভাবকে বলেছেন **'blase attitude'**—নির্বাণ নয়, কতকটা নির্বিকারত্ব বলা যায়। কোনো কিছুতেই 'বিকার' নেই। সমস্ত 'বিকার' জনতার, কেবল ব্যক্তি নির্বিকার। ব্যক্তিসত্তা জনতাপিণ্ডে বিলীন। মনে হয় যেন অসংখ্য অকেজো অসাড় নার্ভের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রত্যেকের নার্ভেই সাড়া জাগে এবং একটা-কি-দুটো তারে তীব্র ঝংকার ওঠে। জনতার বাইরে এসে যখন 'ব্যক্তি' দাঁড়ায় তখন সে ভয়ংকর নির্জন। শুধু নির্জন নয় যেন তার দেহের নার্ভগুলো একগোছা ছেঁড়া তারের বাণ্ডিল। বাইরের অবিরাম ধর্ষণে ঘর্ষণে তার স্নায়ুর শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে থাকে। এই **'intensification of nervous stimulation'** হলো সিমেলের মতে **'metropolitan type of individuality'**'র বড় বিশেষত্ব। মহানাগরিক জীবনের গড্ডলপ্রবাহে ঘন ঘন উত্তেজনার উসকানিতে স্নায়ুগুলো যদি দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে আর নিভে যায় তাহলে জীবনের ব্যক্তিগত পরিবেশে কোনো মোচড়েই তার আর সাড়া জাগানো যায় না। শহরের রাজপথে ঘূর্ণিঝড়ে ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তারের মতো স্নায়ুগুলো পড়ে থাকে এবং তার ভিতরে কোনো 'কারেণ্ট' থাকে না।

নার্ভে যখন 'কারেণ্ট' থাকে না তখন একটা মাংসের ডেলার মতো আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলি যেমন মোটর চলে ট্রাক চলে টেম্পো চলে স্কুটার চলে। খুব ব্যস্ত হয়ে সকলে ছুটোছুটি করি। ব্যস্ততার চেতনা ছাড়া বাকি সব চৈতন্য উধাও। বাইরের কোনো দৃশ্য কোনো দ্রব্য কোনো ঘটনা মনে কোনো সাড়া জাগায় না। চলন্ত ট্রেনে অন্ধ প্যাসেঞ্জারের মতো বাইরের দিকে চেয়ে থাকি। চোখ অবশ্য আমাদের খোলা থাকে আর চোখের মণিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য, দ্রব্যের পর দ্রব্য প্রতিফলিত হতে থাকে কিন্তু চোখের মণি থেকে মনের মণিকোঠায় তা পৌঁছয় না। চোখ থেকেই ঠিকরে বিদ্যুৎঝলকের মতো সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। মহানগরের রাজপথে নিরাশ্রয় অসহায় মানুষের মৃতদেহ বাসি হয়ে শুকিয়ে পড়ে থাকে আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তার পাশ দিয়ে চলে যায়, হয়ত ধাক্কা লেগে হোঁচট খায় কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না। শহরের রাজপথে অভুক্ত মানুষের কাতরানি অসংখ্য 'ভেহিকেলে'র নিউম্যাটিক টায়ারের ঘর্ঘরধ্বনিতে ডুবে যায়, শোনা যায় না। প্রতিদিন জীবনের এই স্রোত বইতে থাকে, একঘেয়ে একটানা স্রোত একশব্দ · একস্বর একতান একতাল একছন্দ। চোখের সঙ্গে মন এবং মনের সঙ্গে আরও গভীরে যে হৃদয়ের গুহা তার

যাবতীয় যোগাযোগ ছিন্ন। টেলিফোনের তারগুলো ছিঁড়ে যায় আর চোখের রেটিনাতে রিং বাজে কিন্তু মনে বাজে না। মনে যদি কখনো রিং শোনা যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা ফল্‌স রিং কারণ হৃদয়ের গুহার সঙ্গে সংযোগের তারটি একেবারে 'ডেড' হয়ে থাকে। তার ফলে 'হৃদয়' নামক গুহাটি প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে এবং পেলিওলিথিক গুহার মতো তাকে খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু মহানগরের ইটপাথরকংক্রীটস্টীলের মধ্যে পেলিওলিথিক গুহা কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

যন্ত্রী যদি যন্ত্রের ব্যবহার না করে তাহলে যন্ত্রে মরচে ধ'রে যায় এবং তাতে আর কোনো কাজ হয় না। ধনতান্ত্রিক মহানগরের মানুষের কাছে হৃদয় পরিত্যক্ত। জীবনে ঐ বস্তুটি তার কোনো কাজে লাগে না। সেখানে আর বাস করা যায় না যেহেতু বাস করার প্রয়োজনও হয় না। নির্বংশ পরিবারের বাস্তু-ভিটের মতো শহুরে মানুষের হৃদয়ে আজ ঘুঘু চরছে। একখণ্ড ইট অথবা এক টুকরো পাথর অথবা একটা লোহার বড অথবা এক বস্তা সিমেণ্ট, এসবের দাম আছে কিন্তু হৃদয়ের কোনো দাম নেই। শহরের কোনো এক্‌সপার্ট নিলাম-ওয়ালাও পাব্লিক অক্‌শনে তাকে একপয়সা দামেও বেচতে পারবে না। বোদ্‌-লেয়ার তার সুলভতা দেখে বেদনা পেয়েছেন। যাকে বোদ্‌লেয়ার তাঁর 'জর্নলে' 'The cheapening of hearts' বলেছেন তা যদি আজকের মনোপলি টেকনো-লজির ভোগের স্বর্গে দেখতেন তাহলে আরও অনেক বেশি অবাক হয়ে বিলাপ করতেন। বস্তুত কার্ল মার্ক্স ধনতান্ত্রিক সমাজের এই মর্মান্তিক ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতার (alienation) ভয়বাহ পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।* আমার মনে হয় শুধু সুলভ বললে আজকের নাগরিক হৃদয়ের কথা কিছুই বলা হয় না। হয়ত বোদ্‌-লেয়ারের কালে শতাধিক বছর আগে বুর্জোয়া সভ্যতার সংস্পর্শে বাজারের বহু পণ্যের প্রতিযোগিতায় হৃদয়পণ্যের মূল্য যখন কম ছিল তখন এই কথাটাই ঠিক ছিল। কিন্তু এখন হৃদয় শুধু শস্তা নয়। শস্তা জিনিসেরও সত্তা আছে কিন্তু নাগরিক জীবনে হৃদয়ের কোনো সত্তাই নেই। যে মহানগরে চোখ আছে মন নেই এবং মনের সঙ্গে হৃদয়ের কোনো যোগ নেই সেই মহানগরে খবরের কাগজ প্রাচীরদেওয়াল মানুষের মুখ সবকিছু দিয়ে শুধু অপরাধের দুর্গন্ধ ঘাম চুঁইয়ে পড়ে ('everything sweats with crime')।

সকালে উঠে খবরের কাগজ দেখলে বোদ্‌লেয়ারের বিবমিষা হতো। আমাদেরও হয় তবে ভোরে ঘুম ভাঙলে স্নায়ুগুলো যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন খবরের কাগজের উত্তেজক চোলাই দিয়ে একবার চারিয়ে নিয়ে সেগুলোকে জাগাতে হয়। এটাও নাগরিক জীবনের অনেক অভ্যাসের মতো একটা যান্ত্রিক অভ্যাস। সেদিন সকালে উঠে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ 'বোল্ড' টাইপের

* পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই সংবাদটির দিকে নজর পড়ল

SEARCH FOR

CAR OWNER

WHO SAVED A LIFE

By a Staff Reporter

A Bengali family of Calcutta is searching for a car with the number WBA 2280 to offer its thanks to its owner who saved from death the head of the family, a field-surveyor of the Geological Survey of India. The 44-year-old field-surveyor had suffered a coronary stroke immediately after he had alighted from a tram at the crossing of Chowringhee and Red Road on his way to office on Tuesday morning. As he crouched on the road, many pedestrians and cars passed by without caring to look at him or help him.

Out of the stream of passing cars, one stopped. Its owner came out and lifted the disabled man into his car and took him to the G. S. I. Office on Chowringhee where the colleagues of the field-surveyor got him admitted to a hospital.

The Statesman, 10 July 1965

মোটোর অনর্গল বন্যার মধ্যে WBA 2280 গাড়ির মালিককে আমিও অনেক দিন খুঁজেছি। কেন খুঁজেছি জানিনা তবে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত পথ চলতে চলতে কেবল গাড়ির নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। 'পরশ পাথর' নয় কিন্তু ঐ ধরনের কিছু একটা যেন খুঁজতাম কলকাতার রাজপথে। নির্জলা মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্? হয়ত তাই কিন্তু চারদিকের পাথর আর লোহার মধ্যে জল কোথায়?

এখানে জল নেই শুধু পাথর
কালো পাথর জল নেই অনাবৃত মরুপথ
পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথ
পাথর-ঢাকা পাহাড়ে এক ফোঁটাও জল নেই
জল যদি থাকত
আমরা দাঁড়াতাম
একটু জল খেতাম।
কিন্তু পাথরের বুকে কি কেউ দাঁড়াতে পারে?
না একটু ভাবতে পারে?
ঘামও শুকিয়ে যায়
পা দুটো বালিতে আটকায়।
যদি একটু জল থাকত
পাথরে

একটু জল
মৃত পাহাড়ের দাঁতে বা ঝিষে কোথাও জল নেই
এখানে কেউ না পারে দাঁড়াতে
না পারে বসতে
না পারে জিরোতে
এ পাহাড়ে স্তব্ধতাও নেই
কেবল খরা বিদ্যুতের গর্জন
বৃষ্টিহীন
এখানে একটু নির্জনতা নেই
শুধু লাল লাল ক্রুদ্ধ মুখের ভ্রূকুটি
    আর দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ।
মাটিঘরের ফাটা দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে।
    যদি একটু জল থাকত এখানে!
এবং যদি না পাথর থাকত—
অথবা পাথর থাকত
এবং জলও থাকত
একটু জল
ছোট একটা ঝরণা
পাহাড়ের বুকে একটা আবর্ত—অথবা
শুধু যদি জলের শব্দ শোনা যেত
ঝর্‌ঝর্‌—
ঝির্‌ঝির্‌— (টি. এস. এলিয়ট অনুসরণে)

পাথরের মধ্যে ২২৮০-কে দেখতে পাইনি। ২২৮০-র মালিক বা চালক যে-ই হোন না কেন তাঁর চোখের সঙ্গে মনের এবং মনের সঙ্গে আদিম অন্তঃকরণের সংযোগ ছিন্ন হয়নি। কেন হয়নি কে জানে!

সংবাদটা পড়ে মনে হলো মানুষ কত ক্ষুদ্র কত নগণ্য এই স্থূলকায় মহানগরে। মনে হলো কোন্ সভ্যতা কোন্ সমাজ মানুষকে আজ এত হেয় এত নগণ্য জীবে পরিণত করেছে। যদি মহানগরের 'মাল্টি-স্টোরীড্ স্কাইস্কেপার'-এর ইস্পাতকঙ্কালের পাশে যেকোনো মানুষের হাড়ের কঙ্কাল দাঁড় করিয়ে দূর থেকে দেখা যায় তাহলে শহরে মানুষ মাপার স্কেলটা চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন কেন, হাজার মানুষ কি লক্ষ মানুষ যখন এই অট্টালিকাসারির কোল দিয়ে চলতে থাকে তখন তার চূড়ো থেকে দেখলে মনে হয় যেন কীটের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কীটের মন নেই। কিন্তু কোনো অক্ষম অসহায় কীটকে অন্য কীটেরা ফেলে যায় না, সকলে মিলে তাকে বহন ক'রে নিয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক মহানগরের মানুষ তাও করে না। মৃত মানুষ, অবশ্যই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল মৃত মানুষ, মহানগরের শানবাঁধানো পেভমেণ্টে শুকিয়ে

কাঠ হয়ে যায়। শুকনো গাছের ডালের মতো ঝড়বৃষ্টিতে রাজপথের পাশে পড়ে থাকে আর তার পাশ দিয়ে লোকের স্রোত বয়ে যায় কিন্তু কীটের মতো অন্যান্য পোকার মতো যেমন পিঁপড়ের মতো কেউ তাকে বহন ক'রে নিয়ে যায় না। দুদিন পরে হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠানের লোক আসে অথবা কর্পো-রেশনের ধাঙ্গড় ডোমরা তার সৎকারের ব্যবস্থা করে। মহানগরে প্রতিষ্ঠান বড় ইনস্টিটিউশন বড় জনসভা বড় জনতা বড় কিন্তু ব্যক্তি ছোট মানুষ নগণ্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মানুষের মনুষ্যত্ব স্থূলকায় জনতার জড়পিণ্ডে বিলীন। মহানগরের জনস্রোতে প্রত্যেকটি মানুষ তাই নির্মম নির্বিকার।

বেড রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ে অসংখ্য অটোর উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের মধ্যে একটি গাড়িকে থমকে দাঁড়াতে হলো। একজনকে তো দাঁড়াতেই হবে কারণ তা না হলে তো সবই থেমে যাবে। একটি গাড়িও যদি না থমকে দাঁড়াত, যদি ২২৮০ গাড়ির মালিক অটোর বন্যায় নীরেট কাষ্ঠখণ্ডের মতো ভেসে যেতেন আরও সকলের মতো তাহলে তো সমাজের হৃৎস্পন্দনটাই থেমে যেত। এখনও তা থেমে যায়নি বলে তাই উর্ধ্বশ্বাস ছুটোছুটির মধ্যে একজন গাড়ির মালিক থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। করোনারি স্ট্রোকে আক্রান্ত ভদ্রলোক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছিলেন, তাঁর চেতনা ছিল না, তা না হলে এই অপূর্ব চলচ্চিত্র দেখে তিনি কি বলতেন কে জানে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় এক অনভিজাত সাধারণ সরাবখানায় অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে হাউলিং হট্টগোলের মধ্যে বসে কলকাতা শহরের কথা ভাবছিলাম। কি আর ভাবব! ভিড়ের মধ্যে আমার নির্জনতায় আঘাত লেগেছে অনেক-বার। এপাশওপাশ থেকে অনেকের উলটোপালটা প্রশ্নে অনবরত জর্জরিত হতে হয়েছে। মুটে মজুর মধ্যবিত্ত সকলের প্রশ্ন। ঠিক প্রশ্ন বলা যায় না। ক্লেদ আর গ্লানি আর অবসাদ আর হতাশার একটা দরবিগলিত ধারা, একনম্বর দুনম্বর তিননম্বরের শ্রাবণধারার মতো অবিশ্রান্ত ঘরের মধ্যে বর্ষণ হচ্ছে। মানুষগুলো সব ক্রন্দনে উল্লাসে কখনো গর্জে উঠছে কখনো বা কঁকিয়ে উঠছে। কর্ণপটাহভেদী বজ্রনির্ঘোষ তার সঙ্গে নেড়িকুকুরের নাকিকান্না

> এই চালে ভাই জীবনের শেষ
> এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ
> প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে নয়
> নেড়িকুকুরের নাকিকান্নায়।
>
> (এলিয়ট অনুসরণে)

হঠাৎ উত্তেজনার অগ্নিউদ্‌গিরণে ঘরের ভিতরটা মনে হলো চুল্লির মতো, যেন মুখ থেকে মুখে দাঁত থেকে দাঁতে আগুনের হলকা ছুটতে থাকল। তার

পরমুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সব। লাল আভাটা কালো হয়ে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। মুখগুলো যেন কেমন ছাইমাখা। সকলের ভয় হলো আবার সেই বাইরের একঘেয়ে জীবনে ফিরে যেতে হবে ভেবে। জীবনটা সরাবখানা নয়। যদি তাই হতো! তারা জানে এই জীবনটার শেষ হবে বজ্রের আওয়াজে নয়, নেড়িকুকুরের নাকিকান্নায়। তারা জানে এই রাতটুকু ভোর হতে-না-হতেই এবং এই এক-দুই-তিন নম্বরের নেশাটুকু কাটতে-না-কাটতেই আবার কাল থেকে কলকাতার ক্লান্তিকর কলের চাকায় জীবনের সরাবটুকু সব আখমাড়াইয়ের মতো নিংড়ে বেরিয়ে যাবে কারণ যন্ত্র শুষবে, মুনাফাখোরদের যন্ত্র।

ভদ্রলোককে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম হাসপাতালে চুপিচুপি। বসে বসে সেই কথা ভাবছিলাম। হাসপাতালে রোগীদের করুণ আর্তনাদ শোনা যায়, শারীরিক যন্ত্রণার আর্তনাদ। সরাবখানাও হাসপাতাল। শারীরিক নয়, মানসিক ব্যাধি ও যন্ত্রণার গোঙানি শোনা যায় সেখানে। বেদনার বোঝা সারাদিনের ক্লান্তির পর সরাবখানায় কিছুক্ষণের জন্য নামিয়ে রেখে মনটা হালকা করা যায়। যদি সরাব না থাকত! সরাবখানা না থাকত! তাহলে হাড়েমজ্জায় ঘুণধরা এই ধনবৈষম্যজর্জর সমাজটাকে মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে ছেয়ে ফেলতে হতো। এই সব সরাবখানায় কতদিন কতলোককে দেখেছি অঝোরে কাঁদতে। কে বলেছে মানুষের মন নেই? মন যে ছিল বা আছে তা এখানে বোঝা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো মনটা স্নায়ুস্তরের অনেক তলায় সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছে। স্তরের পর স্তর স্নায়ুর তলা থেকে তাকে খুঁড়ে বার করতে হয়। সবাই তাই করে সরাবখানায়। অভিজাতদের bar-হোটেলে এ দৃশ্য দেখা যায় না। সেখানে ককটেল আর টুইস্টের আবর্তে কালো টাকা ওড়ানোর উল্লাস শোনা যায়। বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোটের লাটাই খুলছে আর ফূর্তির ঘুড়ি উড়ছে ফুরফুর ক'রে, ব্লুকক্স আর স্কাইরুমের আকাশে। সাধারণের সরাবখানায় তা হয় না। সেখানে সারাদিনের মজুরি অর্ধেক খরচ ক'রে মনের বোঝা নামানো হয়। বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের সমাজকে খণ্ডখণ্ড ক'রে, মানুষের মনকে টুকরো টুকরো ক'রে, মানবসমাজকে যে কী বীভৎস পাগলাগারদে পরিণত করেছে তা সাধারণ অসাধারণ যে-কোনো সরাবখানায় গেলে বোঝা যায়।

আড়াইশো বছরের কলকাতা শহর চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দুশো বছর আগেও কলকাতা শহরে অনেক ট্যাভার্ন ছিল কিন্তু সেগুলো ছিল ইংলণ্ডের জনসনযুগের ট্যাভার্নের মতো। একালের সরাবখানার মতো জীবনের নালানর্দমার সংগম ছিল না সেকালের ট্যাভার্নে। সেই ট্যাভার্নও আর নেই এবং সেই কলকাতা শহরও আর নেই। যোব চার্নক আর জনসনের

যুগ কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। পুরো আঠারো শতক পুরো উনিশ শতক পার হয়ে বিশ শতকের বার্ধক্যে পৌঁছেছি আমরা। ৬৭ বছর বয়স হলো বিশ শতকের। কলকাতা শহরও বয়সের দিক থেকে অতিবৃদ্ধ। বার্ধক্যজনিত ভীমরতি ও জরার চিহ্ন তার মনে আর সর্বাঙ্গে। চার্নক থেকে কুমোরটুলির কালানায়েব গোবিন্দরাম মিত্র ও শোভাবাজারের নবকৃষ্ণের আমল পর্যন্ত গোটা আঠারো শতকের কলকাতাকে নাগরিক সভ্যতার আদিযুগ বলা যায়। নতুন ইংরেজ রাজাদের রাজসভা প্যারেড আর বর্ধিষ্ণু রাজধানীর নতুন-পুরাতনের মিশ্ররূপ তখন ছিল কলকাতা শহরের বড় বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের নগরের সমস্ত উত্তরাধিকার নিয়ে কলকাতার নাগরিক পত্তন হয়েছে এবং তার বাল্যকাল ও কৈশোরও কেটেছে। কলকাতার অধিকাংশই ছিল তখন গ্রাম্য প্রাকৃতিক নিদর্শনে ভরা। ধানক্ষেত পুকুর বাঁশবন পথে বেরোলেই দেখা যেত। সবুজের অভাব ছিল না। গোবিন্দরাম আর নবকৃষ্ণরা তাই সতেজ সজীব মন নিয়ে বেঁচে ছিলেন। কর্মঅপকর্ম যাই করুন তাঁরা সবই জ্যান্ত মানুষের মতো করেছেন। প্রতাপ ছিল তাঁদের। চার্নক যখন কুঠি বাঁধতে এসেছিলেন তখন কলকাতার গ্রামগুলোতে আট হাজারের মতো লোক থাকত। আঠারো শতকের গোড়াতে গ্রামগুলোতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক হলো এবং শুধু ইংরেজদের এলাকায়—সুতানটি গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা এই তিনটি গ্রামে—লোক হলো প্রায় পনেরো হাজার। আরও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি লোক বেড়ে হলো ইংরেজ এলাকায় প্রায় দেড় লক্ষ এবং সব মিলিয়ে প্রায় তিন লক্ষ। আরও পঞ্চাশ বছর পরে উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতার লোক হলো পাঁচলক্ষ। এই পাঁচলক্ষ লোক নিয়ে ওয়েলেসলির আমলে কলকাতা মধ্যযুগের উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলে আধুনিক শহরের রূপ ধারণ করতে থাকল। তার পথঘাট ঘরবাড়ি বদলাতে আরম্ভ করল যদিও মধ্যযুগের ভূত শহরের স্কন্ধ থেকে পুরো নামল না এবং আজও নামেনি কারণ কলোনিয়াল শহরের অভিশাপ।

পুরো উনিশ শতকে দেখা যায় লোকসংখ্যা খুব বাড়েনি, একশো বছরে দ্বিগুণও হয়নি, পাঁচলক্ষ থেকে সাড়ে আটলক্ষ হয়েছিল (১৯০১)। কলকাতা শহরের বাড়িঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেও তার বিকাশের একটা হদিশ পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা শহরে একতলা বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ছ-হাজার, দোতলা প্রায় সাড়ে ছ-হাজার, তিনতলা প্রায় সাতশো, চারতলা দশটি, পাঁচতলা একটি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (১৯০১) এই বাড়ির সংখ্যা বেড়ে হয় একতলা বাইশ হাজার, দোতলা তের হাজার, তিনতলা তিন হাজার, চারতলা তিনশো, পাঁচতলা একুশখানা। লোকসংখ্যার অনুপাতে বাড়ির সংখ্যা বেশি বেড়েছিল দেখা যায়। বর্ধিষ্ণু শহরের বসবাসের কোনো সমস্যা

উনিশ শতকে দেখা দেয়নি। ওয়েলেসলির আমল থেকে লটারি কমিটি, নগর উন্নয়ন কমিটি এবং তারপর কর্পোরেশনের কাজকর্ম থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে নতুন ধনতান্ত্রিক সামাজিক জীবনের তাগিদে অন্যান্য দেশে যেমন আধুনিক শহরের বিকাশ হয়েছে আমাদের দেশেও আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতায় তাই হয়েছিল। সামাজিক প্রয়োজনের বৈচিত্র্য এবং সেই প্রয়োজন পরিতৃপ্তির কলাকৌশলের জটিলতা শহরে ক্রমে বাড়তে থাকলো। শহরের সময় (time) অফুরন্ত নয়। অজ্ঞাতসারে ঢিমেতালে সূর্যের প্রদক্ষিণের ছন্দে শহরের সময় কাটে না। কোনো একটিমাত্র 'বর্তমানে'র স্বেচ্ছাচারিতা শহরে নেই, কোনো একটিমাত্র 'ভবিষ্যতে'র একঘেয়েমিও নেই, যে-ভবিষ্যৎ অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সময়টা শহরে প্রতিটি সেকেণ্ডের টুকরোয় ভাগ করা এবং বুর্জোয়াদের বিচারে প্রতিটি সেকেণ্ডের অর্থমূল্য আছে। তাই প্রতিটি সেকেণ্ডের রং বদলায়। বহু বিচিত্র রঙে রঙিন, বহু বিচিত্র ছন্দে আন্দোলিত শহরের সময়তরঙ্গ। তারই বর্ণচ্ছটা নতুন শহরের মানুষের জীবনে প্রতিফলিত। যেমন সময় তেমনি কর্ম। ছকবাঁধা কর্মের শৃঙ্খলে শহরের মানুষের জীবন বংশানুক্রমে বাঁধা থাকে না। কুলগত বন্ধন ছিন্ন ক'রে কর্মময় জীবন সমাজের বহুমুখী দিগন্তবিস্তৃত পথে ধাবিত হয়।

জীবনের একটা সিম্‌ফনি উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরে শোনা গিয়েছিল যে সিমফনির কথা মামফোর্ডের মতো নগরবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করতে ভোলেননি। সময়ের রং ও সামাজিক কর্মের ছন্দের মধ্যে তখন একটা সংগতি ছিল। এই সিম্‌ফনি ও সংগতির ফল হলো উনিশ শতকের উপরতলার নবজাগরণ। যদিও তার ভিত আদৌ দৃঢ় ছিল না ঔপনিবেশিক পরিবেশে, তাহলেও নতুন মানুষের নতুন জীবনের চলার ছন্দে ও সুরে নবযুগের একটা নতুন ঐকতান সমাজজীবনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষীণসুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ঘোড়া ও স্টীমইঞ্জিনের গতি দিয়ে জীবনের গতি তখন নিয়ন্ত্রিত হতো। বর্তমান বিশ শতক থেকে এই সিম্‌ফনির সুর বদলাতে থাকে। ১৯০১ সালের সাড়ে-আট লক্ষ লোক ১৯২১ সালে হয় নয় লক্ষ—১৯৩১ সালে এগার লক্ষ—১৯৪১ সালে একুশ লক্ষ—১৯৫১ সালে পঁচিশ লক্ষ—১৯৬১-৬৬ সালের মধ্যে চল্লিশ-পয়তাল্লিশ লক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ শতকের প্রায় চল্লিশ বছরে, দশ-বারো লক্ষ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এমন কিছু বেশি নয়। মহাযুদ্ধের পর গত কুড়ি বছরের মধ্যে কলকাতার লোকসংখ্যা এত বেড়েছে যা তার আগের দুশো বছরেও বাড়েনি। প্রায় আট কোটি লোকের কণ্ঠের আওয়াজে বেঠোফেনের সিম্‌ফনি যে আর শোনা যাবে না অথবা কোনো ভাগনার-বেঠোফেনের পক্ষেই যে আর সেই পুরনো সিম্‌ফনি 'কম্পোজ' করাও সম্ভব নয় তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পঞ্চাশোর্ধ্ব কলকাতার লোকজীবনের নতুন সিম্‌ফনি যিনি বা যাঁরা রচনা

করবেন সেই সুরশিল্পীদের আজও আবির্ভাব হয়নি। যতদিন তা না হয় ততদিন কলকাতার জীবনে আর 'সিম্‌ফনি' শোনা যাবে না, শুধু শোনা যাবে কুৎসিত কর্কশ 'ক্যাকোফনি' এবং শুনতেও হবে তাই, শান্তির গজদন্তমিনার ফেটে চৌচির হয়ে যাবে সেই ক্যাকোফনিতে।

শহরের সবচেয়ে বেশি কর্মপ্রধান অঞ্চলকে 'down-town area' বলা হয়। কলকাতা শহরে এই ডাউনটাউন অঞ্চল গত আড়াইশো বছর ধ'রে একটি অঞ্চলেই আছে। লালদিঘি অর্থাৎ ডালহৌসি স্কয়ার কেন্দ্র ক'রে ধর্মতলা পর্যন্ত ব্যাসার্ধ ধ'রে একটি বৃত্ত টানলে যে অঞ্চলটি হয়, সেইটাই কলকাতার 'ডাউনটাউন' অঞ্চল। বিশ শতকের চল্লিশের মধ্যে কলকাতার মানচিত্রে এই অঞ্চলে স্কাইস্ক্রেপার বিশেষ দেখাই যায় না। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে শতাধিক স্কাইস্ক্রেপার আকাশমুখো ঠেলে উঠেছে। শহরের মানুষের চোখের সামনে থেকে দিগন্তের রেখাটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে। মাথার উপরে নীল আকাশটুকুও ক্রমে ঢেকে যাচ্ছে। রাজপথের উপরে আকাশ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঠিক পথেরই মতো এবং তার দুপাশে কংক্রীটের প্রাসাদে দৃষ্টি অবরুদ্ধ। মনে হয় আকাশটা যেন একটা আয়না আর কলকাতা শহর তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে। আকাশটা খণ্ড খণ্ড হয়ে আঁকাবাঁকা অলিগলি ও ছোটবড় রাজপথে পরিণত হয়েছে। পথ চলতে মাথার উপরে আকাশের এই টুকরোগুলোকে দেখা যায়। আকাশ যেখানে টুকরো হয়ে যায় দৃষ্টিপথে সেখানে মন আর খোলা আকাশের মতো উদার থাকবে কি ক'রে? শহরের মানুষ আকাশের উদারতা থেকেও বঞ্চিত।

আকাশ মাটি আর সবুজ। আকাশ খণ্ডিত। মাটি প্রায় অবলুপ্ত। যেমন বড়বাজারে মাটি কোথায়, ডালহৌসিতে মাটি কোথায়, চিৎপুরে বৌবাজারে পীচপাথরখোয়াবাঁধানো পথ ইটপাথরলোহাকংক্রীটের বাড়ি। মাটি নেই। কর্পোরেশনের আইন অনুসারে পাশেপশ্চাতে হয়ত মাটি আছে চারফুট আর দশফুট যেমন মাটি আছে শহরের পার্কে পার্কে। কিন্তু শহরের ইটপাথরলোহার কঠিন অবয়বের মধ্যে এই মাটি আর সবুজের টুকরোগুলোকে মামফোর্ড বলেছেন 'soiled handkerchief' বা নোংরা ময়লা রুমালের মতো। শহরের বুকে মাটি আর সবুজের স্পর্শ রাখার এই কঠোর প্রয়াস নিতান্তই হাস্যকর। এই পাথরের মরুভূমিতে পার্কগুলো মরূদ্যানের মতো বিরাজ করবে বলে একদা যাঁরা কল্পনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা আজ সেগুলির অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখলে শিউরে উঠবেন। পার্ক শুধু পার্ক নয়, খোলা বস্তি। শহরের যত ব্যাধিগ্রস্ত ভিখিরি ছদ্মবেশী পলাতক চোরডাকাত গুণ্ডা ভবঘুরে নিরাশ্রয় নোঙরহীন লোক, যারা ধনতান্ত্রিক সভ্যতারই অভিশপ্ত প্রতীক, তাদের

উন্মুক্ত ধর্মশালা কলকাতা শহরের পার্ক। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও শহরের এই পার্কগুলিতে একটু খোলা জায়গা, এক টুকরো সবুজের উপর একটু নিভৃতে হয়তো একটা ফুলগাছের পাশে অভিভাবকদের আড়ালে অতিসন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে শহরের তরুণতরুণীদের প্রথম প্রেমের রোমান্স জমে উঠত। এখন ভুলেও কেউ পার্কের দিকে পা বাড়ায় না। খোলা ময়দান লেক বা গঙ্গাতীরের ক্ষণস্থায়ী বুফে কফিহাউস রেস্তরাঁ বা হোটেল অথবা কোনো মোটেল হলো বর্তমান কলকাতার তরুণতরুণীদের give-and-take-এর আদর্শ স্থান কারণ প্রেম এখন 'ফিজিওলজিকাল অ্যাবারেশন' আর রোমান্স হলো ইনস্যানিটির লক্ষণ। কাজেই হোটেল অথবা মোটেল তার পাঁপড়িমেলার চরম কেন্দ্র। কিন্তু যা বলছিলাম অর্থাৎ পার্কের কথা। পার্ক এখন শহরের ঘৃণিত উপেক্ষিত আবর্জনা-তুল্য মানুষের ডাস্টবিন, নোংরা রুমাল বললেও তাকে ট্রিবিউট দেওয়া হয়। পার্কের মাটি সুস্থ মানুষ স্পর্শ করে না। সকাল থেকে উঠে ম্যাকাডামাইজ্‌ড রাস্তার উপর দিয়ে আমরা চলতে থাকি, ঘর থেকে বেরিয়ে অফিসে যাই অফিস থেকে বেরিয়ে ঘরে আসি, পায়ের তলায় মাটির ছোঁয়া লাগে না। দেহের সঙ্গে মাটির সংযোগ নেই। এককামরা দুকামরা বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে আমরা থাকি, শান-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠি আর নামি, আট স্কয়ার ফুট বারান্দায় টবে ফুলের বাগান করি, ছ-ইঞ্চি টবের মধ্যে প্রকৃতিকে বন্দী ক'রে আমরা জীবনে সবুজের তৃষ্ণা মেটাই। টবের বাইরে কলকাতাকে মনে হয় ধূসর শহর যেন আমাদের ধূসর জীবনের প্রতিবিম্ব।

জীবনে আকাশ নেই মাটি নেই সবুজ নেই। মহানগরের জীবনে। এক কামরার ফ্ল্যাটবাড়ির রুদ্ধ ঘরের টবের ফুলগাছের মতো শহুরে মানুষের মন। আকাশের সূর্যকিরণ তাকে স্পর্শ করে না। মাটির বুক থেকে সে রস সঞ্চয় করে না। একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে শুধু একটু কলের জল আর কয়লার ধোঁয়ার স্পর্শে তার বিকাশ হয়। এই নাগরিক মনে তাই ফুল ফোটে না। যদিও বা ফোটে তাহলেও তার রং ও রূপ বিকৃত হয়ে যায়। এই টবের মন নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য পালন করি মেট্রোপলিটন শহরে

> Yet we have gone on living,
> Living and partly living.
>
> —*Eliot*

পরিপূর্ণ বেঁচে থাকি না, আংশিক বেঁচে থাকি। শহরের মানুষের এই বাঁচার জন্য কত অনুষ্ঠানের যে সমারোহ তা বলে শেষ করা যায় না। সিনেমা ককটেলবার ঘোড়দৌড় ক্লাব নাইটক্লাব গেটটুগেদার জুয়ারআড্ডা নেশারআড্ডা শেয়ারমার্কেট—এ রকম বহু অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের আয়োজন। মেট্রোপলিটন

শহরের 'partly living'-এর আয়োজন। তাদের শতছিন্ন মন ও স্নায়ুর ছেঁড়া তারগুলোকে যতদূর সম্ভব উত্তেজনার মোচড দিয়ে দিয়ে চাঙ্গা করার কি নিদারুণ ক্লান্তিকর প্রয়াস! ঢালু পাহাড়ের গায়ে সিসিফাসের পাথরের বোল্ডার তোলার চেষ্টার মতো, প্রাণপণে ঠেলে পাথরখণ্ড খানিকটা তোলা যায় তারপর আবার গড়িয়ে পড়ে। মনের ছেঁড়া তারগুলো যত বেসুরো হয়ে যায়, যত অসাড় ও শব্দহীন হয় তত নাগরিক উত্তেজনার বৈচিত্র্য বাড়তে থাকে। সব উত্তেজনার বড় উত্তেজনা sex কিন্তু তাতেও তো তেমন কাজ হয় না। নেশাখোর যখন সমস্ত নেশাকে জয় ক'রে ফেলে—আফিম ভাং মদ কোকেন—তখন তাকে সাপের বিষ অথবা তার চেয়েও বিষাক্ত কোনো ড্রাগ ইন্‌জেকশন নিতে হয়। বিজ্ঞাপনে সেক্স সিনেমায় সেক্স পোস্টারে সেক্স সংগীতের সুরভঙ্গিতে সেক্স সাহিত্যে সেক্স রাস্তায় চলাফেরায় সেক্স—শেষ পর্যন্ত সেক্সের ভাণ্ডারও শূন্য প্রায়। বাকি থাকে সেক্সের ইন্‌জেকশন। বিষ হজম করতে করতে নীলকণ্ঠের মতো অবস্থা হলে হয়ত উত্তেজনার এমন ডোজ ইন্‌জেক্ট করতে হবে যে রুগীই মারা যাবে। উত্তেজনার বালুচরে শহরের লোকের জীবনের এই সৌধ গ'ড়ে তোলার চেষ্টা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। একেই মামফোর্ড বলেছেন—'the sensation of living without the direct experience of life—a sort of spiritual masturbation'। জীবনের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা-নির্ভর এই বাঁচার প্রচেষ্টা হলো একধরনের 'আত্মিক আত্মমৈথুন'। সেই মার্কসীয় alienation-এর চূড়ান্ত পরিণতি।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছিল 'ক্যালকাটা ক্রনিকল্' পত্রিকার প্রায় পৌনে দুশো বছর আগেকার একটি সংবাদের কথা (১৭৯২)। কসাইতলার (বর্তমানে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট) আস্তাবলে বন্দী একটি ক্রীতদাসী বালিকার সংবাদ। নতুন বুর্জোয়া যুগের কসাইদের কলকাতা শহরে নগরজীবনের যে নাটক ভবিষ্যতে অভিনীত হবে, কসাইতলার আস্তাবলের ঘটনা তার পূর্বরঙ্গ মাত্র। মানুষের মন তখনো সাদা কাগজের মতো একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যায়নি। অনুভূতির আঁচড় তার উপর একটুআধটু পড়ত যদিও ভগবানের ভাগ্যবান সন্তানরা সাধারণ মানুষকে পশুর চেয়েও অধম মনে করত। ক্রীতদাসী বালিকাটিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে একটি আস্তাবলে বন্দী ক'রে রাখতে তার প্রভু কোনো দ্বিধাবোধ করেনি যদিও একমুঠো ক'রে খাবার তাকে রোজ দেওয়া হতো। অনুভূতির এই হিজিবিজি আঁচড়টুকু পরবর্তীকালে কলকাতার মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছে, ক্রমে

যত কলকাতা 'polis'-এর স্তর থেকে 'metropolis'-এর স্তর অতিক্রম ক'রে 'necropolis'-এর স্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছে।*

মামফোর্ড Parasito-Patholopolis-এর দু'টি স্তরকে একত্র ক'রে Tyranno-polis নাম দিয়েছেন কারণ তিনি বলেছেন যে এই দুই স্তরের মধ্যে কালের ব্যবধান বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। কলকাতা শহরের জীবনে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্তরের মধ্যে কালের ব্যবধান সামান্য, খুব বেশি হলে পঁচিশতিরিশ বছরের বেশি নয়। আঠারো উনিশ ও বিশ শতকের তিরিশের শেষ পর্যন্ত (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু) কলকাতা শহরের বিকাশ প্রাথমিক 'polis'-এর স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে রেলপথ গড়ে ওঠার ফলে কলকাতা শহর কেবল জলপথনির্ভর না হয়ে স্থলপথেরও বৃহৎ যোগাযোগকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং বিশ শতকের গোড়া থেকেই 'automotive era'-র সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতায়। তাহলেও ১৯৩৯-৪০ সালের আগে পর্যন্ত কলকাতার দ্বিতীয় স্তরের মেট্রোপলিটন রূপটাই স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়নি। তার কারণ কলোনিয়াল শহর বলে কলকাতার অর্থনৈতিক আত্মবিকাশের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। পাশ্চাত্ত্য শহরের মতো অর্থাৎ লণ্ডন প্যারিস বার্লিন নিউইয়র্ক প্রভৃতির মতো তাই কালক্রম বজায় রেখে দুশো বছরের মধ্যেও তার দ্বিতীয় স্তরের মেট্রোপলিটন জীবনেরই রূপান্তর ঘটেনি। অতিক্রুত সমস্ত স্তর ডিঙিয়ে একপুরুষের মধ্যে নেক্রোপলিসের দিকে কলকাতার যাত্রা শুরু হয়েছে। ভারতচন্দ্র হরুঠাকুর ভোলাময়রার যুগ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত মধুসূদন হেমচন্দ্রের যুগ পার হয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ ক'রে মনে হয় কলকাতা শহর যেন রাতারাতি 'বীট' ও 'হাংরি' জেনারেশনের কবিদের যুগে পদার্পণ করেছে।

কলকাতার মেট্রোপলিটন স্তরের বিকাশ আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে দেখেছি। তারপর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পর কখন যে এই মেট্রোপলিটন স্তর মেগালোপলিটন প্যারাসিটোপলিটন ও প্যাথলোপলিটন স্তরগুলির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল তা দাগ টেনে বলা যায় না। সমাজ-জীবনের

* (১৯৭১) কিছুদিন আগে (৮ মার্চ ১৯৭১) 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা 'Calcutta is Alive' নামে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ ক'রে মোটামুটি এই কথা বলতে চেয়েছেন যে কলকাতার প্রাত্যহিক প্রাণহানাহানির মধ্যেও তার আনন্দ উৎসব নাচগানহল্লা আমোদ-প্রমোদ মিলিয়ে যে উচ্ছল জীবনধারা তা ব্যাহত হয়নি। বাস্তবিকই তাই। এমনকি প্রতিদিন দেশের তরুণদের প্রাণোৎসর্গের মর্মান্তিক কাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের লোমহর্ষক সংবাদেও কলকাতার আমোদপ্রবাহে ভাটা পড়েনি। না পড়বারই কথা; কারণ কসাইখানার স্যাঁতসেঁতে গলিতে আঠারো শতকে ব্রিটিশ শাসনকালে কলকাতার যে মন, যে বিবেক তৈরি হয়েছিল তা নব্যধনিকের তো বটেই মধ্যবিত্তেরও বিবেক এবং পরবর্তীকালে কলকাতার লৌহপ্রস্তর রূপায়ণের সঙ্গে সেই বিবেকই আজ পাথরলোহাকংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে।

অখণ্ডতা নাগরিক জীবনের মেট্রোপলিটন স্তরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, টুকরো টুকরো অনেক সমাজ গ'ড়ে ওঠে, হয়তো অনেক কাছাকাছি, তবু মনে হয় যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। শহরের মেট্রোপলিটন দেহ ক্রমেই ফুলতে ফাঁপতে থাকে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। চারিদিক থেকে লোক যেন পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটতে থাকে শহরের দিকে জীবিকার ধান্ধায় অর্থের ধান্ধায় আশ্রয়ের ধান্ধায় স্বার্থের ধান্ধায় এমনকি নির্ধান্ধার নৈরাজ্যে গা ভাসিয়ে দেবার ধান্ধায়। আঠারো বা উনিশ শতকে কলকাতা শহরের দিকে গ্রাম থেকে যে অভিযান হয়েছিল তাকে বাস্তবিক 'অভিযান' বলা যায়। সে-অভিযান ছিল পর্বত অভিযানের মতো, সমুদ্র অভিযানের মতো। এরকম অভিযান আঠারো শতকে কলকাতা শহর অভিমুখে রামমোহন করেছিলেন এবং কলকাতার বড় বড় প্রাচীন পরিবারের পূর্বপুরুষরা করেছিলেন। উনিশ শতকে পথের মাইলস্টোন গুনতে গুনতে বিদ্যাসাগর করেছিলেন যেমন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা তরুণ বয়সে করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের মেট্রোপলিটন পর্বের শহরমুখী মানুষের দৌড়টা হলো ছত্রভঙ্গ জনতার দৌড়ের মতো। শহরে ঠাসাঠাসি ক'রে তারা বসবাস করে, শহরের সীমানা ভেঙেচুরে এগিয়ে নিয়ে যায়, কোথাও মানুষের বাঁচার মতো প্রাকৃতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে না। জনকুণ্ডলীর একএকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মেট্রোপলিটন শহরের বুকে ভেসে ওঠে। সেখানে বাতাস না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, ঘুম না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, আকাশের নীল বা সূর্যের আলো না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, চলার স্বচ্ছন্দ গতি না থাকলেও মানুষ বেঁচে থাকে, বাঁচার মতো খাবার না পেলেও মানুষ বেঁচে থাকে। মেট্রোপলিটন শহরের এই বিচ্ছিন্ন জনতার ঘেঁষাঘেঁষি দ্বীপগুলিকে মামফোর্ডের ভাষায় **'do-without areas'** বা 'না হলেও চলে' অঞ্চল বলা যায়। কিছু না হলেও কিছু না পেলেও তবু মানুষের জীবন গড়িয়ে চলে। শহর বাড়তে থাকে কিছু হাওয়ায় যেমন বেলুন বাড়ে তেমনি। কেবল যে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের মতো মানুষ বসবাস করে তা নয়, মেট্রোপলিটন শহরের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান জনকুণ্ডলীর চাপে যত ফাঁপতে থাকে তত ভিতরটা তার ফাঁপা হয়ে যায়। হাসপাতাল স্কুলকলেজ খেলার মাঠ সিনেমা হোটেল যানবাহন পথঘাট বাজার সর্বত্র স্ফীতকায় জনতার ভয়াবহ রূপ দেখা যায়। কোথাও স্থান নেই রুগী আছে মুমূর্ষু রুগী, কোথাও স্থান নেই ছাত্র আছে, কোথাও স্থান নেই দর্শক আছে, কোথাও স্থান নেই যাত্রী আছে। জনকুণ্ডলীর রূপ সব জায়গায় একরকম। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলেন **'growth by civic depletion'**—বিলীয়মান নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দ্রুতবর্ধমান নাগরিক বিস্তার। দেবালয় থেকে টাউনহল, অ্যাসেম্বলি থেকে কর্পোরেশন, পাড়ার মুদির দোকান থেকে

নগরকেন্দ্রের সমবায়িকা ও ডিপার্টমেন্ট স্টোর, সিনেমাহল থেকে খেলার ময়দান, কিণ্ডারগার্টেন থেকে স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে রেলওয়ে স্টেশন—সর্বত্রই যেন জনকুণ্ডলীর নাভিশ্বাস উঠেছে। একমাত্র শহরের রাজপথে এই জনকুণ্ডলীর স্থান সংকুলান হয় কিন্তু সেখানেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগের চিহ্ন নেই। অভিন্নতাবোধ আছে শুধু রাজপথের যান্ত্রিক যানবাহনের বিপুল স্রোতের সঙ্গে, যেখানে 'জনকুণ্ডলী' ও 'যন্ত্রকুণ্ডলী', ক্রাউড ও অটোমোবিল এক হয়ে 'জনযন্ত্র' হয়ে যায়। এই জনযন্ত্রের না আছে চোখ, না আছে মন, না আছে বিবেক, পথের পাশে কে করোনারি স্ট্রোকের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তা দেখার মতো না আছে সময়—আছে কেবল উদ্‌ব্যস্ত শহরে হাঁপরের মতো দুটো ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ায় নিঃসারিত নাভিশ্বাস আর নির্বিকার মনের জৃম্ভন।

মেট্রোপলিটন শহরে প্রকৃতির সবুজ নেই শুধু আছে কাগজের কারখানার কাগজ। এই পুঁজিবাদী শহরে মানুষের স্বপ্ন পর্যন্ত কাগজ দিয়ে তৈরি। শুধু কাগজ আর সেলুলয়েডের স্বপ্ন শুধু কাগজ আর সেলুলয়েডের আনন্দ। মেট্রোপলিটন শহরের মহাধ্বনি হলো কাগজের শব্দ 'হুইশ ও ক্র্যাক্‌ল' এবং মহাছন্দ হলো যান্ত্রিক। কাগজের ভিতর দিয়ে জীবনের সত্যকে প্রতিদিন এখানে দেখতে হয়। জীবনের যা-কিছু কাজকর্ম ভাবনাচিন্তা ধ্যানধারণা সবই কাগজের সঙ্গে লিপ্ত। প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং হলো মেট্রোপলিসের প্রধান শিল্প। ট্যাবুলেটিং মেশিন জর্নাল লেজার কার্ডক্যাটালগ ডীডকন্ট্রাক্ট-মর্টগেজ প্রসপেক্‌টাস বিজ্ঞাপন ম্যাগাজিন সংবাদপত্র সমস্ত মিলিয়ে একটা প্রাত্যহিক কাগজের মহোৎসব। থিয়েটারে সাহিত্যে সংগীতে শিল্পকলায় ব্যবসাবাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি হয় কেবল কাগজে।* মেট্রোপলিটন শহরে শাসন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা সবকিছু যে কত বিরাট ও ব্যাপক, কতখানি জনকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা কেবল কাগজের স্তূপ দেখলে বোঝা যায়। শহরে জলাভাব অমনি কাগজের স্তূপ জমতে থাকল কর্পোরেশনে আর সেক্রেটারিয়েটে। শহরে বাসস্থান নেই অমনি ঘরবাড়ির পরিকল্পনাসহ কাগজের পাহাড় জমতে থাকল। পুলিশের নির্যাতন, কালোবাজারির মুনাফা মনোপলিস্টের মুনাফা, মন্ত্রীদের অন্যায়-অবিচার, শিক্ষার গলদ, শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিযোগ ইত্যাদি প্রভৃতি অনেক সমস্যা যখন জমা হয়ে উঠলো তখন

* The scholar with his degrees and publications, the actress with her newspaper-clippings, and the financier with his shares and voting proxies, measure their power and importance by the amount of paper they can command.
Mumford : *The Culture of Cities*

একটার পর একটা তদন্তকমিশন বসলো এবং মাসের পর মাস তদন্ত হলো তার হাজার হাজার পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রথমে কাগজে টাইপ করা হলো তারপর কাগজে ছাপা হলো এবং হাজার পৃষ্ঠার নোট বিরাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো অবশেষে রেকর্ডরুমে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হলো। কোনো মানুষ সেই রিপোর্ট পড়ল না অথবা তার বিশাল চেহারার দিকে তাকিয়েও দেখল না কারণ পড়া বা দেখা সম্ভব নয় যেহেতু ধৈর্য নেই সময়ও নেই। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কাগজে। সমস্ত অভিযোগ সমস্ত দাবি কাগজে মেটানো হলো। কাগজের বুরোক্রেসি কাগজের ডেমোক্রেসি কাগজের ন্যায্য দাবি কাগজের অভিযোগ কাগজের ট্রাজেডি কাগজের কমেডি কাগজের খ্যাতি কাগজের বিদ্যা কাগজের স্কলারশিপ কাগজের ঘৃণা কাগজের প্রেম কাগজের স্বপ্ন সমস্ত মিলিয়ে বিরাট একটা কাগজের মেট্রোপলিটন শহর। অফুরন্ত একটা কাগজের রিলের দুঃস্বপ্ন মেট্রোপলিটন মানুষের জীবন।*

এই পণ্যময় কাগজময় অবাস্তব নাগরিক পরিবেশে জীবনের ভোগ-বিলাসিতা সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনন্দউল্লাস কখনো স্বাভাবিক বা সত্য হয় না। সমস্ত আনন্দ সমস্ত উপভোগ আয়াস ও বিলাস কেবল নিপাতনে ক্লেদনিঃসরণ মাত্র। স্বাভাবিক সুস্থ মনের স্ফূর্তি নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা 'Birth and Copulation and Death'-এর চক্রবৎ যান্ত্রিক আবর্তন। স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্ভোগও 'commercialized' এবং মেট্রোপলিটন শহরে যেহেতু অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা অনেক বেশি তাই স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন আর্থিক ও সামাজিক কারণে মরুমায়ার মতো অলীক ও অবাস্তব বলে মনে হয়। ঘরে স্থান নেই রাস্তায় স্থান নেই ট্রেনে ট্রামে বাসে স্থান নেই অফিসে স্থান নেই ইডেন উদ্যান থেকে শ্মশান কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। সর্বত্র জনতার চাপ আর জনতার উত্তাপ। চলার পথে কোথাও কোনোখানে পুরুষের পৌরুষ অথবা নারীর নারীত্ব প্রকাশের অবকাশ নেই। যেমন পুরুষ তেমনি নারী সকলে ওয়েদারপ্রুফ ওয়াটারপ্রুফ শকপ্রুফ টাচপ্রুফ এবং স্বভাবতই অ্যান্টিম্যাগনেটিক। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর জৈবিক ভেদাভেদও জনপিণ্ডের স্টীমরোলারের চাপে দলিতমথিত। কারও কোনো অঙ্গের সামান্য স্বাতন্ত্র্যবোধও নেই, যেন কেউ রক্তমাংসের মানুষ নয়, প্রত্যেকে রবার ও প্লাস্টিকের পুতুলের মতো একটা বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়ায় চলেফিরে বেড়ায়, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

* The world of paper, paper profits, paper achievements, paper hopes and paper lusts, the world of sudden fortunes on paper and equally grimy paper tragedies··· (Mumford : *op. cit.*)

ঘুরছে তো ঘুরছেই। দেহের সঙ্গে দেহের ঘাতপ্রতিঘাতে অটোমেটিক যন্ত্রের মতো ঘুরছে। মেট্রোপলিটন শহরে জনতার খণ্ড খণ্ড দৃশ্য হলো অন্যতম নয়নাভিরাম নাগরিক দৃশ্য। লক্ষ মানুষ চলছে নির্বিকার উদাসীন, জৈবিক আত্মরক্ষার চিন্তায় নিমজ্জিত। হয় অফিসের দিকে না-হয় ঘরের দিকে চলছে। হঠাৎ হয়তো এমন সময় চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে একজন যাত্রী পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশবিশ হাজার লোকের ভিড় জমে গেল, গলার শির ও হাতের মাস্‌ল ফুলে উঠলো, একখানা দুখানা তিনখানা বাস পুড়ে গেল, ড্রাইভার কন্‌ডাকটার আধমরা অবস্থায় হাসপাতালে গেল, আশপাশের দোকানপাট লুঠ হলো, পুলিশ এসে টিয়ারগ্যাস ছাড়ল, গুলী করল, বারোজন আহত ও চারজন নিহত হলো, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রী এসে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বক্তৃতা দিলেন, জনতার কণ্ঠে বজ্রের মতো নিনাদিত হলো 'তদন্ত চাই', ফলে কমিশন বসল, তদন্ত হলো, দেড় হাজার পৃষ্ঠা কাগজে ছাপা এক রিপোর্ট বেরুল, কত টন কাগজ লাগল কেউ তার খোঁজ রাখল না, রিপোর্ট কেউ দেখল না, কারণ সেকথা তখন আর কারও মনে নেই। সামান্য উত্তেজনার শলাকা থেকে আরম্ভ এবং প্রচণ্ড উত্তেজনার অগ্ন্যুদ্‌গিরণে তার ক্লাইম্যাক্স। তারপর স্তূপাকার ফাইল আর রিপোর্টের টন-টন কাগজের মধ্যে তার সমাপ্তি ও সমাধি। কোনো জীবন্ত মানুষ অথবা মানবোত্তর জীব—কলকাতা যখন মহেঞ্জোদড়ো হয়ে দুশো ফুট মাটির তলায় চলে যাবে তখনো—এইসব ফাইল ও রিপোর্ট পড়ে দেখবে না। আকাশ থেকে মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণে কাগজের মেট্রোপলিটন শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ছেঁড়া কাগজে কাগজ তৈরি হয় কিন্তু ছাই দিয়ে কাগজও তৈরি হবে না।

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সান্নিধ্য মেট্রোপলিটন শহরে দ্রুত কমতে থাকে। সংযোগ ঘটে টেলিফোনে বেতারে অথবা খুব বেশি হলে চিঠিপত্রে। দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব উভয়ের মধ্যে অনেক কিছু লেনদেনও হয়, পরস্পরের নাম জানে, কিন্তু মুখ দেখেনি কেউ। কেউ মুখ চেনে নাম জানে না, কেউ নাম জানে মুখ চেনে না। কাগজের বন্ধুত্ব কাগজের সান্নিধ্য বৈদ্যুতিক তারের বন্ধুত্ব তারের সান্নিধ্য। মেট্রোপলিটন শহরে তাই জনসংযোগ ও জনসমাবেশের একমাত্র উপায় হলো উত্তেজনা। খেলার মাঠের উত্তেজনা সিনেমার উত্তেজনা রাস্তাঘাটে যে-কোনো দুর্ঘটনার উত্তেজনা দাঙ্গা-স্ট্রাইক-মারামারির উত্তেজনা ঘোড়দৌড়ের উত্তেজনা সাইকেলরেসের উত্তেজনা মোটররেসের উত্তেজনা কুকুরদৌড়ের উত্তেজনা সাঁতারের উত্তেজনা বক্সিং কুস্তির উত্তেজনা প্রদর্শনীর উত্তেজনা মেলাবারোয়ারিপুজোর উত্তেজনা ক্লাবেহোটেলে সুরা-

নৃত্যের উত্তেজনা বাজারেবাসেট্রামে লোকালট্রেনে আরকিছুনাহোক প্রচণ্ড তর্কাতর্কি থেকে ঘুষোঘুষির উত্তেজনা। মোটকথা যাহোক উত্তেজনা কিছু একটা চাই তা না হলে অসাড় অচৈতন্য নাগরিককে চেতিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সামান্য একটু উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গ হলেই যথেষ্ট। তাই থেকে অগণিত জনসমাবেশ তারপর জনতায় অবশ্যম্ভাবী অগ্নিসংযোগ। মেট্রোপলিটন শহরে কেবল উত্তেজনার মহোৎসব এবং তার সঙ্গে জনতার বহ্ন্যুৎসব। দেবালয় থেকে বিদ্যালয়, বিদ্যালয় থেকে বিধানসভা, বিধানসভা থেকে কর্পোরেশন, কর্পোরেশন থেকে স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশন ও বিদ্বৎসভা সর্বত্র একই উত্তেজনার উৎসব। যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁদের সামাজিক মর্যাদা আছে, যাঁরা বরেণ্য, সভাসমিতি থেকে বিধানসভা পর্যন্ত তাঁদের যেরকম আচরণ ও ব্যবহার ঠিক রাস্তার উপেক্ষিত ড্রেনপাইপআঁটা বাউণ্ডুলেদেরও সেই একই আচরণ ও ব্যবহার। শহরের পাতালপুরীতে জুয়াড়ির ও মাতালের 'ডেনে' যে দৃশ্য ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেন্টের ভূস্বর্গেও সেই একই দৃশ্য। মানুষ যে আসলে জন্তু এবং যূথচর জন্তু এই সত্যটাই ধনতান্ত্রিক মেট্রোপলিটন শহরে প্রকট হয়ে ওঠে। উত্তেজনাবিতাড়িত বিকট জনযোগে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাইরের প্রকৃতি ও মানুষেব প্রকৃতি এই কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে বিকৃত হয়ে বিধ্বংসীরূপে প্রতিঘাত করে এবং প্রতিশোধ নেয়। তখন **'negative vitality'**-র যাবতীয় উপাদান থেকে সঞ্জীবনী শক্তি খুঁজতে হয় শহরের মানুষকে। ড্রাগ সিডেটিভ হিপনটিক অ্যাস্পিরিন অ্যালকোহল কিছুই বাদ থাকে না। মনে হয় পুরাণের নরকের বর্ণনা নিঃশেষ ক'রে ফেললেও এই মহাবিকৃত পুঁজিবাদী মেট্রোপলিটন শহরের রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না। জেম্‌স জয়সের 'ইউলিসিস'-এর লিওপোল্ড ব্লুম-রা এই মেট্রোপলিটন নরকেই বাস করেন। তাঁরা খবরের কাগজ পড়েন হাই তোলেন রেডিও শোনেন কালীমন্দিরে পুজো দেন তারকেশ্বরে মানত করেন সরীসৃপের মতো কালোবাজারে চলাফেরা করেন ঘুমের পিল্‌ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন দুঃস্বপ্নের কিল খেয়ে ধড়্‌ ফড়্‌ ক'রে জেগে ওঠেন। মনে হয় যেন মেট্রোপলিটন শহর কলকাতা একটা **'vast manless moonless womoonless marsh'** এবং **'lugugugubrious' (James Joyce)**।

তবু মেট্রোপলিটন শহর বাড়তে থাকে ফাঁপতে থাকে যেমন বর্তমানে কলকাতা শহর বাড়ছে তো বাড়ছেই, ফাঁপছে তো ফাঁপছেই। তাই তো হবে কারণ, **'aimless acquisition : reckless expansion : progressive disorganization' (Mumford)**—এই তিনটি হল মনোপলি ক্যাপিটালের স্বর্গপুরী মেট্রোপলিটন শহরের বড় লক্ষণ। লক্ষ্যহীন অনির্বাণ লোভ ও অর্জনেচ্ছা আর কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রসারণ এবং ধারাবাহিক অরাজকতা ও

বিশৃঙ্খলা মেট্রোপলিটন শহরে ব্যাধির উপসর্গের মতো দেখা দেয়। একদা প্রাচীন কলকাতায় 'ডাউন টাউন' অঞ্চলের কাছে অর্থাৎ শাসনবাণিজ্যকেন্দ্রের কাছে কলকাতার অভিজাতপল্লী ছিল। তারপর কেন্দ্রস্থলের কোলাহল যত বাড়তে থাকে তত অভিজাত ও বিত্তবানদের বসবাস কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে তাই অবশ্য হবার কথা। এই সময় কলকাতার চারিদিকে শহরতলির উৎপত্তি হতে থাকে। কলকাতার এই পুরনো শহরতলির মধ্যে ছিল সিঁথি কাশিপুর পাইকপাড়া চিৎপুর টালা উল্টোডাঙ্গা সিমলা শুড়া শিয়ালদা ইণ্টালি তপ্‌সে ডিহিশ্রীরামপুর চক্রবেড়ে ভবানীপুর বালিগঞ্জ মুদিয়ালি সাহানগর টালিগঞ্জ ওয়াটগঞ্জ একবালপুর খিদিরপুর গার্ডেনরিচ প্রভৃতি অঞ্চল। উত্তরশহরতলি দক্ষিণশহরতলি মাণিকতলা ও টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ছিল এইসব শহরতলি অঞ্চল। শহরের পুবদিকে উল্টোডাঙ্গা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত অঞ্চলে কলকাতার ধনীলোকদের বড় বড় বাগানবাড়ি ছিল যেমন ব্যাবেটো সুকিয়া উমিচাঁদ গোবিন্দরাম মিত্র হুজুরিমল শোভারাম বসাক এবং বড় বড় সাহেবদের। গার্ডেনরিচ অঞ্চলেও ইংরেজদের বড় বড় বাগানবাড়ি ছিল। বেলভেডিয়ার ও আলিপুরে ক্যাপ্টেন টালি (যিনি আদিগঙ্গার নালা কেটেছিলেন এবং যাঁর নামে টালির নালা ও টালিগঞ্জ) ও ওয়ারেন হেস্টিংসের বিখ্যাত বাগানবাড়ি ছিল বেলভেডিয়ার হাউস ও হেস্টিংস হাউস। ক্লাইভের বাগানবাড়ি ছিল দমদমে, টেলরের গার্ডেনরিচে, কর্নেল ওয়াটসনের ওয়াটগঞ্জে। ওয়াটসনের নাম থেকেই ওয়াটগঞ্জ। বেলগাছিয়ায় অকল্যাণ্ডের বিখ্যাত বাগানবাড়ি ছিল পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে নেন এবং তার পরে ঠাকুররা পাইকপাড়ার রাজাদের বেচে দেন। 'বেলগাছিয়া ভিলা' এখনও পাইকপাড়ার রাজাদেরই আছে। দক্ষিণের রসা-পাগলা বাঁশদ্রোনী টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলেও সাহেবদের ও এদেশী বড়লোকদের বড় বড় বাগানবাড়ি ছিল। বাগানবাড়িগুলি দেখতে রাজবাড়ির মতো হলেও সামন্তযুগের পরিবেশকে বিশেষ বিকৃত করেনি। কলকাতার পুরনো শহরতলি অঞ্চলে গ্রাম্য নিসর্গেরই প্রাধান্য ছিল এবং গ্রাম্য লোকের বাস ছিল। তাদের কুঁড়েঘর বাগান পুকুর চাষের ক্ষেত ধানজমি আর মধ্যে মধ্যে অবস্থাপন্ন গ্রাম্য মধ্যবিত্তদের একতলা-দোতলা পাকাবাড়ি। এই সমস্ত **sacked** ও **invaded** গ্রামের অধিবাসীরা তখনও জানত না যে শহরের ধনিক ও মধ্যবিত্ত বা বিবেকহীন ল্যাণ্ডস্পেকুলেটাররা ধীরে ধীরে তাদের গ্রামগুলি গ্রাস ক'রে ফেলবে, ময়াল সাপের মতো শহর তার দানবীয় বাহু বিস্তার ক'রে এগিয়ে আসবে তাদের দিকে। তাই এসেছিল। উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতার পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের এইসব পুরনো শহরতলির অনেকটা অংশ কলকাতার সীমানাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

নতুন শহরতলির (new suburbia) বিকাশ হয়েছে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে। পুরনো শহরতলির সীমানা ভেদ ক'রে পতিতজমি আবাদীজমি ধানক্ষেত জলাজমি ডোবা পুষ্করিণী জঙ্গল বাগান ইত্যাদির উপর শহরের প্রবল জনজোয়ারের ঢেউ ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। হিংস্র হাঙ্গরের মতো একশ্রেণীর জমির স্পেকুলেটাররা শতগুণ হাজারগুণ মুনাফা ক'রে new suburbia-র বৃদ্ধি ও বিস্তারের পথ পরিষ্কার করেছেন। পুরনো শহরতলির মতো নতুন শহবতলিতেও জমিব মুনাফাখোরদেব শিকাব হয়েছে গ্রামের অসহায় চাষীরা। তবে পুরনো শহবতলি যেমন বসতিগ্রাম আক্রমণ ক'রে, লুণ্ঠন ক'রে খোলস পালটে শহর হয়েছে, নতুন শহবতলি তা হয়নি। নতুন শহরতলির ভিত গড়ে উঠেছে 'waste land' বা পতিত জমির উপর যদিও তার মালিক বেশিব ভাগ গ্রামের মধ্যবিত্ত চাষীরা। প্রধানত কলকাতার দক্ষিণ ও পুবদিক হল নতুন শহরতলির বিস্তারের ক্ষেত্র। কলকাতা শহর এইভাবে মেট্রোপলিসের স্তর থেকে কখন যে মেগালোপলিসের স্তরে এগিয়ে গিয়েছে তা বোঝা যায়নি।

এরমধ্যে কলকাতার নিজস্ব রূপের এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে বর্তমান যুগের তরুণ ও যুবকরা যদি মাত্র তিরিশ বছর আগের কলকাতা শহর সম্বন্ধেও কোনো ধারণা করতে চায় তাহলে পুবনো ফিল্ম বা ফটোগ্রাফ দেখে তা করতে হবে। রাতারাতি যেন কলকাতা রূপকথার অতিকায় দানবের মতো রূপধারণ করেছে। 'Bigness and power' এবং 'Shapeless giantism'—অতিকায়ত্ব ও শক্তির ঔদ্ধত্য আর কিম্াকার স্থূলত্ব ও জড়পিণ্ডত্ব হল মেগালোপলিসের প্রধান বিশেষত্ব। কলকাতার আফিস-ইনষ্টিটিউশন সরকারী কোয়ার্টার মাল্‌টিস্টোরীড ফ্ল্যাটবাড়ি ও অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস সবই এখন আকাশমুখী ষ্ট্রীমলাইণ্ড—ইয়াঙ্কিস্থাপত্যের নির্বুদ্ধি নিদর্শন। শহরের সর্বস্থানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে standardisation-এর সীলমোহর, এমন কি সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার ছাপ সুস্পষ্ট *। আকার বিরাট কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। সুন্দরশালপ্রাংশু সুপুরুষ কিন্তু ভিতরে মন নেই। সুন্দর ছিম্‌ছাম ষোলতলা বাড়ি কিন্তু ভিতরে জীবনের স্পন্দন নেই। সুন্দর প্রচ্ছদসহ বিশালকায় দেড়হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস, বর্তমান কলকাতার কথাসাহিত্যের নিদর্শন, কিন্তু ভিতরে শাঁস নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার ঠিকাদারদের দেওয়া অনেক ডিগ্রী অনেক অক্ষরে গ্রথিত কিন্তু আসলে প্রায় গণ্ডমূর্খসমান। মেগালোপলিটন কলকাতায় ইটপাথরের দেহই হোক আর রক্তমাংসের দেহই

* 'Standardization largely in pecuniary terms, of the cultural products themselves in art literature, architecture, and language···bigness takes the place of form : voluminousness takes the place of significance.' (Mumford : op.cit)

হোক তার স্থূলতা ও যান্ত্রিক শক্তির ঔদ্ধত্যের প্রকাশটাই বড়—voluminous কিন্তু significance নেই—অর্থাৎ সব আছে শুধু মনটা নেই আর সারবস্তুটুকু নেই।

মেগালোপলিস কলকাতা অজ্ঞাতে ও অতর্কিতে কখন যে গেডেসের প্যারাসিটোপলিস-প্যাথলোপলিস-এর স্তরে (মামফোর্ডের 'টিরানোপলিস') উন্নীত হয়েছে তাও আমরা বুঝতে পারিনি। নেক্রোপলিসের (মৃতের শহর) পূর্বস্তরে কলকাতা শহর বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমানের টিরানোপলিস কলকাতার জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসকরা তাঁদের কাজকর্মে সামান্য শালীনতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন না। যত রকমের নোংরামি অসাধুতা ও অন্যায় আজ সরকারী ও বাণিজ্যিক জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। জীবন থেকে ন্যায়বোধ নীতিবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নগর-কর্তাদের নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বলে কিছু নেই। দল হোক ব্যক্তি হোক সকলেরই কাম্য ও লক্ষ্য হল 'ওলটপালট করে দাও লুটেপুটে খাই'। যাঁরা উৎপাদন করেন আর যাঁরা ভোগ করেন সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। শহরের রাজপথ থেকে অলিগলি পর্যন্ত সর্বত্র লুচ্চাগুণ্ডাঅপগণ্ডরা ডাস্টবিনের মাছির মতো ভন্-ভন্ করছে কারণ তারা যেমন মুনাফাখোর সমাজের সৃষ্টি তেমনি আবার মুনাফাখোর শোষকদের পোষ্য বয়স্য। গণতন্ত্রের যুগে লুম্পেনরাও পূর্ণাঙ্গ নাগরিক, দাবিদাওয়া তারাও দৃপ্তকণ্ঠে জানায়, mass-গণতন্ত্রের গড্ডলপ্রবাহে তারাও তাদের অধিকারের স্লোগান দিতে দিতে চলে। দলবদ্ধ লুঠতরাজ দলবদ্ধ রাহাজানি গুণ্ডামি হল মেট্রোপলিটন শহরের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক এমনকি সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম উপসর্গ। এরকম নাগরিক সমাজে 'respectable' লোকরা criminal-এর মতো আচরণ করতে কুণ্ঠিত হন না এবং criminal-দেরও 'respectable' হবার পথ চারিদিকে খোলা থাকে।

মেট্রোপলিটন শহর তার সমস্ত অস্বাভাবিকতার উপসর্গ নিয়ে দুরন্ত গতিতে চারিদিকের গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। সেইটাই হল সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ। গ্রামের আত্মরক্ষার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে তাকেও নিজের মতো নির্বিবেক ও নির্মানুষ করতে চায় মেট্রোপলিটন শহর। করার পথে কোনো বাধা নেই। অটোমোটিভ যুগে রিবনরোড রবিরশ্মির মতো শহর থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে—রেলরোড নয়, মোটররোড—শহরের ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের বিষাক্ত বীজাণুর বাহক। পথের দৃশ্য একরকম, যেন মেট্রোপলিসের একএকটা বিচ্ছিন্ন টুকরো। সেই ঘিঞ্জি বাজার সিনেমা লাউড-স্পিকার, রাস্তার ধারে ধারে সমাজকর্তাদের পোষ্য লুম্পেন ও সমাজবিরোধীদের চক্র আর বিষফোড়ার মতো সারিবদ্ধ সব ব্লক-বাড়ি, টেকনলজিক্যাল যুগের

নয়াবস্তি। শিরাউপশিরার মতো এইসব রিবনরোডের উপর দিয়ে শহর থেকে গ্রামে নাগরিক ব্যাধির বীজাণু ছড়িয়ে পড়ছে হাইস্পীড অটোর গতিতে। সেই একটানা একঘেয়ে জীবন, বিকৃত বেহাগে ক্লান্তিকর জীবনের বিষণ্ণতার প্রলাপ, সেই সেলুলয়েডি স্বর এবং কণ্ঠের ও যন্ত্রের মিলিত ক্যানেস্তারার আওয়াজ। এইভাবে মেট্রোপলিটন শহরের জীবনের ধূসরতা গ্রাম্যজীবনের শ্যামলতাকে গ্রাস ক'রে ফেলতে থাকে। শহরের মন গ্রামের মানুষের মধ্যেও বাসা বাঁধে। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত নির্মেঘ জীবনের খররৌদ্রে তৃণের মতো মন দগ্ধ হয়ে যায়। গ্রাম ও শহরের চিরকালের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন ক'রে মেট্রোপলিটন শহরের মানসিক শূন্যতা সমস্ত মনুষ্যলোককে যেন গ্রাস করতে উদ্যত হয়। মনে হয় মেট্রোপলিটন শহর থেকে মরুভূমি দূরে নয়। মনে হয়

এখান থেকে মরুভূমি দূরে নয় সাহারায়
মরুভূমি তোমার আমার চারিদিকে
মরুভূমি তোমার পাশে চলন্ত ট্রেনের ভীড়ে
মরভূমি মহানগরে
মরুভূমি মনে
মরুভূমি দূরে নয় সাহারায়।

অ্যালবিয়র কামুর 'Outsider' মেট্রোপলিটন শহরের বিষবৃক্ষের ফল। অ্যালজিরিয়ান নায়কের মন একালের মুনাফাখোরের মেট্রোপলিটন শহরের মানুষের মন। মা মারা গিয়েছেন, অফিসের কাজ থেকে নায়ক ছুটি নিতে এসেছেন। বস্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা কবে মারা গেছেন?' নায়ক উত্তর দিলেন: 'Mother died today. Or may be yesterday. I can't be sure.' উত্তরের মধ্যে নির্মম ঔদাস্যের স্বর—'মা আজ মারা গেছেন। গতকালও হতে পারে। ঠিক বলতে পারি না।' প্রাত্যহিক জীবনের প্রেমিকা তাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' 'I replied, much as before, that her question meant nothing or next to nothing, but I supposed I didn't.' 'মেয়েটি যখন বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল আমি তাকে ভালবাসি কিনা, তখন আগের মতোই আমি তাকে বললাম যে তার এই প্রশ্ন আমার কাছে একেবারে অর্থহীন, তবু প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, আমার মনে হয় আমি ভালবাসি না।' মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে যেমন, দিনসঙ্গিনীর প্রেমের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি, নায়ক নির্মম উদাসীন। কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না। মনটা সাদা কাগজের একটা রীল, কোনো কিছুরই ছাপ পড়ে না সেখানে। খুনের জন্ম নায়কের প্রাণদণ্ড হল। গম্ভীরকণ্ঠে প্রসিকিউটার জুরীদের সম্বোধন ক'রে বললেন, 'আপনারা শুধু এইটুকু

ভেবে দেখুন, এই লোকটি তার মায়ের অন্ত্যেষ্টির পর সেইদিনই 'সুইমিং-পুলে' যায়, একটি মেয়ের সঙ্গে স্ফূর্তি ক'রে বেড়ায় এবং কমিক ফিল্ম দেখে। এর বেশি আর কিছু আপনাদের বলতে চাই না।' অর্থাৎ প্রসিকিউটার বলতে চান যে মায়ের অন্ত্যেষ্টির দিনেও যে-ব্যক্তি এরকম চিত্তবিনোদনে কালযাপন করতে পারে তার আর যাই থাক হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই এবং মন বলে কিছু নেই। খুন করা তার পক্ষে কিছুই নয়।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী নির্জন সেলে অপেক্ষা করছে। পুরোহিত এসে তাকে ধর্মবাক্য শোনাতে লাগল, মৃত্যুর আগে অনুশোচনায় সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলল। পুরোহিতের ধর্মের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে নায়কের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। হাতের মুঠোয় সজোরে পুরোহিতের কলার ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল: 'থামুন, চুপ করুন। ওসব অনেক শুনেছি। আমার কাছে কোনো জিনিসের কোনো মূল্য ছিল না কোনোদিন। কেন ছিল না তাও জানি। শুনুন—আমার ভবিষ্যতের অন্ধকার দিগন্ত থেকে সবসময় একটা বাতাস মৃদু অথচ স্থির গতিতে আমার দিকে বয়ে এসেছে। আসার পথে ঐ বাতাসের গতিতে জীবনের ধ্যানধারণা স্বপ্ন আশা কল্পনা সমস্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশে গেছে। আমার প্রাণদণ্ড হয়েছে তাতে কি? সকলকেই তো একদিন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। বিচারকের এই দণ্ড থেকে কারো মুক্তি নেই। আপনি যে একজন ধর্মের যাজক, পুণ্যের বাহক, ঈশ্বরের দূত, আপনারও মুক্তি নেই। তাহলে আপনার সঙ্গে আমার তফাত কি? আপনি পুণ্যবান বলে একদিন আপনার প্রাণদণ্ড হবে অর্থাৎ আপনারও মৃত্যু হবে। আর আমি! আমি মার মৃত্যুতে কাঁদিনি, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে সুইমিং-পুলে সাঁতার কেটেছি আর মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেছি আর কমিক ফিল্ম দেখেছি এই তো? কাজেই আমার মতো নিষ্ঠুর আর কেউ নেই এবং খুন করা আমার কাছে হাতমুখ ধোয়ার মতো। বিচারক রায় দিয়েছেন আজকেই আমার প্রাণদণ্ড হবে। খুব ভাল কথা। আপনারও একদিন হবে এবং দুয়ের মধ্যে তফাত কোথায় আমি তো জানি না।']

[অনুশোচনা Outsider-এর জন্য নয়। যেমন Meursault তেমনি হেমিংওয়ের 'Soldier's Home' গল্পের নায়ক Krebs—দুজনের একই নির্বিকার মেট্রোপলিটন মন। মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন—

'Don't you love your mother, dear boy?'

'No,' said Krebs.

His mother looked at him across the table. Her eyes were shiny. She started crying.

'I don't love anybody,' Krebs said.

এরপর Krebs-এর মা যখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন 'আমি তোর মা, ছেলেবেলায় কোলে ক'রে বুকে ক'রে তোকে মানুষ করেছি আর তুই এই কথা বললি ?' তখন '**Krebs felt sick and vaguely nauseated.**'

কলকাতা শহরে চৌরঙ্গি ও রেডরোড দিয়ে সেদিন যাঁরা যান্ত্রিক অটো-স্রোতে ভেসে চলেছিলেন, করোনারি স্ট্রোকের যন্ত্রণায় কাতর ৪৪ বছরের ফিল্ড-সার্ভেয়ারের দিকে না চেয়ে, তাঁরা এই ধনতান্ত্রিক মেট্রোপলিটন শহরের '**Outsider**' এবং **Meursault** ও **Krebs**-এর সগোত্র। তাদের দিকে চেয়ে মনে হয়—

> যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
> নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে.
> প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজেব আত্মবোধৌর দ্বপের মতো
> কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে। —জীবনানন্দ দাশ

মেট্রোপলিটন শহরে বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল পথে জীবনের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং বিরাট এক অবক্ষয়ের মানবসাগরের দিকে প্রত্যেকটি মানুষ অটোর গতিতে ছুটে চলতে থাকে। মনে হয় এই মুনাফাখোরের মেট্রোপলিটন মহানগরে অ্যালিসের মতো Down, down, down. **Would the fall *never* come to an end ?**

মহামৃত্যুর পথে মহানগর

মহানগর থেকে অনেক দূরে লোকালয়ের বাইরে কোনো তন্ত্রপীঠের নির্জন গ্রাম্য শ্মশানে অমাবস্যার অন্ধকারে চলতে চলতে যখন একটার-পর-একটা শুকনো মাথার খুলি পায়ে ঠোক্কর লেগে গড়িয়ে যায়, তখন একনিমেষে চোখের সামনে হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকে পৃথিবীর হাজার হাজার সব জ্যান্ত মহার্ঘ্য মাথা ঝকমক ক'রে ওঠে। সাধারণ মানুষের ঘিলুশুষ্ক মাথা নয়, সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো বড় বড় সব ভারিক্কী মাথা, যার ভিতরে অফুরন্ত বুদ্ধির গলন্ত ঘিলু অহরহ টগবগ করছে। আন্দামানের আদিম মানুষের মতো অবাক হয়ে ভাবি তখন চন্দ্রলোক অভিযানের পেছনে বৈজ্ঞানিক মাথাগুলোর কথা, পারমাণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণে নিমজ্জিত সব মাথা, যুদ্ধ হত্যা ও সর্বাত্মক নাশকর্মে নিযুক্ত সব মাথা এবং অজস্র মাথা শুষে-শুষে ঝুনো নারকেলে পরিণত করছে যে বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্র ও অর্থযন্ত্র তার কর্ণধারদের মহামূল্যবান সব মাথা। বাস্তবিক মানুষের মাথার কি বাহাদুরি! ওরাং গরিলা শিম্পাঞ্জিদের বিপুল দেহের তুলনায় মাথা কত ক্ষুদ্র, ঘিলু কত কম! এমন কি হাতি গণ্ডারেরও! কিন্তু দ্বিপদ স্তন্যপায়ী জীব মানুষের মাথা কত বড় এবং ঘিলু কত বেশি। মাথাই মানুষের সব। সবার উপরে মাথা, তার পর মানুষ।

মানুষ বীর তাই তার মাথা উন্নত। মানুষ উট নয়, মানুষ গরিলা নয়, মানুষ গণ্ডার নয়। গরিলা গণ্ডার অজগর উট প্রভৃতি সমস্ত জন্তুর দোষগুণ মিলিয়ে-মিশিয়ে মানুষ। বিশেষ ক'রে বড় বড় মাথাওয়ালা মানুষ। তাই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। উট চলে মরুভূমিতে, মানুষ চলে বড় বড় শহরের রাজপথে, সরীসৃপ চলে জঙ্গলে, মানুষ চলে জেট-বিমানে। বনের হিংস্র বাঘ 'ম্যানইটার', মহানগরের সুসভ্য মানুষ 'ম্যান-কিলার'।

যে-কোনো হিংস্র জীবের দংশনের পদ্ধতি একরকম, যেমন নখ বা দাঁত দিয়ে আঁচড় বা ছোবল, কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের দংশন ও আক্রমণের বৈচিত্র্য অনন্ত। জন্তুর আঁচড় বা ছোবল দিয়ে যুগপৎ একাধিক জীবকে আঘাত বা হত্যা করা যায় না, কিন্তু মানুষ ন্যাপলাম ও হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে নগরের পর নগর ধ্বংস করতে এবং হাজার হাজার মানুষকে স্বচ্ছন্দে হত্যা করতে পারে। তাছাড়া নৃশংস হত্যার উদাহরণ সভ্য মানবজগৎ থেকে যত দেওয়া যায়, কোনো জীবজগৎ থেকে তার সহস্রাংশের একাংশও দেওয়া যায় না। তার কারণ মানুষের মাথা আছে এবং সেই মাথার কানায় কানায় ভরা বুদ্ধি আছে। অন্য জন্তুর মাথা থাকলেও বুদ্ধি নেই, অন্তত মানুষের মতো বুদ্ধি নেই। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম তাই 'বুদ্ধিমান মানুষ' বা 'হোমো স্যাপীয়েন্‌স'।

বুদ্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে আজ মানুষ পোঁছেচে। বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের একটি মূল সূত্র হল—যে দৈহিক হাতিয়ারেব জোরে যে-যুগে (ভূতাত্ত্বিক যুগ) যে-জীবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে সেই হাতিয়ারের ক্রমোন্নতির ফলে সেই অত্যুন্নত হাতিয়ারই হয় তার ধ্বংসের কারণ। এইভাবেই জীবজগতে 'ইভল্যুশন' বা ক্রমাভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। বর্তমান ভূতাত্ত্বিক যুগ স্তন্যপায়ী জীবেব যুগ এবং সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'মানুষ'। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় সহায় হয়েছে 'বুদ্ধি'। নখ ও দাঁতের মতো বুদ্ধিও দৈহিক হাতিয়ার বিশেষ (কর্পোরিয়াল টুল) কাবণ দেহহীন বুদ্ধি বলে কিছু নেই। দৈহিক ক্রমবিকাশের উন্নত স্তরেই মস্তিষ্কের বিকাশের ফলে মানুষের মধ্যে বুদ্ধির আশ্চর্য প্রকাশ হয়েছে। সেই বুদ্ধির অনুশীলন ও ক্রমিক বিকাশের ফলে মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর দেহাবদ্ধ হাতিয়ারের দৃঢ়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, দেহাতিরিক্ত পাথুরে হাতিয়ার থেকে আধুনিক নানাবকমের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক হাতিয়ার (নন্‌-কর্পোরিয়াল টুল) তৈরি করতে শিখেছে। আজ মানুষের বুদ্ধির এমন চরম বিকাশ হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তির সূত্রানুসারে সেই বুদ্ধিই বর্তমানে সর্বগ্রাসী সংহারমূর্তিতে সর্বত্র মানুষের সম্মুখীন।

অর্থাৎ মানবজাতির অবলুপ্তির অনিবার্যতা আজকের জাগতিক পরিবেশে এত সুপরিস্ফুট যে মানুষের বুদ্ধি যদি দুর্বুদ্ধির বাঁকাপথ ছেড়ে এখনও সহজ সরল পথে চলতে না পারে, তাহলে মানুষের এই শখের সমাজ ও শৌখিন সভ্যতা, এমন কি মানুষের অস্তিত্ব পর্যন্ত, এক ব্যাপক ধ্বংসলীলায় মহাপ্রলয়ের মধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্বুদ্ধির বাঁকাপথেই আজ মানব-বুদ্ধির দুরন্ত দুর্বার অভিযান অব্যাহত। এই অভিযানের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত চন্দ্রলোকে অভিযান। মনে হয় যেন মানুষের আর কোনো সমাধানযোগ্য সমস্যা নেই এবং প্রকৃত রহস্য কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটন করেই যেন বিজ্ঞানের প্রকৃতিজয়ের

সমস্ত সাধনাও শেষ হয়ে গেছে। যেন পরাজিত প্রকৃতির সামনে বিজয়ী মানুষ সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে, তার আর কিছু করার নেই। বাস্তবিক আর কি-ই বা করার আছে! পরমাণু বিদীর্ণ ক'রে তার ভিতরের মূলশক্তি আয়ত্ত করা হয়ে গেছে, স্পেসক্রাফ্‌ট তৈরি ক'রে ঘণ্টায় চব্বিশ হাজার মাইল বেগে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মাইল দূরে চন্দ্রলোকে পৌছনো ও পদার্পণ করাও সম্ভব হয়েছে। এমন সব বোমা তৈরি করা সহজসাধ্য হয়েছে যা দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে, তার বহুকালের কীর্তিচিহ্নসহ, নিমেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা যায়। অ্যাটমবোমা নয় শুধু, রাসায়নিক ও বিষাক্ত বীজাণুর বোমা পর্যন্ত স্তূপাকার মজুত রয়েছে। এছাড়া ভোগবিলাসের সামগ্রীর এত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য আজ সৃষ্টি করা হয়েছে যে পৃথিবীর অন্তত শতকরা দশজন মানুষ আজ রাজার মতো বিলাসিতা করতে না পারলেও অন্তত ছোটখাটো সামন্তের মতো বেশ আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে। অতএব করার আর কিছুই নেই, বিজ্ঞান ও টেকনলজির সাহায্যে সবই করা হয়ে গেছে। অবশ্য পৃথিবীর অন্তত শতকরা ৭৫ জন লোক আজও বেঁচে থাকার মতো খাদ্য পায় না, অনেকটা জানোয়ারের মতো জীবন-ধারণ করে, সমাজে চলার মতো সামান্য শিক্ষা পায় না, রোগব্যাধির চিকিৎসা ভূতুড়ে-হাতুড়েদের দিয়েই করায়, বল্কল ছাড়লেও অর্ধাবৃত অবস্থায় দেহরক্ষা করে এবং মাথাগোঁজার আশ্রয় খুঁজে পায় না। কিন্তু তাতে কি? টেকনলজি ও বিজ্ঞানের মহিমা তাতে ম্লান হয় না।

তবু আজও যখন ভূমিকম্পে নগরের পর নগর ধ্বংস হয়ে যায়, হাজার হাজার প্রাসাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায় শিশুর মতো (শ্রেষ্ঠ নভোচর ও অ্যাটমিক বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত) আর্তনাদ করতে থাকে এবং পৃথিবীব শতকোটি ভগবানের নাম ক'রে বাঁচতে চায়, তখন বৈজ্ঞানিক কম্পনযন্ত্রে ভূমিকম্পের এপিসেন্টার কোথায় বা কতদূরে তা জানা গেলেও, পৃথিবী যে কাঁপছে বা টলছে তা থামানো যায় না। নিউক্লিয়ার-বোমা ও স্পেসক্রাফ্‌ট-এর ল্যাবরেটরিও তখন কাঁপতে থাকে, বড় বড় চেয়ারে বসে বিজ্ঞানীরা কাঁপতে থাকেন, বিশাল বিশাল প্রাসাদের বাসিন্দারা কাঁপতে থাকেন, রাজার সিংহাসন এবং ডিক্‌টেটরদের পায়ের তলাও কাঁপতে থাকে। তবু তো প্রকৃতি অনেক উদার, এক-দুই মিনিটের বেশি কাঁপে না। যদি কাঁপত—তাহলে! তাহলে যাইহোক না কেন, বিজ্ঞান বা টেকনলজির মর্মান্তিক পরাজয় হতো। কিন্তু ভূকম্পনের কথা থাক, কয়েকটা খুব সাধারণ সমস্যার কথা বলি।

ঝড় বা বৃষ্টি কোনোটাই আজও বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসেনি। বৃষ্টি হবে কি হবে না, ঝড় হবে কি হবে না, অথবা হলে কত মাইল বেগে হল, তা অবশ্য হাওয়াবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। বিজ্ঞানের এই পর্যন্ত কৃতিত্ব। তাতে

মানুষের অনেক উপকার হলেও প্রকৃত উপকার কি হয়েছে তা ভাববার বিষয়। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আজও পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কাতর দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে কেন এবং আদিম মানুষের মতো হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিকের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করে কেন? বৈজ্ঞানিকরা রকেট নিক্ষেপ ক'রে বৃষ্টিপাত অথবা বৃষ্টির মতো জল-সরবরাহ কেন করতে পারেন না? প্রচণ্ড বেগে ঝড় যখন হয়, তখন ঝড়ের বেগ ও গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কত বিপদ থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু আজও তা করা সম্ভব হয়নি কেন? বায়ুসংঘর্ষে মেঘনিঃসৃত বিদ্যুতের মধ্যে কত কোটি কোটি ওআট বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং তার অপচয় হয়। সামান্য কয়েকটি বিদ্যুৎ ধরে ফেলতে পারলে পৃথিবীর প্রত্যেক গ্রাম বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল ক'রে উঠতে পারে এবং অন্ধকারের মানুষ আলোর স্পর্শে নতুন জীবন পেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির বিনামূল্যের বিদ্যুৎকে বন্দী ক'রে আজও ইলেকট্রনিক যুগে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে আলো বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ, এবং তার অর্ধেক স্থানে এত অত্যধিক ঠাণ্ডা বা উত্তাপ যে তাতে আবাদ ক'রে ফসল ফলানো যায় না। যখন বিজ্ঞান ও টেকনলজির এত কীর্তি চতুর্দিকে বিঘোষিত হচ্ছে, তখন পৃথিবীর এই অর্ধেক জায়গাতে ভালো ফসল ফলাতে পারলে আজকের বাড়ন্ত মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা করা হয়নি কেন? এবং তা না ক'রে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ পরিদর্শনের জন্য এই বিপুল অর্থের অপচয় করা হচ্ছে কেন? চন্দ্রে অবতরণ ক'রে মহাবীর নভোচররা পৃথিবীতে ফিরে এলে কি পৃথিবীর একজন অভুক্ত মানুষ খেতে পাবে, একটিও নিশুতি রাতের মতো অন্ধকার গ্রামে আলো জ্বলবে, অসংখ্য অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে একজন মানুষও কি শিক্ষা পাবে? তা পাবে না, শুধু যান্ত্রিক মানুষ চন্দ্রলোক থেকে ফিরে এলে যন্ত্রদানবরা বাহবা দেবে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ যারা তারা হাসবে।

বিজ্ঞানাচার্য চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন তাই চন্দ্রলোক অভিযানের এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে হাস্যকর পাগলামির চূড়ান্ত নিদর্শন বলে অত্যন্ত দুর্মর ভাষায় সমালোচনা করেছেন (মাদ্রাজ ইন্স্টিটিউট অব টেকনলজিতে সমাবর্তন ভাষণ, । রমন বলেছেন :

"It is nothing but sheer raving lunacy to spend millions of dollars to shoot men into space and make them walk there. I simply smile with loathing and contempt at this lunacy on the part of mankind."

বিখ্যাত কস্‌মোলোজিস্ট অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল বোম্বাইতে 'টাটা ইন্স্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ' পরিদর্শনকালে চন্দ্রলোকযাত্রা সম্বন্ধে 'criminal

waste of money and a useless kind of activity' বলে মন্তব্য করেছেন। রমন বলেছেন যে চন্দ্রলোকে কি আছে না-আছে তা দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করা গোলামের চেয়েও অধম একদল বৈজ্ঞানিকের বাগাড়ম্বর ও বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। অবিমিশ্র অবজ্ঞা ও ঘৃণায়, রমন বলেছেন, তাঁর সমগ্র সত্তা পর্যন্ত শিউরে ওঠে যখন তিনি শাসকশ্রেণীর কেনাগোলাম এই বৈজ্ঞানিকদের কথা চিন্তা করেন। বিগত ষাট বছরের মধ্যে, রমনের মতে, অগ্রগতির নামে বিজ্ঞানের এরকম দুর্গতি ও দুশমনমূর্তি আর কোনোকালে দেখা যায়নি।

রমনের বক্তব্যের সঙ্গে পৃথিবীর আরও অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক একমত। যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারদের কাছে নিজেদের মগজ ও বিবেক লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে দেননি, এরকম স্বাধীনচেতা বৈজ্ঞানিক এখনও বিভিন্ন দেশে যাঁরা আছেন, তাঁরা রমনের উক্তি বর্ণে বর্ণে সমর্থন করেন। চন্দ্রলোকে এক-একটি অভিযানের জন্য যে কোটি কোটি ডলার ও রুবল ব্যয় হয়, তা দিয়ে শত শত গ্রামকে মহানগরে রূপায়িত করা যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ অভুক্ত মানুষকে দিনের পর দিন খাওয়ানো যেতে পারে, শতাধিক হাসপাতাল তৈরি ক'রে লক্ষাধিক পীড়িত মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এবং আমেরিকার নিজের দেশেরই লক্ষ লক্ষ অমানুষ ও আধামানুষদের পরিপূর্ণ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা না ক'রে চাঁদে যাবার চেষ্টা হল ধনতান্ত্রিক সমাজের জীর্ণ কাঠামোকে অফুরন্ত অপব্যয়ের ভিতর দিয়ে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। দুঃখ হয় যখন দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নও আমেরিকার সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক বালচাপল্য ও পাগলামির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে কোটি কোটি রুবল অপব্যয় করছে। প্রতিরক্ষার খাতিরে না হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রের পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরির যৌক্তিকতা ভাবা যায়, কিন্তু চন্দ্রমুখী অ্যাপোলো-স্পুটনিক-লুনিকের প্রতিযোগিতার কথা বাস্তবিক ভাবা যায় না।

বিজ্ঞানের কীর্তি অনেক, রীতিমতো তাজ্জবও যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আজও যখন আন্দামানী ও অন্যান্য আদিম জনগোষ্ঠীর মতো ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ভূকম্পন প্রভৃতি অনাদিকালের প্রাকৃতিক লীলা মানবশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে মনে হয়, এবং আদিম দেবতা ও আদিম ম্যাজিকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অ্যাটমিক বৈজ্ঞানিকেরও গত্যন্তর থাকে না, তখন কি একথা বলা যায় যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর সমস্ত কীর্তি ও কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে? তা বলা যায় না।

যদি সমাজ ও সভ্যতার কথাই বলা যায়, তাহলে আজ প্রায় অনিবার্য আত্ম-বিলোপের অতল অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অন্তত শতকরা নব্বই জন

মানুষ প্রশ্ন করতে পারে, আহা ! সভ্যতার কী অপরূপ মূর্তিই না এতকাল ধরে গড়ে তোলা হয়েছে ! কোনো অপরূপ সুন্দরী রমণীর সর্বাঙ্গে যদি বীভৎস দগ্-দগে ঘা থাকে তাহলে তার রূপদর্শনে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়, মানুষের এই কয়েক হাজার বছরের সমাজ ও সভ্যতার দিকে চেয়ে দেখলেও তাছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। ধনতন্ত্রের 'অ্যাফ্লুয়েণ্ট' সমাজ এবং সমাজতন্ত্রের সর্বার্থসাধক সমাজ, কোনো সমাজেই সত্যিকার 'মানবিক' পরিবেশ রচিত হয়নি। 'মানবিক' পরিবেশ বলতে এমন পরিবেশের কথা বলছি, যার মধ্যে মানুষ মুক্ত আলোবাতাসের আস্বাদ পেতে পারে, বুকভরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, জাতি-ভাষা-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি বহুকালের ব্রহ্মদৈত্যদের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে, নিজের কথা ও বক্তব্য সকলের কাছে নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে বলতে পারে, ইচ্ছামতো শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করতে পারে, খাওয়া-পরা-বসবাসের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সমগ্র সমাজটাকে একটা বৃহৎ পরিবার মনে ক'রে নিজের মেহনত ও বুদ্ধি সকলের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করতে পারে। এই 'মানবিক' পরিবেশ কোথাও রচনা করা সম্ভব হয়নি। টেকনক্রাসি ও ব্যুরোক্রাসির অখণ্ড প্রতিপত্তি দুই সমাজেই। এই যন্ত্রতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের নিষ্পেষণে 'অ্যাফ্লুয়েণ্ট' ধনতান্ত্রিক সমাজ ক্রমেই যেমন একটি বিশাল পাগলা গারদে পরিণত হচ্ছে, 'সর্বার্থসাধক' সমাজতান্ত্রিক সমাজও তেমনি পরিণত হচ্ছে বিশাল জেলখানায়। দুই গারদের মধ্যেই মানুষ হাঁফাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার মতো একটু নির্মল বায়ুসেবনের সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও।

প্যাকার্ডের 'ওয়েস্ট মেকার্স' অথবা হোয়াইটের 'অর্গানাইজেশন ম্যান' সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করেও আমেরিকার ধনতান্ত্রিক ভূরিসমাজের (অ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটি) বাহ্য জৌলুষের অন্তরালবর্তী বিকট বাস্তব রূপটি সহজেই উদ্ঘাটন করা যায়। টুকরো চলচ্চিত্রের মতো আমেরিকান সমাজ-জীবনের সামান্য কিছু তথ্যের আলোকসম্পাতে সেই রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। অন্য কারও নয়, প্রেসিডেণ্ট জনসনের নিজের হিসেব মতোই দেখা যায়, আজও আমেরিকায় কমপক্ষে ৪০ লক্ষ বালক-বালিকা প্রতিদিন প্রায় অনাহারে স্কুলে যায়, ১৮ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা অন্তত ১০ জনকে গর্হিত অপরাধের জন্য আদালতে যেতে হয়, প্রত্যেক বছর স্কুলের লেখাপড়া ছাড়তে হয় অন্তত ১০ লক্ষ ছাত্রকে, এবং আরও ১০ লক্ষ ছাত্র মস্তিষ্কের ব্যাধি ও মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়। শিশু ও টীন-এজারদের জীবনের এই ছবি সম্পূর্ণ ছবির একটি অংশ মাত্র। নিউইয়র্ক শহরে প্রতিদিন গড়ে ১৪৯ জন লুণ্ঠিত, ৭৮ জন আক্রান্ত, ৫ জন নারী ধর্ষিত এবং ৩ জন নিহত হয়। এছাড়া ৪৭৫টি চুরি-ডাকাতি হয় প্রতিদিন। আমেরিকার বড় বড় দশটি মহানগরের মধ্যে

(যেমন হাউস্টন, টেক্সাস, ব্যাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, শিকাগো প্রভৃতি) নিউইয়র্কেই নাকি দৈনিক খুনের সংখ্যা (তিনটি) সবচেয়ে কম। সমস্ত শহরে বাৎসরিক শুধু খুনের হিসেব করলে লক্ষের অঙ্ক ছাড়িয়ে যায়, নারীধর্ষণ লুণ্ঠন ডাকাতি ইত্যাদির তো কথাই নেই। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার ধনতান্ত্রিক টেকনলজিক্যাল উন্নতির সূচনা থেকে) আজ পর্যন্ত আমেরিকায় কেবল আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যা ও খুনের সংখ্যা হল ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। এই সংখ্যা প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত আমেরিকানের চোদ্দ গুণ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহতের তিন গুণ। বর্তমানে প্রতিদিন আমেরিকায় গড়ে ৫০ জন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে নিহত ও খুন হয়, অর্থাৎ প্রতি আধঘণ্টায় একটির বেশি। এছাড়া আত্মবিস্মৃতির জন্য নেশার বৈচিত্র্য ও বিস্তার প্রত্যহ যে কি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমেরিকায় তা বলা যায় না। অ্যাল্‌কহল তো আছেই, কতরকমের ড্রাগ ও তার সেবনভঙ্গি, এবং নেশাখোরদের কতরকমের যে চক্র ও গোষ্ঠী তার ঠিক নেই। সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকের বিকৃতি-বৈচিত্র্যের সামান্য আভাস দিতে গেলেও প্রায় একটি আধটন ওজনের রিপোর্ট রচনা করতে হয়। আপাতত তা না করেও শুধু এই কয়েকটি তথ্যের আলোকে আমেরিকার যান্ত্রিক ভূরিসমাজের যে আসল কঙ্কালটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে, তা আর যাই হোক, বিচারের কোনো মানদণ্ডেই, সুস্থ সমাজ মনে হয় না। যন্ত্র ও টেকনিক মূল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে একরঙা মানুষে পরিণত করেছে একদিকে, যে-মানুষ শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীবিরোধ পর্যন্ত ভুলে গিয়ে আজ কেবল উপভোগ ও প্রলোভনের নেশায় মশগুল, এমনকি নিজের সত্তা সম্বন্ধেও অচৈতন্য—আর অন্যদিকে ক্রমে মানুষকে করেছে খণ্ডিত বিকৃত বীভৎস উন্মার্গ ও আত্মঘাতী।

এদিকে প্রায় অর্ধশতাব্দীর সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ-পরীক্ষায় সোভিয়েট সমাজ যে-স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাতে জঠরাগ্নি ও বেকারত্বের নিবৃত্তি হলেও মানবোচিত চরিত্র ও গুণের বিকাশ হয়নি। অন্যান্য আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের মতো সোভিয়েট সমাজেও আজ যন্ত্রতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং সমাজ-তন্ত্রের পুণ্য নামে তার নীরেট নিশ্ছিদ্রতা অনেক বেশি। আত্মতুষ্ট মানুষ সেখানে যন্ত্রের মতো নির্বিকার। কেবল নির্বিকার নয়, বৈকল্য ও বিকৃতি সোভিয়েট সমাজের মানুষের মধ্যেও দেখা দিচ্ছে। অধ্যাপক জুরি টকাচেভ্‌স্কি লিখেছেন (প্রাভদা, ২৯ মার্চ ১৯৬৯) যে ১৯৬৮ সালে শুধু মস্কো শহরে যতগুলি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি সুরাপানজনিত মত্ততার জন্য, এবং যতগুলি ডিভোর্স হয়েছে তারও প্রায় অর্ধেকের (৪০ শতাংশ) কারণ একই। ব্যক্তিগত-দলগত বিরোধ ও মারামারির ফলে মস্কো শহরে যত খুন ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছে (১৯৬৮-তে), তার মধ্যে শতকরা ৮৫টি পানোন্মত্ত অবস্থায়

সংঘটিত। মস্কো শহরে যত খুন হয় তার মধ্যে শতকরা ১৮টি খুন করে সমাজ-বিরোধী লুচ্চা-গুণ্ডারা। ১৯৬৬ সালে সুপ্রীম সোভিয়েট থেকে গুণ্ডামি দমনের জন্য একটি জরুরী আইন পাস করা হয়েছিল দু'বছরের জন্য। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়নি বলে আবার ১৯৬৮ সালে সেটি বলবৎ করা হয়েছে। আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, যে-দেশে বেকার নেই, খাদ্যাভাব নেই, সেই দেশের সমাজে ও মহানগরেও আজ খুন-জখম-হত্যা ও আত্মহত্যার দৃশ্য প্রকট হয়ে উঠেছে, সমাজবিরোধী লুচ্চা-গুণ্ডাদের প্রতাপ বাড়ছে। কেন এই সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে? লেনিনের রচনাবলী আবৃত্তি ক'রে, অথবা আমেরিকার সঙ্গে চন্দ্রাভিযানের প্রতিযোগিতায় কোটি কোটি রুবল অপব্যয় ক'রে, এই 'কেন'-র উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

উত্তর পরিষ্কার। শিল্পোন্নত সমাজের আদর্শভ্রষ্ট বিজ্ঞান টেকনলজি ও ব্যুরোক্রাসি, ওয়েস্ট-মেকার, স্টেটাস-সীকার (ইকনমিক ও পলিটিক্যাল) ও অর্গানাইজেশন ম্যান—আজ ধনতান্ত্রিক নিউইয়র্ক ও সমাজতান্ত্রিক মস্কোর মধ্যে ভৌগোলিক ও আদর্শগত ব্যবধান প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাই আজ উভয়েরই অপচয়-প্রতিযোগিতা চন্দ্রলোক এবং পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহ লক্ষ্য ক'রে। যন্ত্রতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের প্রতিপত্তি উভয় সমাজেই সমান, কোথাও ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নামে, কোথাও বা সমাজতন্ত্রের নামে। তাই মানসিক প্রতিক্রিয়া দুই সমাজের মানুষের মধ্যেই এক ও অভিন্ন। তাই হওয়ার কথা, কারণ মানুষ তো মানুষ এবং মানুষের বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন নিশ্চয় ইডিওলজিক্যাল কারণে হয় না।

চাঁদের কথা বলি। দুজন লোককে চন্দ্রলোকে পদার্পণ করানোর জন্য আমেরিকার মোট খরচ হয়েছে প্রায় ২৪০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৯২০০ কোটি ভারতীয় টাকা। এই যন্ত্রবৈজ্ঞানিক ভোজবাজিতে মানুষের ও বিজ্ঞানের কি উপকার হবার সম্ভাবনা আছে? তা এখনই বলা সম্ভব নয়, বিজ্ঞানীরা বলেছেন। এখন যেটুকু ভাবা হয়েছে তা হল এই: চন্দ্রলোক থেকে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের সুবিধা হবে অনেক, কারণ সেখানে কোনো অ্যাটমসফেরিক ও আয়নসফেরিক গণ্ডগোল থাকবে না। চন্দ্রলোক একটি জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি গড়া হবে, আপাতত এই হল বৈজ্ঞানিকদের পরিকল্পনা। কিন্তু তার জন্য খরচ হবে কত? যদি কুড়িজন লোক কাজ করতে পারে এরকম একটি খুব ছোট ঘাঁটি গবেষণার জন্য তৈরি করতে হয়, তাহলে তার জন্য বাৎসরিক খরচ হবে প্রায় ১০০ কোটি ডলার, পৃথিবী থেকে জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্য বহন করার জন্য খরচ পড়বে প্রতি কিলোগ্রামে ১০ হাজার ডলার এবং 'লেবার' বা মজুরি চন্দ্রলোকে প্রতি ঘণ্টায় লাগবে এক লক্ষ ডলার। তারপর জ্যোতিষীয় গবেষণার

ফলে পৃথিবীর মানুষের কি লাভ হবে না হবে তা কিছুই বলা যায় না। তাহলে এই বিরাট অশ্বমেধযজ্ঞের কারণ কি এবং এত ঘটা ক'রে তা প্রচার করার উদ্দেশ্যই বা কি?

যদি ব্রহ্মাণ্ডের কথা ধরা যায় তাহলে চন্দ্রলোকে পৌঁছানোও নিতান্ত ছেলে-খেলা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। পূর্ণিমার রাতে নির্মেঘ আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি যে নক্ষত্র সেখানে পৌঁছতে বর্তমান অ্যাপোলোর ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে কতদিন সময় লাগবে? চন্দ্রলোকে পৌঁছতে তিন-চারদিন লাগে কিন্তু নিকটতম নক্ষত্রে পৌঁছতে? ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগেও কম ক'রে এক লক্ষ বছর লাগবে। যদি ভবিষ্যতে স্পেসক্রাফটের স্পীড আরও বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়, তাহলেও ৫০ হাজার বছরের আগে সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদ করার যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে অ্যাপোলোর চন্দ্রলোক যাত্রা মনে হয় ঠেলাগাড়িতে কলকাতা থেকে বর্ধমান যাত্রার মতো। কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদের ব্যাপারটা স্পেস-গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের বুজরুকি ছাড়া যে কিছু নয় তা বোঝা যায়। আসল রহস্য হল, সামরিক মারণাস্ত্রের গবেষণা নানারকমের রকেট-নিক্ষেপ থেকে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রলোক অভিযানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেচে। ধনতান্ত্রিক ভূরিসমাজে আজ সামরিক মারণাস্ত্র উৎপাদনই মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক গড়ন অটুট রাখার একমাত্র উপায়, তাছাড়া তার ভাঙন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অ্যাপোলো এগারো সেই প্রচেষ্টারই সার্থক নিদর্শন। যেমন অ্যাপোলো এগারো ও তার স্যাটার্ন পাঁচ রকেট তৈরির জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ যান্ত্রিক কলকব্জা লেগেছে এবং তের-চোদ্দ হাজার কোম্পানির কারখানায় এইসব কলকব্জা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে আরও নানাবিধ মারণাস্ত্র তৈরির বিপুল সংগঠনের কথা যদি ভাবা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যান্ত্রিক ভূরিসমাজে আজ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভা এবং সাধারণের অর্থ কি বিপুল পরিমাণে শুধু ধ্বংসাত্মক কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সমাজ ও মানুষের পার্থিব জীবনের কোনো উন্নতি, কোনো কল্যাণ বা বাসনা-কামনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

এই কারণেই বিজ্ঞানাচার্য রমন চন্দ্রলোক ও গ্রহান্তরে যাত্রার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত অপচেষ্টা ও পাগলামি বলে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে টয়েনবি ও লুইস মামফোর্ডও এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির কোনো প্রশংসা করতে পারেননি। টয়েনবি বলেছেন:

"In a sense, going to the moon is like building the pyramid or Louis XIV's palace at Versailles. Sizing up man's achievement, one would say how amazing, how strange, that this creature is so marvellous

in his technology, but in morals and social behaviour, he has stayed practically stationary. This makes technology a menace."

সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড বলেছেন :

"Though many now credulously believe that space travel will open up marvellous new possibilities, there are strong historical grounds for believing rather that this marks the fatal terminus of a process that has from the Pyramid Age on curbed human development. Space exploration itself is strictly a military by-product and without pressure from the Pentagon and the Kremlin it would never have found a place in any national budget.''

বমন-টয়েনবি-মামফোর্ডের মন্তব্য একসুরে বাঁধা। যাঁরা বাস্তবিকই সমাজ-চিন্তা ও মানবচিন্তায মগ্ন, তাঁরা এছাড়া অন্য কোনো অভিমত পোষণ কবতে পাবেন না। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল ৯৭ বছর বয়সে তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। তাতে মানবসমাজেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি গভীর আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে বলেছেন যে, যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়—এবং তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—তাহলে পাবমাণবিক ও বাসায়নিক মারণাস্ত্রেব ধ্বংসলীলায় সমগ্র মানবসভ্যতা ও মানবজাতির বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আপাতত সমাজ ও বাষ্ট্রের যে রূপ দেখা যাচ্ছে তাতে মহামৃত্যুব এই অবশ্যম্ভাবী পবিণতিব বাইবে তিনি কোনো আশার আলোকরেখা দেখতে পাননি।

কিন্তু যদি বিশ্বযুদ্ধ নাও হয়, এবং বিজ্ঞানের বর্তমান সমাজবিমুখ গতি ও মারণাস্ত্র উদ্ভাবনেব গবেষণা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে বর্তমান মর্ত্যলোকে মানুষেব পরমায়ু যে কতদিন তা বলা যায় না। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের প্রধান কর্মসচিব ইউ. থাণ্ট কিছুদিন আগে (জুন ১৯৬৯) ষাট পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে, বিজ্ঞানীরা কি ভাবে পৃথিবীর আলো-বাতাস-জল পর্যন্ত বিষিযে তুলছেন, সেদিকে আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাঁদের বিশ্বসম্মেলনে মিলিত হয়ে আলোচনাব জন্য অনুরোধ করেছেন। থাণ্ট বলেছেন, যান্ত্রিক শিল্পোন্নত দেশে বিপুল আবর্জনা ও অপচয়-পদার্থ (যাকে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট' বলা হয়), ডি. ডি. টি, পতঙ্গবিষ গ্যাস ধোঁয়া ধাতুমল ইত্যাদি প্রাকৃতিক আবহাওয়া এমনভাবে বিষিয়ে তুলেছে যে, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাশীল বিজ্ঞানীদের অবিলম্বে অবহিত হওয়া কর্তব্য। এই বিপুল বিষাক্ত আবর্জনা-অপচয় যেভাবে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তাতে অল্প দিনের মধ্যে প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় মানুষের বাঁচাব মতো ন্যূনতম অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে। এর সঙ্গে যদি পরীক্ষাব জন্য পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলাফলের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ যে কত ভয়াবহ ও অনিশ্চিত তা সহজেই বোঝা যায়। থাণ্ট সেই কথা স্পষ্টভাষায় বলেছেন :

"The consequences for the weather and climate of the world are uncertain, but could be catastrophic"

এই মহাবিপর্যয় ও মহামৃত্যুর পথে আজ যন্ত্র-বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য মনে হয়। বোধ হয় এই পরিণতির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। 'বোধ হয়' বলছি এইজন্য যে মানবিক যুক্তিবুদ্ধির সুস্থ-স্বাভাবিক প্রয়োগের দ্বারা অবশ্যই মানুষের এই মহামৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু যে সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ বুদ্ধিমান মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি 'বুদ্ধি'কে মানুষের সর্বাত্মক সংহারের পথে পরিচালনা করছে, শুধু মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবিলাসীর স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য, সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু পুরনো জীর্ণ কঙ্কাল পর্যন্ত না বদলাতে পারলে মানুষের মহামৃত্যুর পথে যাত্রা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

স্বনামধন্যদের সমাজ

They are celebrated because they are displayed as celebrities their very image is dependent upon publicity... —*C. Wright Mills*

ডাস্টবিনের আবর্জনাস্তূপ থেকে সেদিন বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের একখানি ছেঁড়া পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে পায়ে জড়িয়ে গেল। পা ছাড়াতে গিয়ে হঠাৎ একটা দু'কলম হেডিঙের উপর নজর পড়ল—**'বাংলার সংস্কৃতি-সংকট: সভাপতি শ্রীভজহরি মণ্ডলের ভাষণ'**। কাগজে ছাপা ছবিতে মণ্ডলমশায়ের রোম্যান্সের মতো ভারিক্কী মুখখানা ময়লার ছাপ লেগে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, চেনা যায় না। পথে চলতে চলতে চেষ্টা করেও মনে পড়ল না, এমুখ কোথাও দেখেছি কিনা। অবশ্য আমার পক্ষে না দেখাই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্যসভা বা সংস্কৃতির আসরে উপস্থিত থাকা আমার কাছে ফ্যাশিস্ট নির্যাতন সহ্য করার চেয়েও মারাত্মক মনে হয়। বস্তুত কোনো বক্তৃতা-সভা আমার ধাতে সয় না। কাজেই সংবাদপত্রের ছবিতে অস্পষ্ট ভজহরি মণ্ডলের মুখ আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট না হয়ে ওঠারই কথা। তা না উঠলেও এইটুকু বুঝলাম যে তিনি কলকাতার 'সিলেব্রিটি' বা স্বনামধন্যদের মধ্যে একজন।

বর্তমানকালে স্বনামধন্য তাঁরা যাঁদের নাম দিনের পর দিন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সংবাদপত্রে বেতারে এবং জনসংযোগের নানারকমের আধুনিক প্রচারযন্ত্রে। প্রথমে মহানগরের সংঘ ক্লাব পার্টি মণ্ডলী প্রভৃতি থেকে নামটির মৃদুধ্বনি উঠতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অবশেষে সেই ধ্বনিতরঙ্গ মহানগরের সীমানা ছাড়িয়ে দেশের দূরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে। একালের প্রচারযন্ত্রের এমনই মাহাত্ম্য যে,

যে-কোনো অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল তৃতীয় পুরুষ রাতারাতি তার কৃপায় স্বনামধন্য হতে পারেন। সংবাদপত্রে যদি ঘন ঘন সাতদিন তাঁর নাম মুদ্রিত হয়, বেতারের হাওয়াযন্ত্রে সেই নাম ধ্বনিত হয়, সংবাদচিত্রে সেই মুখ প্রদর্শিত হয়, এবং কয়েকটি জনসভায় তাঁর কম্বুকণ্ঠের ভাষণ মাইকযন্ত্রে নিনাদিত হয়, তাহলে রাস্তার রামের পক্ষেও দশরথনন্দন রামচন্দ্রের চেয়ে বেশি গুণবান ও স্বনামধন্য হয়ে ওঠা কঠিন হয় না। তারপর যেখানে তিনি যাবেন সেখানে লাউডস্পীকার যাবে, ক্যামেরা কাঁধে ফোটোগ্রাফাররা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে, অটোগ্রাফ্-হাণ্টাররা ঘিরে ধরবে এবং সমস্ত প্রচারযন্ত্র মিলে এমন একটা 'ইমেজ' তাঁর তৈরি ক'রে দেবে, যা দেখে রাস্তার রাম বা ভজহরি মণ্ডল নার্সিসাসের প্রতিবিম্বের চেয়েও অবাক হয়ে যাবেন। আধুনিক স্বনামধন্যতার প্রতিরূপ তৈরির ব্যাপারটা কতকটা হাততালির মতো। হাততালি সর্বদাই একটি দু'টি হাত থেকে আরম্ভ হয়, তারপর বহু হাতের তালিতরঙ্গের বিস্ফোরণ হয় প্রচণ্ড ধ্বনিতে। স্বনামখ্যাতিরও ক্রমবিস্তারের গতি অনুরূপ, হাততালি-সদৃশ।

মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে কিছুকাল আগে পর্যন্ত—খুব বেশি হলে তিনশো বছরের বেশি নয়—স্বনামধন্যতার কোনো সমস্যা ছিল না সমাজে। আজকাল খ্যাতি বলতে যা বোঝায় তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না তখন। ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ বলে স্বীকৃত হত এবং সেই গুণ যাঁদের থাকত তাঁদের মর্ত্যলোকের মানুষ বলেই মনে করা হত না, ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করা হত। যেমন প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাসকরা, রাজা-রাজড়ারা। শাসকগোষ্ঠীর বাইরে যাঁরা তাঁদের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকলেও, তা এত সাময়িক ও রাজা-রাজড়াদের খেয়াল-মর্জি-নির্ভর ছিল যে কোনো খ্যাতির বিভ্রম ব্যক্তিসত্তাকে বেষ্টন ক'রে রচিত হওয়া সম্ভবই ছিল না। বর্তমানে যাঁদের 'এলিট' বলা হয়, সেই 'এলিট'শ্রেণীও সেকালে খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে অনেক দূরে থেকে নিজেদের সামাজিক কর্তব্য পালন করতেন, সমাজের জনমানসে তাঁদের ব্যক্তিত্বের কোনো প্রতিরূপ নিবদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টাই তাঁদের ছিল না। সমাজের পরিবেশ তখন অন্যরকম ছিল এবং প্রচার ও বিজ্ঞাপনের আধুনিক কলাকৌশল তখন উদ্ভাবিত হয়নি। কাজেই আত্মপ্রচারের কোনো উদ্ভট ইচ্ছা (সেকালের বিচারে উদ্ভটই বলতে হয়) যদি তখন কারও মনে নিভৃতে জেগে থাকে, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অঙ্কুরেই তার বিনাশ হয়েছে। স্বনামখ্যাতি সম্বন্ধে অচেতনতার উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পীরা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্যের যে বিস্ময়কর নিদর্শন দেশে দেশে দেখা

যায়, তার স্রষ্টা শিল্পীদের কোনো পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না, মাত্র কয়েকজন রাজসভার শিল্পী বা রাজপ্রসাদজীবী শিল্পী ছাড়া। আর যে বিপুল লোকসাহিত্য লোকশিল্প ও লোকসংগীতের নিদর্শন জনসমাজে আজও ব্যাপক প্রেরণার উৎসস্বরূপ, তারও স্রষ্টারচয়িতাদের নামগোত্র আজও আমাদের জানা নেই। সমাজের যৌথ প্রতিমাই ('কলেকটিভ ইমেজ') তখন মানুষের কাছে, ব্যক্তিপ্রতিমার চেয়ে অধিকতর বাস্তব সত্য ছিল এবং সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল শাসকদের ঈশ্বর-প্রতিনিধিত্বের বা অবতারত্বের সত্য, যার মধ্যে সমাজের সমস্ত ব্যক্তির সত্তা নিমজ্জিত। ব্যক্তিপ্রতিমার উৎকট প্রকাশেচ্ছা অথবা স্বনামধন্য বা 'সিলেব্রিটি' হওয়ার উদগ্র বাসনা তাই তখন লোকেব মনে জাগত না।

ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয়-কালে। যদিও ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক মডেল গড়ে উঠেছে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপে এবং যাকে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ বলা হয় তার সূচনা হয়েছে তখন, তাহলেও ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক অগ্রগতি অষ্টাদশ শতক থেকেই আরম্ভ হয় এবং তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় ঊনবিংশ শতকে। অষ্টাদশ শতকে জনসনের যুগেব কফিহাউস-ট্যাভার্নের কলগুঞ্জনের মধ্যে কিছুটা মধ্যযুগীয় যূথচেতনার রেশ ছিল, ছোট ছোট গোষ্ঠী ছাড়িয়ে ব্যক্তির মধ্যে সেই চেতনার বিস্তার তখনও বিশেষ হয়নি। অবশ্য খ্যাতির প্রাঙ্গণে ব্যক্তিবিশেষদের আনাগোনা তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। তারপর ঊনবিংশ শতকে ধনতন্ত্রের অবাধ অগ্রগতি ও তার সাম্রাজ্যবাদী বেশ ধারণের সময় সামাজিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস রীতিমতো তীব্র হয়ে ওঠে। ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের অজ্ঞাতকুলশীলরা এই সময় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুঃসাহসিক অভিযানে বলবুদ্ধি প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখিয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় কীর্তিমান ও খ্যাতিমান ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এদিকে আর্থিক জীবনে ফ্রি মার্কেট, অবাধ বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সোপান বলে গণ্য হয়। ব্যক্তিগত জীবনেও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা প্রখর হয়ে ওঠে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকেও এই আত্মপ্রতিষ্ঠার মানদণ্ডগুলি অনেকটা সুনির্দিষ্ট ছিল—যেমন বিত্ত ও বিদ্যা বিংশ শতকে, বিশেষ ক'রে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরেব মধ্যে, যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের বাহ্যরূপের এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রচারযন্ত্র ও প্রচার-কলার প্রভাব এত বেড়েছে যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার কোনো মানদণ্ডই নির্দেশ করা এখন প্রায় অসম্ভব। আগেকার বিত্ত ও বিদ্যার মানদণ্ডগুলি যে বর্তমানে অচল হয়ে গেছে তা নয়, এখনও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির দিক দিয়ে তাদের

মূল্য আছে। কিন্তু বর্তমানকালের পাবলিসিটি বা প্রচারমূল্যের কাছে অন্য সব কিছুর মূল্য—ব্যক্তিগত গুণ বা প্রতিভা, এমনকি বহুদিনের শক্তিশালী মানদণ্ড 'অর্থ' পর্যন্ত নগণ্য বলা চলে। এখন নামটাই হয় বিখ্যাত, প্রচারযন্ত্রের পুনরাবৃত্তির ফলে, ব্যক্তি কি তা বিচার্য নয়। প্রচারযন্ত্র যখন কোনো কারণে বিকল ও স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন সেই নামটাও আবার অসংখ্য নামের বিশাল নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, একদা-স্বনামধন্য ব্যক্তি অগণিত অজ্ঞাত-কুলশীলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। তখন কোনো মহানগরের বিশাল কোনো জনতার মধ্যে যদি কেউ তাঁকে দেখতে পেয়ে চিনতে পারেন, তাহলে তিনি হয়ত পাশের লোকটির কানে কানে বলেন—'ঐ লোকটি কে জানেন? উনি ভজহরি মণ্ডল, ১৯৪২-৪৩এ প্রায় প্রত্যহ যাঁর নাম খবরের কাগজে বেরুত।' এই হল বর্তমানের স্বনামধন্য। অর্থাৎ 'স্বনামধন্য' এমন কতকগুলি নাম যা কেবল প্রচারধ্বনির জন্য ধন্য এবং সেই প্রচারধ্বনি নীরব হয়ে গেলে তাঁদের পক্ষে স্বনামধন্যতাও বজায় রাখা কঠিন। **স্বনামধ্বনি** যাঁর যত বেশি তিনি তত বেশি **স্বনামধন্য**, শুধু ধ্বনির **জন্যই** ধন্য।

ইংরেজদের আগমনের পর কলকাতার নাগরিক সমাজে যে নতুন অভিজাত-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ যাঁরা স্বনামধন্য হন, তাঁরা প্রধানত নানা উপায়ে উপার্জিত অর্থের জোরেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের ১৮৩৯ সালের কাগজপত্রে তাঁদের নাম-পরিবারের একটি তালিকা পাওয়া যায়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের নাম-পরিবারের সংখ্যা এই :

বাগবাজার	৬	শোভাবাজার	৬
শ্যামবাজার	৪	নিমতলা	২
জোড়াবাগান	১	সিমলা	৩
গরাণহাটা	১	জোড়াসাঁকো	৩
পাথুরিয়াঘাটা	১৮	বড়বাজার	১১
মেছুয়াবাজার	১	চোরবাজার	৪
কলুটোলা	৬	পটলডাঙ্গা	১
বহুবাজার	৩	মলঙ্গা	৩
জানবাজার	৪	খিদিরপুর	২
কাশীপুর	৩	ভবানীপুর	২

এই ৮৪টি পরিবারে মোট প্রায় ১০০ জন উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কলকাতা শহরে স্বনামধন্য ছিলেন। আমেরিকার মেট্রোপলিটন ৪০০'-র মতো আমরা এই একশোজনকে বাংলার 'মেট্রোপলিটন ১০০' বলতে পারি।

এঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন অর্থের বা বিত্তের জোরে, মধ্যযুগের কুলকৌলীন্য বেশ কিছুটা নস্যাৎ ক'রে দিয়ে। কি প্রকারে অর্থ উপার্জন করেন? সেই দীর্ঘ রোমাঞ্চকর ইতিহাস আবৃত্তির অবকাশ নেই এখানে। সংক্ষেপে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়:

"ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকাব পটকার মঠকার বেতনোভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের ঘাটেব খাটেব মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দাবি কবিয়া ··কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন ইহাবা অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত···"

(নবাবুবিলাস ১৮২২-২৩)

ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুরের 'অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা' অবলম্বন ক'বে কলকাতা শহরে যাঁরা 'অধিকতর ধনাঢ্য' হয়েছিলেন, নাগরিক সমাজে তখন তাঁরাই ছিলেন 'অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত'। তাঁরাই হলেন আমাদের বাংলার স্বনামধন্যদের আদিপুরুষ, আধুনিক যুগেব প্রথম 'সিলেব্রিটির' দল। তাঁরা যে-সব মোসাহেব ও পণ্ডিত পবিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন, তাঁরাই ছিলেন তখন তাঁদের নাম-মাহাত্ম্যেব প্রচারক, সংবাদপত্রের প্রচার তখন বড়-একটা ছিল না, খুব সামান্য ছিল, ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁরা ছিলেন 'ভিজুয়াল পাবলিসিটির' বস্তু, অন্য কোনো যান্ত্রিক প্রচারেব সাহায্যে তাঁরা স্বনামধন্য হননি। 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবায়, পুত্রকন্যার বিবাহে, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে, দেবদেউল প্রতিষ্ঠায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে তাঁরা স্বনামধন্যতা অর্জন করেছেন। তাঁদের স্বর্ণযুগ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে অস্তগামী হল, যখন আধুনিক শিক্ষার প্রচলনেব ফলে বিত্তের সঙ্গে বিদ্যা ও কৃতিত্বও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মান হিসেবে মিশে গেল এবং তার সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রচারকার্য আরম্ভ হল। স্বনামধন্যতার প্রতিযোগিতা বাড়ল সমাজে, তার প্রচারক্ষেত্র প্রসারিত হল সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু তথাপি খ্যাতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠাব এই পন্থাপ্রতিযোগিতার একটা সুবিন্যস্ত প্যাটার্ন ছিল এবং একটা যুক্তি বা বুদ্ধিবিবেচনার গণ্ডির মধ্যে টেনে এনে তার বিচার করাও সম্ভব হত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পর সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের অনেক ক্ষেত্রেই যেমন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পন্থাপ্রতিযোগিতার প্রচলিত প্যাটার্ন গত একপুরুষকালের মধ্যে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। মানুষের শ্রদ্ধা

ভক্তি ভালবাসার মনোভঙ্গিরও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সকলের অগোচরে অতিদ্রুত একটা সামাজিক বিপ্লব হয়ে গেছে টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতির জন্য। এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে যে তার পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত আমাদের চেতনার তটে পড়েনি, তাই আমরা পরিবর্তনের রূপ দেখে বিহ্বল হয়ে যাই, যুক্তি বা বুদ্ধির কোনো গণ্ডির মধ্যে খুঁজে পাই না। অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষেত্রের ব্যাপক যন্ত্রীকরণের মতো, কম্‌পিউটার অটোমেশনের মতো, মানুষের সমাজের ও জীবনেরও সামগ্রিক যন্ত্রীকরণ হয়েছে আজ। মানুষের জীবন হয়েছে অটোমেশনের মডেল, তার হৃদয় বুদ্ধি যুক্তি সবই আজ কম্‌পিউটারের নামান্তর মাত্র। আজকের দিনে তাই যাঁরা এই যান্ত্রিক সমাজের সকল রকমের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে 'স্বনামধ্বনির' সুযোগ পান, তাঁরাই যন্ত্রতুল্য মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধিযুক্তি জয় ক'রে অতি সহজে 'স্বনামধন্য' হতে পারেন।

আধুনিক যন্ত্রীকৃত সমাজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমেরিকান সমাজ। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির আশ্চর্য উন্নতির ফলে আমেরিকায় ভোগাপণ্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এত বেড়েছে যে মানুষ যেন সেখানে আজ অফুরন্ত অনির্বাণ উপভোগের ওয়ান্‌ডারল্যাণ্ডের অধিবাসী। সমাজবিজ্ঞানীরা আজকের আমেরিকানদের কন্‌জিউমারল্যাণ্ডের বেবি (শিশু) বলেছেন। এই তাজ্জব দেশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন হওয়া সত্ত্বেও অর্থ ও ভোগেচ্ছার মোহে অন্ধ হয়ে মানুষ আজ সেখানে শোষণপীড়ন-দাসত্বের যন্ত্রণা পর্যন্ত ভুলে গেছে। একচেটিয়া ধনতন্ত্রের অথবা আধুনিক কর্পোরেটব্যুরোক্রাটিক ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এই পণ্য-প্রাচুর্যের প্রথম ফল হয়েছে প্রতিযোগিতার জন্য বৈচিত্র্য, অনন্ত বৈচিত্র্য বলা চলে—যেমন হাজার রকমের হীটার ফ্রিজিডেয়ার কুকার রেডিও টেলিভিসন অটোমোবিল কসমেটিক ইত্যাদি। বৈচিত্র্যজনিত প্রতিযোগিতায় মুনাফাসহ মালবিক্রির তাগিদে আজ আমেরিকান সমাজে বিজ্ঞাপন বা প্রচারের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞাপন আজ শুধু বিশেষরূপে জ্ঞাপন নয়, প্রচারকলা (অ্যাড-আর্ট) বিশেষ, এবং সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা প্রচারকলা। বড় বড় শক্তিমান শিল্পীরাও আজ হাজার হাজার ডলার বেতনে প্রচারকলার সাধনায় নিযুক্ত। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের জন্য দুহাজার কোটি ডলার (১৬ হাজার কোটি টাকা) খরচ করেন। ভারতবর্ষের মতো অর্ধোন্নত দেশের একটা বড় রকমের উন্নয়ন পরিকল্পনা এই টাকায় সার্থক হতে পারে। কি জন্য এই বিজ্ঞাপন? ক্রেতাদের মন ভুলিয়ে ফুসলিয়ে মালবিক্রির জন্য এবং চটকদার মোড়ক প্যাকেজ ও লেবেলের সাহায্যে। মাল যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, বিক্রি নির্ভর করে মোড়কের আকর্ষণ,

প্যাকেজের ডিজাইন ও লেবেলের চমকের উপর। মাল যদি বাজারের শ্রেষ্ঠ মাল হয়, কিন্তু তার মোড়ক ও প্যাকেজ যদি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাহলে তা বিকোবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বর্তমান যুগের বিজ্ঞাপনের এই ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করলে একালের শ্রেষ্ঠ এপিক উপন্যাস রচনা করা যায় এবং যে-উপন্যাস যে-কোনো বিকৃত কামোদ উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় হতে পারে।* আপাতত তাই বিজ্ঞাপন বা প্রচারপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা 'স্বনামধন্যের' প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। কিন্তু বিজ্ঞাপনপ্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অবান্তর নয়। 'পাবলিসিটির' সঙ্গে আধুনিক 'সিলেব্রিটির' সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গের এটুকু অবতারণা না ক'রে উপায় নেই। এই বিজ্ঞাপন ও প্রচার-সর্বস্ব সমাজের কথা ভাবলে মনে হয় যেন বর্তমান সমাজ একটা বিশাল 'সেল্‌সরুম' ছাড়া কিছু নয়, যেখানে প্রত্যেকেই 'সেল্‌সম্যান' :

"The salesman's world has now become everybody's world, and...everybody has become a salesman."—*C. Wright Mills.*

এই সেল্‌সম্যানের সমাজে স্বনামধন্যতা নির্ভর করে সেল্‌সম্যানশিপের কৃতিত্বের ওপর। হরির দশরকম গুণ আছে, কিন্তু সে ভালো সেল্‌সম্যান নয়, কাজেই বাজারে সে বেশি দামে বিকোল না, 'সিলেব্রিটি' হল না, অথচ এরকমের গুণ নিয়ে ভজহরি ভালো সেল্‌সম্যান বলে—অর্থাৎ সুযোগ্য আত্মবিক্রেতা বলে—খবরের কাগজে ডবল-কলম হেডিং-এও স্থান পেল এবং স্বনামধন্যও হয়ে গেল। বর্তমানযুগে বিদ্যার ক্ষেত্রে এই মোড়ক-লেবেল-প্যাকেজের মাহাত্ম্য যে রকম প্রকট, এরকম বোধ হয় আর কোনো ক্ষেত্রেই নয়। সত্যিকার পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণীয় ডিগ্রীর প্যাকেজ-লেবেলে ভূষিত না হন, তাহলে বিদ্বৎসমাজ বা সাধারণ-সমাজে তাঁর যোগ্য সমাদর দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। অথচ আজকের সমাজে প্রচুর অর্ধশিক্ষিত লোক কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ম্যানিপুলেটেড' ডিগ্রির প্যাকেজ-লেবেলের জোরে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করছেন দেখা যায়। আজকের তরুণবিদ্রোহ ও ছাত্রবিদ্রোহ প্রধানত বিদ্যার এই সেল্‌সম্যানশিপ ও প্যাকেজ-মাহাত্ম্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং পাঠ্যবিষয় পরীক্ষা শিক্ষক-অধ্যাপক-উপাচার্যের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের একটা বড় কারণও তাই। ফ্রান্সের কোঅন্‌-বাঁদিত থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর সমস্ত দেশের তরুণ ছাত্রনেতাদের উক্তি-বিবৃতি ও রচনা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কে না জানে যে বাইরের সমাজের যাবতীয় দুর্নীতি, নৈতিক অবনতি, পরস্পর-পিঠ-চুলকানি, স্বজন-পোষকতা প্রভৃতি ব্যাধির উপসর্গ (বয়ঃজ্যেষ্ঠদের) আজকের

*এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন ও মন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যায়তনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যধিক প্রকট হয়ে উঠেছে! সরকারী তদন্ত কমিশন কিছুদিন আগে (১৯৬৭) বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে বলেছেন—

"...things are really unspeakably bad in Bihar University. The rot has run deep, very deep...It is no longer a University."

যেমন বিহারে, তেমনি অন্যান্য প্রদেশে, এবং শুধু এদেশের প্রদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। সরকারী তদন্ত কমিশন এমন কথাও বলেছেন, ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে, যে টাকা দিলে যে-কোনো ডিগ্রী পাওয়া যায়, যে-রকম ডিগ্রী সে-রকম টাকার পরিমাণ। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যায়তন নামক এরকম একটি পচাগলা বিকৃত শব-প্রতিষ্ঠানকে যদি সমাজের ভবিষ্যতের মানুষ, অর্থাৎ তরুণরা, উচ্ছেদ করার জন্য আন্দোলন করে, তাহলে তার বাইরের রূপ যতই উচ্ছৃঙ্খল মনে হোক, কেবল অভিসম্পাত বর্ষণ ক'রে তা বন্ধ করা যাবে না। কারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শোচনীয় অবনতি ও পচন যেমন সত্য, তেমনি তার বিরুদ্ধে ছাত্র-বিদ্রোহটাও নির্মম বাস্তব সত্য। কোনো সত্যকেই কেবল হা-হুতাশ, কপাল-চাপড়ানি ও কটুবাক্য দিয়ে অপসারিত করা যাবে না।

আগে বলেছি যে আধুনিক যুগে স্বনামধন্যতার দু'টি বড় সোপান হল— বিত্ত ও বিদ্যা। বিত্তের অখণ্ড প্রতিপত্তি যতদিন মার্কেটতুল্য সমাজে থাকবে, ততদিন বিত্তবানেরও প্রতিপত্তি থাকবে, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। যদিও বিত্তবানের রূপ আজ অনেক বদলে গেছে, যেমন শিল্পমালিক ও তাঁর ম্যানেজার বা প্রধান কর্মসচিব উভয়েই বিত্তবান—একজন মালিক ও অন্যজন তাঁর অধীন কর্মী—কিন্তু তা হলেও প্রত্যক্ষ প্রতিপত্তি ম্যানেজার বা কর্মসচিবের অনেক বেশি (যদিও মালিকের তুলনায় তাঁদের বিত্ত অনেক কম) এবং স্বনামধন্য বর্তমান সমাজে ম্যানেজার ও কর্মসচিব, তাঁদের মালিকরা নন। বিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হয়েছে যে-কোনো ভোগ্যপণ্য বা বিক্রয়পণ্যের মতো চটকদার প্যাকেজ-লেবেলসর্বস্ব। কাজেই বিদ্বানদের সিলেব্রিটিও এযুগে ডিগ্রী নামক প্যাকেজ-ডিজাইন ও লেবেল প্রচারের উপর নির্ভরশীল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সবার উপরে মানুষ নয়, তার গুণ চরিত্র প্রতিভা নিষ্ঠা কিছুই নয়, প্যাকেজ-লেবেল-ট্রেডমার্ক ও প্রচারই বড় সত্য, এবং যার প্যাকেজের ডিজাইন চিত্তাকর্ষক, যার প্রচারের ধ্বনি বেশি, তিনিই সবচেয়ে বেশি বর্তমান সমাজে স্বনামধন্য। সারবস্তু বা পদার্থ কিছুই নয়, লেবেলটাই মহাসত্য, যেমন ভোগ্যপণ্যের বাজারে, তেমনি বিদ্যাপণ্যের বাজারে।

যন্ত্রীকৃত সমাজ, বহুজনতন্ত্র ('ম্যাস ডেমক্রাসি'), অর্ধশিক্ষিতের বিপুল বন্যা (শিক্ষামানের শোচনীয় অবনতির জন্য), ভোটতান্ত্রিক রাজনীতির যান্ত্রিক

নিয়ন্ত্রণ এবং যান্ত্রিক আমোদ-প্রমোদ ও অবসর বিনোদন ইত্যাদির ফলে ব্যক্তিমুখী আকর্ষণও যান্ত্রিক উত্তেজনাশ্রিত হয়ে উঠেছে। আমেরিকান সমাজে আজ যাঁরা এক নম্বরের স্বনামধন্য তাঁরা হলেন (রাইট মিল্‌স)—

Movie Stars
Broadway Actors
Sportsmen
Crooners
Dinner Show Clowns

কলকাতা-দিল্লীর সমাজের সঙ্গে কোনো পার্থক্য আছে কি ? একেবারেই নেই। কিছুদিন আগে কোনো চিত্রতারকাকে কলকাতার পৌরসভা থেকে অভিনন্দিত করার আয়োজন করা হয়, কিন্তু সভা প্রায় পণ্ড হয়ে যায় দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুগ্ধভক্তদের উন্মত্ত আচরণে। সংবাদপত্রে ডবল-কলম হেডিং-এ খবর দেওয়া হয়—

'FANS GO WILD AT CIVIC RECEPTION'

আরও কিছুদিন পরে যখন চিত্রতারকারা রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁদের আরজি পেশ করতে যান তখন সেখানকার কর্মীদের (যাঁরা প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতি-সচেতন বলে শোনা যায়) কলরবে ও ছুটোছুটিতে মহাকরণ কেঁপে ওঠে—

FILM STARS' ENTRY CREATES
CHAOS IN WRITERS BUILDING

সংবাদপত্রের ডবল-কলম হেডিং। নিউইয়র্ক ও কলকাতা-দিল্লীর মধ্যে আজ আর স্বনামধন্যতা ও জনপ্রিয়তার কোনো তফাত নেই। চিত্রতারকা যেমন খেলোয়াড়ও তেমনি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় ব্যক্তি, তার প্রমাণ খেলার মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের হোটেল পর্যন্ত সবসময় পাওয়া যায়। হোটেলের ক্রুনার ও ক্লাউনরাও তাঁদের জগতে বেশ স্বনামধন্য, কাগজের বিজ্ঞাপনে ও হোটেলের হলঘরের মাইকের প্রচারে তাঁদের 'সিলেব্রিটি' তৈরি করা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে সিনেমা-পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্র সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির প্রধান নিয়ন্ত্রক। লোকরুচি তাঁরাই তৈরি করেন। কাজেই বর্তমানকালে সম্পাদক সাংবাদিক ও রিপোর্টারই সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য ব্যক্তি। জনসংযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার তাঁদের আয়ত্তে, তাঁরা ইচ্ছা করলে শিবকে বাঁদর এবং বাঁদরকে শিব করতে পারেন, হয়কে নয় এবং নয়কে হয়ও করতে পারেন। এযুগের খবরের কাগজ সাধারণের কাছে বেদ-বাইবেলের মতো। কাজেই সকল শ্রেণীর লোককে—বিশেষ ক'রে যাঁরা স্বনামধন্য হতে চান—সাংবাদিকদের তোষামোদ করতে হয়, যদি একটু আত্মপ্রচারের সুযোগ পাওয়া যায়—এবং তার ফলে সাংবাদিকরা অটোমেটিকালি স্বনামধন্য হয়ে যান। এছাড়া, রাজনৈতিক

নেতারা স্বনামধন্যদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, তালি ও ধ্বনির জোয়ারে এত সহজে তাঁরা স্বনামধন্যতার তরঙ্গশীর্ষে উঠতে পারেন, যা সমাজের আর কোনো শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেতাদের বাদ দিলে, আধুনিক আমেরিকান সমাজে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বনামধন্যদের শতকরা হার এইরকম দাঁড়ায় (রাইট মিল্‌স)—

(ক)	সিনেমা, রেডিও, প্রমোদ, স্পোর্টস, সাংবাদিকতা	:	শতকরা ৩০ জন
(খ)	বনেদী ধনী, কিন্তু নতুন কৃতিত্বের অধিকারী	:	শতকরা ১২ জন
(গ)	প্রতিষ্ঠানের একজিকিউটিভ, ম্যানেজার, সরকারী উচ্চপদের কর্মী অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ	:	শতকরা ৫৮ জন

আমাদের দেশের সমাজ এখনও আমেরিকার মতো সম্পূর্ণ যন্ত্রীকৃত ও অর্থোন্নত হয়নি, কাজেই স্বনামধন্যদের শ্রেণীগত শতকরা হারের কিছু তারতম্য এখানে হবে, কিন্তু প্যাটার্ন বা বিন্যাস একই রকমের, এবং সেইটাই বড় কথা।

'সিলেব্রিটি' বা স্বনামধন্যতার দুর্বার গতি আজ রাজনৈতিক নেতা, চিত্রতারকা খেলোয়াড় ক্রুনার-ক্লাউন ও ভজহরি মণ্ডলদের দিকে। বিজ্ঞানী শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক পণ্ডিত এঁরা আজ স্বনামধন্যদের সমাজে উপেক্ষিত প্রলেটারিয়েটশ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ সর্বনিম্নস্তরভুক্ত। একটি দৃশ্য কলকাতা শহরে স্বচক্ষে একদিন দেখেছি যা আজও ভুলতে পারিনি। কলকাতার একটি বড় হোটেলে আমাদের দেশের ও বিদেশের কয়েকজন বিখ্যাত (স্বনামধন্য নন) বিজ্ঞানী এসেছিলেন বোধহয় বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে। সেই সময় কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড় ও একজন চিত্রতারকাও সেই হোটেলে ছিলেন। হোটেলের সামনে বিরাট জনতা, ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি, খেলোয়াড়রা ও চিত্রতারকা বেরুবেন, তাঁদের দর্শনের জন্য। এমন সময় বৈজ্ঞানিকরাও তাঁদের কর্মোপলক্ষে বেরিয়ে আসছিলেন, ঠেলাঠেলির ধাক্কায় তাঁরা ফুটপাথে পড়ে যান, একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী রীতিমতো আহত হন। তাঁকে চ্যাংদোলা ক'রে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে পুলিশভ্যান এসে কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে চিত্রতারকা ও খেলোয়াড়দের বহির্গমনের পথ মুক্ত ক'রে দেন। যান্ত্রিক বহুজনসমাজে এই হল সিলেব্রিটির স্বরূপ।

তাই ভাবছিলাম, আজকের কলকাতার রাজপথে, চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে যদি আইনস্টাইন রাসেল অথবা রামমোহন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র হেঁটে যেতেন, তাহলে কি দৃশ্য আমরা দেখতাম! মহানগরের রাজপথের কিছু যাযাবর কুকুর, ভ্রাম্যমাণ ষাঁড় ও ফুটপাথের ভিখিরি তাঁদের পেছন পেছন যাচ্ছে, এছাড়া আর একটি লোকও নেই। কারণ তাঁরা চিত্রতারকা, খেলোয়াড়, রাজনৈতিক নেতা ও ভজহরি মণ্ডলের মতো 'স্বনামধন্য' নন।

ইয়ং ক্যালকাটা

কলকাতা শহরের গা থেকে তখনও পুরনো সুতানটির গন্ধ যায়নি। নব্যঅভিজাত বাঙালী বাবুরা তখন শহরতলির বাগানবাড়িতে বাইজীনাচ আর আতশবাজির উৎসবে সাহেব-মেমদের অভ্যর্থনা করতে মশগুল। সমাজের অধোগতিতে বিচলিত হয়ে যাঁরা সমাজোন্নতিপ্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁরাও নবাবী বিলাসিতার সঙ্গে প্রগতির আদর্শের একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংগীতের বিচিত্র সংমিশ্রণ তখনই কলকাতা শহরে হয়েছিল বড়সাহেবদের বাহবার প্রলোভনে। দুর্গোৎসবের আসরেই তার অনুষ্ঠান হত এবং লক্ষ্ণৌ-বারাণসীর এক-দু'হাজারী বনেদী বাইজীরা সেই সুরের 'ককটেল' নূপুর নিক্কণ ও অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে পরিবেশন করতেন। এই সময় কলকাতা শহরে একদল তরুণ ছাত্র—সকলেরই দশের কোঠায় বয়েস—সমাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বয়োবৃদ্ধদের মনে এমন ত্রাস সঞ্চার করেছিলেন যা আজকের তরুণদের কাছেও তাজ্জব ব্যাপার মনে হবে। প্রায় একশো-তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার (১৮৩০এর) কথা।

তখন কলকাতারও নাগরিক বয়ঃসন্ধিকাল। এত সব বিচিত্র অটোমোবিল, এত স্কুটার-টেম্পো ট্রাম-বাস পথে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করত না। অশ্বযান চলত কদমতালে, আর পালকি চলত দুলকি চালে। সময়ের গতি ছিল মন্থর, যদিও শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাড়াও ঘড়ির ব্যবসা ক'রে কিছু সময়জ্ঞানও এদেশে বিতরণ করেছিলেন। তাহলেও আজকের কলকাতার মানুষের মতো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে ঘড়ির চক্রের টিকটিকানি একছন্দে বাঁধা ছিল না। সময় ও জীবন দুটোই চলত ঢিমেতালে। স্বার্থের ধাক্কায়

তখন কলকাতার নাগরিকদের আজকের মতো নাভিশ্বাস ওঠেনি। কলকাতার জনসংখ্যাও ছিল তখন আজকের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। স্কুল-কলেজ অনেক কম ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় ছিলই না। মেয়েদের বিদ্যাভ্যাস বা স্কুল-কলেজে যাতায়াত তখন আরম্ভ হয়নি। পথে-ঘাটে মেয়েদের দেখা যেত না, বাড়িতেও না, একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে মেঘেঢাকা চাঁদের মতো মেয়েদের দেখতে হত। তরুণ-যুবকদের সংখ্যাও ছিল তখন লোকসংখ্যানুপাতে কম, কারণ শিশুমৃত্যুর প্রাবল্য ছিল সমাজে। বংশবৃদ্ধির যোগ্য বয়সে উত্তীর্ণ হবার আগেই তখন মানবলীলা সম্বরণ করা ছিল প্রাকৃতিক ঘটনা। যৌবন-প্রান্তেই তখন বার্ধক্য পদার্পণ করত। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের নিষ্পেষণে তখন তারুণ্য-যৌবনের প্রাণনির্ঝর অল্পদিনেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, যজ্ঞকাঠ নয়—যা ঘষলে আগুন জ্বলে ওঠে, একেবারে ভিজে মরাকাঠ—যাতে আগুন জ্বালালেও শুধু ধোঁয়া হয়। বাংলার যে দশের-কোঠার বয়সের তরুণদের কথা বলছি, তাঁরাও সকলে বালিকাবধূর বালকস্বামী ছিলেন। এই বালক-স্বামিত্বের সামাজিক দায়িত্ব একজন বিদ্রোহী তরুণের পক্ষে পালন করা যে কত কঠিন, তা আজকের দিনের সকল বন্ধনমুক্ত তরুণরা বাস্তবিকই উপলব্ধি করতে পারবেন না। তাও আবার এমন একটি স্তন্যপায়ী জীবের দায়িত্ব যে আজকালকার তরুণী-সঙ্গিনী-বান্ধবী বা প্রেমিকার মতো 'চালু' নয়, একেবারে নির্জীব পুঁটলির মতো অচালু। গৃহ বা পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হলে কোনো বিদ্রোহী তরুণদের পক্ষে ঘাড় বেঁকিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে একলা বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, বালিকাবধূর পুঁটলিটি পিঠে ক'রে বেরুবার সমস্যা দেখা দিত। কিন্তু বেরুবার পথ কোথায়? শহরের পথে বউ নিয়ে একসঙ্গে চলার দৃশ্য দেখতে তখন কেউ অভ্যস্ত ছিল না। তা ছাড়া আশ্রয়ই বা কে দেবে, কোথায় পাওয়া যাবে? তরুণদের বিদ্রোহের বহু বাধার মধ্যে এই বাধাও ছিল মস্তবড় বাধা। মুক্ত বলাকার মতো উড্ডীয়মান বর্তমান সমাজের তরুণ-তরুণীদের কাছে এ বাধার দূরতিক্রম্যতা অচিন্ত্যনীয়।

বাধা আরও ছিল। যেমন জ্যেষ্ঠশাসন ও বৃদ্ধশাসন তখন সমাজে ও পরিবারে মুক্ত তরবারির মতো সর্বদা সমুদ্যত থাকত। কর্তব্যবোধ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে, নীতিবোধ নড়লে-চড়লে, অভ্যাস-আচরণ বিকৃত হলে, জ্যেষ্ঠদের রক্তচক্ষুর অগ্নিবর্ষণে তারুণ্যের উত্তাপ মুহূর্তেই হিমায়িত হয়ে যেত। ঘোড়ার পিঠে সহিসের চাবুকের চেয়ে ছাত্রের পিঠে শিক্ষকের চাবুকের ব্যবহারই ছিল অধিক স্বাভাবিক। বেত্রাঘাতের ব্যত্যয় ঘটলে শিশু ও তরুণের চরিত্রস্খলন হতে পারে, এই ছিল জ্যেষ্ঠদের বিশ্বাস। শাসন ও নিয়মানুগত্যের দিক থেকে বিচার করলে পরিবার ও সমাজ ছিল কতকটা কারাগারসদৃশ, তার লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের সাবলীল স্ফূর্তি একরকম সুদূরপরাহত ছিল

বলা চলে। তারুণ্যের সতেজ প্রাণদ্যুতি এই নিরন্ধ্র প্রতিবেশে স্বাভাবিক বিচ্ছুরণের পথ খুঁজে না পেয়ে গোপন দুষ্কৃতির রন্ধ্রপথে বিকীর্ণ হত। স্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকার ছিল বয়োবৃদ্ধদের কুক্ষিগত, এবং বুদ্ধিবিবেচনার দিক থেকে তাঁদের পক্বকেশ মস্তিষ্ক ছিল তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো উত্তুঙ্গ, অপরিপক্ক তরুণদের নাগালের অতীত।

এতরকমের সামাজিক বাধাবিপত্তির মধ্যেও বাংলার রাজধানী কলকাতা শহরে একদল তরুণ কিশোর বয়সের ছাত্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সমাজের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে। ছাত্রদের নিজেদের গোষ্ঠীগত কোনো দাবি নয়, প্রশ্নপত্র সহজ-কঠিন বা পরীক্ষায় পাস-ফেলের দাবি নয়, শিক্ষাসংস্কারের দাবি নয়, অথবা ছাত্র-আন্দোলনের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিও নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম কোনো দাবি উদ্‌ভবের মতো অনুকূল পরিবেশই তখন রচিত হয়নি। ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরে, উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশক থেকে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, এঁরা ছিলেন এদেশের প্রথম যুগের ছাত্র আন্দোলনের নেতা। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে পরিচিত তরুণ ছাত্রদল কোনো বিশেষ ছাত্র-আন্দোলন বা দাবি-দাওয়ার আন্দোলন করেননি। তাঁদের বিদ্রোহকে তাই 'ছাত্র বিদ্রোহ' বলা যায় না, 'যুববিদ্রোহ' বলা যায়। তা ছাড়া, বিশেষ কোনো বাস্তব দাবি-দাওয়া নিয়ে ছাত্র বা যুব আন্দোলনকে 'যুববিদ্রোহ' বলা যায় না। যুববিদ্রোহ সমাজের মূলনীতি ও গঠনের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের প্রকাশ। কলকাতা শহরে 'ইয়ং ক্যালকাটা' গোষ্ঠীর বিদ্রোহ শুধু বাংলার নয়, আধুনিক যুগের ভারতের প্রথম যুববিদ্রোহ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এই বিদ্রোহের পৃষ্ঠপট, প্রকৃতি ও লক্ষ্যায়তনের সঙ্গে বর্তমানকালের যুববিদ্রোহের সাদৃশ্য আন্তরিক, পার্থক্য বাহ্য। কেবল তা নয়। পার্থক্যটা প্রধানত সাংখ্যিক বা 'কোয়ানটিটেটিভ', গুণীয় বা 'কোয়ালিটেটিভ' নয়। সেকালের 'ইয়ং ক্যালকাটা'র বিদ্রোহ ছিল বিকৃত ও জরাগ্রস্ত 'হিন্দু সমাজে'র বিরুদ্ধে, একালের 'ইয়ং ক্যালকাটা'র বিদ্রোহ হল যুগে-যুগে প্রচারিত অজস্র রঙিন আদর্শের ভগ্নস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত জরাজীর্ণ বিকৃত শ্রেণীবৈষম্যজর্জর 'মানবসমাজের' বিরুদ্ধে। বর্তমানে তাই ইয়ং ক্যালকাটা, ইয়ং প্যারী, ইয়ং রোম, ইয়ং বার্লিন, ইয়ং লণ্ডন, ইয়ং শিকাগো-ওয়াশিংটন-নিউ ইয়র্ক—সকলের বিদ্রোহের সুর একই উচ্চগ্রামে বাঁধা এবং এই যুববিদ্রোহের প্রকৃতি ও আদর্শায়তনের মধ্যে দৈশিক বা ভৌগোলিক ভিন্নতার চেয়ে কালিক অভিন্নতাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্র ও শিষ্য বলে যাঁদের 'ডিরোজীয়ান' বলা হত,

তাঁদেরই কেউ বলতেন 'ইয়ং বেঙ্গল', কেউ 'ইয়ং ক্যালকাটা'। এই ইয়ং ক্যালকাটার বিদ্রোহের সুরও বেশ উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। বস্তুত তখনকার অচলায়তন জ্যেষ্ঠতান্ত্রিক সমাজের উগ্রমূর্তির কথা মনে হলে তরুণদের বিদ্রোহী সুরের দুঃসাহসিক তীব্রতায় স্তম্ভিত হতে হয়। বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে, এবং কেন? বিদ্রোহের প্রেরণার উৎস কোথায়? বাংলাদেশের বাস্তব সামাজিক পরিবেশে তখন যুববিদ্রোহের প্রত্যক্ষ উদ্দীপক বিশেষ কিছু ছিল না। মানব সমাজের বিকাশের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে ছিল এই উদ্দীপনার বস্তু। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ হল সামন্ততন্ত্র-সমূহতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র-ব্যক্তিতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের কাল। এই কালের অভ্যুদয় হয়েছিল—মূলত জ্ঞানবিজ্ঞানের কয়েকটি কালান্তরী কীর্তির সমাবেশে—বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমান্ত থেকে বহুদূরে, সাত সমুদ্র তের নদী পারে, ইয়োরোপে। সেখানকার বস্তুতন্ত্রবাদী যুক্তিবাদী এবং সংশয়বাদী বিজ্ঞানবাদী প্রত্যক্ষবাদী, যান্ত্রিক পরিণামবাদী দার্শনিকরা এবং বৈজ্ঞানিকরা সমাজ মানুষ ও জীবন সম্বন্ধে পূর্বকালের প্রত্যয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ ক'রে পাশাপাশি নতুন প্রত্যয় গ'ড়ে তুলেছিলেন। সমাজের কেন্দ্রস্থ চলনশক্তি হল লৌকিক মানবিক—অলৌকিক অতিমানবিক বা ঐশ্বরিক নয় —এই ছিল নবযুগের নতুন জীবনবাণী। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রাথমিক অগ্রগতি আত্মনির্ভর মানবিক শক্তিকে অপরাজেয় প্রতিপন্ন করছিল। চারিদিকের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি মানুষের মনে একটা মসৃণ নিটোল প্রগতিবাদের অপরূপ মূর্তি তুলে ধরছিল। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব যেমন মানুষের আত্মশক্তির ভিত দৃঢ় করছিল, তেমনি সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনে মানুষকে প্রায় অন্ধ-বিশ্বাসী ক'রে তুলছিল। জান্তব যূথচেতনার কুয়াশালোক থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ সবেমাত্র ব্যষ্টিচেতনার প্রথম সূর্যালোকে তার পরিপার্শ্ব জীবন ও সমাজকে দেখতে আরম্ভ করেছিল। এই দৃষ্টিও নতুন, দৃষ্টিশক্তিও নতুন। অভিনব নয়, বৈপ্লবিক। অবয়বস্পর্শী নয়, ইন্দ্রিয়ভেদী এবং চৈতন্যলোকের গর্ভাগার পর্যন্ত প্রসারিত।

সুদূর ইয়োরোপ থেকে এই যুগান্তকারী সমাজদর্শন, এই বৈপ্লবিক জীবনবোধ ব্যক্তিচেতনা ও প্রগতিবিশ্বাস, কলকাতা শহরের গোলদীঘিতে হিন্দু কলেজের (বর্তমানের প্রেসিডেন্সি কলেজ) একদল তরুণ ছাত্রের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করল। কেবল আদর্শের আঘাতে যে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হতে পারে তরুণদের মনে ইয়ং ক্যালকাটার কীর্তি তার সাক্ষী। বিদ্রোহের মন্ত্রদাতা গুরু হলেন একজন ফিরিঙ্গি শিক্ষক—ডিরোজিও। তিনিও বয়সে তরুণ, ছাত্রদের চেয়ে দু-তিন বছরের বেশি বড় নন। ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়স সতের-আঠার। ছাত্রদের বয়স তের থেকে পনের-ষোল। অর্থাৎ শিক্ষক-ছাত্র সকলেই 'টীনএজার'। আজকের প্রেসিডেন্সি

কলেজের পূর্বসংস্থা হিন্দু কলেজ। সেখানে যে আজ থেকে একশো-চল্লিশ বছর আগে একজন শিক্ষকের সঙ্গে একদল ছাত্রের এরকম তারুণ্যের সংযোগ ঘটেছিল—এবং তের থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে—তা সত্যিই আজকের দিনেও যেন ভাবা যায় না। আঠার বছরের শিক্ষক ডিরোজিও এমন কী জীবনমন্ত্রে তাঁর তরুণ ছাত্রদের দীক্ষা দিয়েছিলেন যা তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং যে আগুনের হল্‌কায় সমাজের জীর্ণ কঙ্কাল পর্যন্ত ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। নবযুগের জীবনমন্ত্র, নবজীবনের দর্শন ও বিজ্ঞানের মন্ত্র। নতুন জীবনবোধ ও সমাজচেতনার মন্ত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদার মন্ত্র। যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের মন্ত্র। প্রগতিবাদের মন্ত্র। নবযুগের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকদের রচনা ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের পাঠ ক'রে শোনাতেন, ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের বাইরে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র জগতের রূপ তিনি ছাত্রদের মানসনেত্রের সামনে তুলে ধরতেন। ডিরোজিওর ছাত্ররাই বলেছেন যে, তাঁর ক্লাস ছিল প্লেটো-আরিস্ততলের 'আকাদেমি'র মতো। বদ্ধ ক্লাসের চারদেয়ালের মধ্যে ছাত্রদের কৌতূহল নিবৃত্ত হতো না। ক্লাসের বাইরে কলেজের একোণে-সেকোণে ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরত, জানবার অদম্য আগ্রহ তারা দমন করতে পারত না। কলেজের বাইরে গোলদীঘি থেকে মৌলালির দর্‌গার কাছে লোয়ার সার্কুলার রোডে ডিরোজিওর গৃহের পথে চলতে চলতে আলোচনা হতো শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের। তাতেও তরুণদের আকাঙ্ক্ষা মিটত না। এসব কথা কেউ তো কখনও তাদের বলেননি, সমাজ ও পরিবারের কর্তারা কেউ না। বাল্যকাল থেকে এতদিন তারা শুধু সকালে উঠে মনে মনে বলেছে, সারাদিন যেন তারা ভালো হয়ে চলে, এবং গুরুজনেরা যা আদেশ করেন তাই যেন মন দিয়ে পালন করে। ডিরোজিও অন্য কথা বলেন। ক্লাসের কক্ষ থেকে কলেজের বারান্দা ও উঠোন, উঠোন থেকে পথ, পথ থেকে ডিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানা পর্যন্ত আলোচনা চলত। আলোচনা থেকে বিতর্কের সূত্রপাত হতো। মতামতের আদান-প্রদানে ও বিতর্কে উৎসাহ দিতেন ডিরোজিও। তিনি কখনও বলতেন না যে তাঁর কথা ছাত্ররা শিরোধার্য করে নিক, সর্বদা তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে বলতেন। তাঁর কথা তো দূরের কথা, কোনো গুরুজনের কথা, ঋষিতুল্য লোকের কথা, এমন কি ঈশ্বরের বাক্যও ডিরোজিও নির্বিচারে মেনে নিতে বলতেন না। তিনি বলতেন, বুদ্ধিমান মানুষ তার নিজের বুদ্ধি যুক্তি বিবেক ও বিচারশক্তি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করবে, শাস্ত্রবচন গুরুবচন বা দৈববচন ব'লে কিছু অন্ধের মতো গ্রহণ বা পালন করবে না। আজকের দিনে তথাকথিত গণতন্ত্রের তূর্যনিনাদের মধ্যেও কোনো সমাজনেতা, কোনো রাজনৈতিক নেতা বা পার্টি তদীয় ভক্ত্যাদের গণ-তন্ত্রের এই প্রাথমিক অধিকারটুকু দিতেও সাহস করবেন কিনা সন্দেহ।

ডিরোজিও শিক্ষক হয়ে তাঁর ছাত্রদের এই অধিকার দিয়েছিলেন, গণতন্ত্রের শৈশবকালে।

এই গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বাভাবিক প্রকাশক্ষেত্র হল স্বতন্ত্র বিদ্বৎসভা ও বিতর্কসভা। হিন্দু কলেজে ও ডিরোজিওর পারিবারিক গৃহের বৈঠকখানায় এই অধিকারের অবাধ স্ফূর্তি ব্যাহত হতো। কাজেই তরুণদের বিতর্কসভা গঠিত হল, নাম 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', স্থান শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়ি, পরে যেখানে ওআর্ডস ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়। বেভাবেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছেন যে, মানিকতলার এই বাগানবাড়ির হলঘরে ইয়ং ক্যালকাটা-গোষ্ঠীর সেবা বক্তরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সামাজিক নৈতিক দার্শনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কের ঝড় বইয়ে দিতেন। ঝড়ের মধ্যে জীর্ণ-পুরাতনের বিরুদ্ধে তরুণদের বিদ্রোহী মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ পেত। ভয়ংকর ক্ষোভের প্রচণ্ড প্রকাশ। মনে হতো যেন কোনো গুহাভ্যন্তর থেকে সিংহশাবকরা গর্জন করছে।

সিংহশাবকরা হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিক-কৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ডিরোজিওর অন্য ছাত্ররা। তাঁদের মুখের বুলি ছিল 'ডাউথ উইথ হিন্দুইজম, ডাউন উইথ অর্থডক্সি।' এ-বুলি উত্তোলিত ঝাণ্ডায় পথের মিছিলে প্রচারিত হতো না, বিতর্কসভায় ধ্বনিত হতো। সেই বিতর্কের মান সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখেছেন, প্রত্যেক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সময় বক্তারা ইংরেজী সাহিত্য থেকে, বিশেষ ক'রে বায়রন স্কট বার্নস থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি প্রয়োগ করতেন। ঐতিহাসিক বিষয় হলে রবার্টসন ও গিবন, রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি, ধর্মবিষয় হলে হিউম ও টমাস পেইন, আধ্যাত্মিক বিষয় হলে লক রীড স্টুয়ার্ট ব্রাউন প্রমুখ মনীষীদের রচনা তরুণ তার্কিকরা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতেন। আলোচনা হতো হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের নানারকমের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি নিয়ে। তরুণদের এই বিতর্কসভার আলোচনাতেই বাইরে হিন্দুসমাজের কর্ণ-ধাররা রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন।

সমাজে তখন কোনো শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত দাবি-দাওয়া নিয়ে গণ-আন্দোলন গ'ড়ে ওঠার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যাও তখন পাঁচশো'র বেশি ছিল না। অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান, আলালের ঘরের দুলাল। পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধে কিছু করার মতো সাহস তাঁদের অনেকেরই ছিল না। ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শের প্রভাব তাঁদের অনেকের উপরেই পড়েনি। কাজেই ইয়ং ক্যালকাটা তরুণচক্র আয়তনে যে খুবই ক্ষুদ্র ছিল তা বোঝা যায়। খুব বেশি হলে কুড়ি-পঁচিশজন

তরুণ ছিলেন এই চক্রভুক্ত। তাঁদেরই সারথ্য করতে হয়েছিল বাংলার, এবং ভারতের প্রথম তরুণ বিদ্রোহের। তার উপর সারথ্যের পন্থাও ছিল তখন অত্যন্ত পরিমিত। ছাত্রমিছিলের পুরোভাগে বজ্রমুষ্টি ও ঝাণ্ডা প্রদর্শনের দিন তখনও আসেনি। হিন্দু কলেজের সমকক্ষ বিদ্যালয়ও তখন ছিল না এবং সারথিদের আহ্বানে কোনো ছাত্র-সমাবেশের সম্ভাবনাও তখন ছিল না। এক-মাত্র উপায় ছিল সভা-সমিতিতে আলোচনা এবং নিজেদের মুখপত্রে সমালোচনা। বিদ্রোহের এই পথই ইয়ং ক্যালকাটাকে তখন গ্রহণ করতে হয়েছিল।

এ-পথেও বাধা ছিল অনেক। প্রথম বাধা ও বড় বাধা হল কোনো মুখপত্র প্রকাশ ও প্রচার করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তরুণদের থাকার কথা নয়। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীণরা এদিক দিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ ছিলেন। পত্রিকার সংখ্যাও ছিল তাঁদের অনেক বেশি। দিনের পর দিন তাঁরা সেইসব পত্রিকায় তরুণদের ধ্যান-ধারণা ও আচার-ব্যবহারের তুর্মব সমালোচনা করতেন। মাত্র দু-তিনখানি ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় (যেমন পার্থিনন, এনকয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ) তরুণরা তার জবাব দিতেন। তরুণদের জবাবের নমুনা এই :

"আমরা হিন্দুধর্মের তথাকথিত পবিত্র মন্দির ত্যাগ করেছি ব'লে গোঁড়া বৃদ্ধরা আমাদের উপর মারমুখী হয়েছেন। আমাদের তাঁরা সমাজচ্যুত করবেন, আমরা কুসংস্কার বর্জন করতে চাই এই অপরাধে। কিন্তু আমাদের বিবেক ও বুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমরা যা করছি তা খুবই ন্যায়সঙ্গত। অসীম ধৈর্য ধ'রে আমরা আমাদের কর্তব্য করব প্রতিজ্ঞা করেছি। আমাদের প্রতিপক্ষ বয়োবৃদ্ধরা যদি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আমাদের উপর খড়্গহস্ত হন, আমরা ভীত হব না, প্রয়োজন হলে মৃত্যুও বরণ করব। সংগ্রাম ক'রে আমরা যেটুকু অধিকার অর্জন করেছি তা এক তিলও ছাড়ব না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজের প্রবীণ কর্ণধাররা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কি ভাবে প্রতিদিন নানারকমের প্রচারপত্র বিলি ক'রে আমাদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক রটাচ্ছেন। যাবতীয় অপকৌশল প্রয়োগ ক'রে তাঁরা আমাদের দমন করতে উদ্যত হয়েছেন, কোনো ধর্মবোধে বা নীতিবোধে বাধছে না। কিন্তু কোনো অপকৌশল, কোনো চক্রান্ত বা হুমকির কাছে আমরা মাথা হেঁট করব না। যত নির্মম হোক, সমস্ত অত্যাচার আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত, কারণ আমরা জানি একটা জাতিকে সংস্কারমুক্ত উদার ও উন্নতিশীল করতে হলে সমাজে খানিকটা গণ্ডগোল ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবেই। কাজেই গণ্ডগোল আমরা করব, হল্লা করব, চেঁচামেচি করব, তারস্বরে প্রতিবাদ করব, সমাজের যাবতীয় অন্যায় অবিচার কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকবৃত্তির বিরুদ্ধে।"

তরুণদের প্রতিবাদের ভাষা ক্রুদ্ধ ও কঠোর, কিন্তু অসংযত বা অশালীন

নয়। বাইরের আচার-ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে অবশ্য তরুণ ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ অসংযম ও অশালীনতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন গোলদীঘিতে বসে মদ্যপান করা এবং মুসলমানের দোকান থেকে গোমাংস কিনে খাওয়া তখন অনেক তরুণের কাছে প্রগতিশীল কর্ম ব'লে মনে হতো। এ কথা রাজনারায়ণ বসু, লালবিহারী দে, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকে লিখে গেছেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাও বেশ দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল, প্রগতির লক্ষণ তো বটেই। যৌবনে যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেন, তাঁরা কেউ কেউ দীক্ষা গ্রহণের পরে কিঞ্চিৎ সুরাপান ক'রে সেলিব্রেট করতেন। রাজনারায়ণ বসু নিজেও তাই করেছিলেন। এ ছাড়া তরুণরা মধ্যে মধ্যে নিজেদের পাড়া-প্রতিবেশীদের উপরেও নানারকমের উপদ্রব করতেন। যেমন ব্রাহ্মণপাড়ায় কোনো বন্ধুবান্ধবের গৃহে বসে মাংস ভক্ষণ ক'রে ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর ঘরে হাড় নিক্ষেপ ক'রে গো-হাড় গো-হাড় ব'লে হল্লা ক'রে তাঁরা ব্রাহ্মণদের উত্তেজিত করতেন। এরকম ঘটনা ইয়ং ক্যালকাটাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই ঘটেছিল, উত্তর-কলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তার জন্য কৃষ্ণমোহনকে পাড়া ও পরিবার ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল। কোনো হিন্দুপাড়ায় বন্ধুবান্ধবের গৃহেও তাঁর স্থান হয়নি। অবশেষে চৌরঙ্গি অঞ্চলে সাহেবপাড়ায় গিয়ে তাঁকে বাস করতে হয়েছিল।*

এই সময় কৃষ্ণমোহন (১৮৩১ সালে) হিন্দুসমাজের সমালোচনা ক'রে একটি ছোট নাটিকাও লিখেছিলেন। নাটিকাটির নাম: *The Persecuted or Dramatic Scenes. Illustrative of the Present State of Hindu Society in Calcutta.* তখন তাঁর বয়স সতের-আঠার বছর। নাটিকাটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন হিন্দু যুবকদের। উৎসর্গের ভাষা এই :

> 'The following pages are inscribed to them with sentiments of affection, and strong hopes of their appreciating those virtues and mental energies which elevate man in the estimation of a philosopher.'

উৎসর্গের ভাষা ও ভাব লক্ষণীয়। তরুণদের বিদ্রোহের উদ্দেশ্য যে কত মহৎ ছিল তা কৃষ্ণমোহনের এই উৎসর্গপত্রে অভিব্যক্ত মনোভাব থেকে বোঝা যায়। ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন বলেছেন, নাটকীয় গুণ হয়তো এই নাটিকার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, লেখার মধ্যেও অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু তবু লেখার উদ্দেশ্যের কথা মনে ক'রে পাঠক ও দর্শকরা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করবেন ব'লে তিনি মনে করেন। উদ্দেশ্য হল, হিন্দুসমাজে যাঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁরা যে কতদূর জঘন্য চরিত্রের লোক তা প্রকাশ ক'রে দেওয়া।

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমার 'ইয়ং বেঙ্গল' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। —বি. ঘো.

নাটকটি কাঁচা লেখা হলেও আজকালকার একশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রচার-সাহিত্যের তুলনায় সুপাঠ্য বলা চলে।

ইয়ং ক্যালকাটার হিন্দুসমাজবিদ্বেষে একদল ইংরেজ বেশ ইন্ধন যুগিয়েছিলেন, সকলে নন। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন বিদেশী মিশনারীরা। আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁদের গুরুস্থানীয়। মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-সমাজের নবীন-প্রবীণদের আদর্শ-সংঘাতের এই সুযোগে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত হিন্দু তরুণদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এই উদ্দেশ্য কিছুটা তাঁদের সফল হয়েছিল। অবশ্য সাময়িক সাফল্য। বিদ্রোহী তরুণদের তাঁরা সহজেই তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন এবং খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁদের ঘন ঘন বক্তৃতাও শুনিয়েছিলেন। তাই নিয়ে হিন্দুকলেজে ও হিন্দুসমাজে সোরগোল হয়েছিল। নষ্টের গুরু ব'লে হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিও পদচ্যুত হয়েছিলেন। পদচ্যুতির কিছুদিন পরে অকস্মাৎ ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ—যেমন মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন—খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজে ছেলেধরার আতঙ্ক হয়। গুজব রটে যে, মিশনারীরা ছেলেদের ভুলিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করছেন। শহরময় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রটে যায় 'পাতিফিরিঙ্গি কেষ্টা বন্দ্যো'।

বৃন্দাবন ঘোষালরা গুজব রটনার কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন ঘোষাল প্রত্যহ সকালে উঠে গঙ্গাস্নান ক'রে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিদ্রোহী তরুণদের সম্বন্ধে আজগুবি সব গল্প ক'বে বেড়াতেন। এইটাই তাঁব পেশা ছিল। বিনিময়ে যৎসামান্য দক্ষিণা ও কিছু চাল-ডাল-ভুজিও তিনি পেতেন। বলা যায় না, তরুণদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটাতে যাঁরা শহরে প্রচারপত্র বিলি করতেন, সেই ধনবান সমাজপ্রধানরাই হয়তো পয়সা দিয়ে বৃন্দাবন ঘোষালের মতো জীবন্ত প্রচারপাত্র নিয়োগ করেছিলেন। করা আশ্চর্য নয়। একসময় রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগবকে পথে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে প্রহার করার ভয় দেখানো হয়েছিল। বিদ্রোহী তরুণদেরও তা করা হয়নি ব'লে মনে হয় না। পিতৃগৃহ ও পরিবার থেকে শুধু কৃষ্ণমোহন নন, দক্ষিণারঞ্জন ও আরও কয়েকজন বিতাড়িত হয়েছিলেন। তার জন্য তাঁদের যে কি দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছিল, আজকের দিনে তা কল্পনা করা যায় না। কাউকে কাউকে অসহ্য পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তুকতাক, বশীকরণ-মারণ-উচাটন প্রভৃতি যাদুকরী অস্ত্রও তরুণদের বিদ্রোহী মন শান্ত-সুস্থ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু যাদুমন্ত্রতন্ত্রও ব্যর্থ হয়েছিল।

ইয়ং ক্যালকাটার বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল তেব থেকে উনিশ বছব বয়সের তরুণদের মধ্যে যখন শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী সকলেই 'টীনএজার'

ছিলেন। কুড়ি বছর থেকে কুড়ির শেষ পর্যন্ত (প্রায়) তাঁদের এই বিদ্রোহের শিখা অনির্বাণ ছিল। তার মধ্যে অবশ্য বিদ্রোহের তীব্রতার তারতম্য হয়েছে, স্বরগ্রামেরও পরিবর্তন হয়েছে। ১৮২৮-৩৩ সালের মতো সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আর কখনও তা ওঠেনি। তরুণরা যুবক হয়েছেন, যুবকদের যৌবনও ক্রমে স্থির পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে, দেশের ও সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নতুন সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা এবং সর্বপ্রকারের বোধশক্তির বেধও বেড়েছে। যিনি একদা ছিলেন 'পাতিফিরিঙ্গি কেষ্টা বন্দ্যো' সেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক পরবর্তীকালে শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতিক্ষেত্রে দেশের অগ্রগণ্য নেতা হয়েছেন।

'ইয়ং ক্যালকাটা'র এই বিদ্রোহের সঙ্গে ইদানীন্তন কলকতার তরুণবিদ্রোহ বা ছাত্রবিদ্রোহের তফাত কি, এ প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তার উত্তর ইয়ং ক্যালকাটার বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচারের উপর নির্ভর করে। প্রথমে মনে হয় কালের ব্যবধানের কথা এবং সেই ব্যবধানের বিশালতার কথা। কালের দূরত্ব দিয়ে কেবল তার গুরুত্ব পরিমাপ করা যায় না। সমাজের অগ্রগতির দ্রুততার ধারার উপর কালের দূরত্বের গুরুত্ব নির্ভর করে। যেমন ১৮২৮-৩০ থেকে ১৯২৮-৩০ একশো বছরের ব্যবধান, ১৮২৮-৩০ থেকে ১৯২৮-৩০ মাত্র চল্লিশ বছরের। তা সত্ত্বেও শেষের চল্লিশ বছরের কালিক দূরত্ব ও গুরুত্ব আগের একশো বছরের তুলনায় অনেক বেশি। আবার আগের একশো বছরের গুরুত্ব তার আগের একহাজার বছরের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। ঐতিহাসিক কালটাকে যদি লোকোমোটিভের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে তা চলার বেগ দিয়ে বিচার করতে হয়। কালের গুরুত্ব বিশেষ ক'রে সামাজিক গুরুত্ব। শুধু বেগ বা 'ভেলসিটি' নয়, তার ত্বরণক্রমও বা 'রেট অফ অ্যাকসিলা-রেশন'ও বিশেষ বিচার্য। পাশ্চাত্ত্য সমাজে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং তৎজনিত অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনের ফলে সামাজ-জীবনে নতুন চলনশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল আঠার-উনিশ শতক থেকে। আমাদের দেশে ইংরেজদের আগমনে বাইরের সমাজ-জীবনে এই চলনশক্তি বিশেষ সঞ্চারিত হয়নি, যেটুকু হয়েছিল তা অতি সামান্য, তার বেগ বা ত্বরণ কোনোটাই ছিল না। কারণ সেই চলনশক্তির বৈজ্ঞানিক-অর্থনৈতিক উপাদানগুলিই তৈরি হয়নি এবং বিদেশী শাসকরা তাঁদের স্বার্থেই তা তৈরি হতে দেননি। তার ফলে গতিশীল পাশ্চাত্ত্য সমাজের সঙ্গে, জীবনদর্শনের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়েছিল মানসিক ক্ষেত্রে, বাস্তব সামাজিক ক্ষেত্রে নয়। এই সংযোগের প্রথম পথ খুলে দিয়েছিল কলকাতার হিন্দুকলেজের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। সমাজবিজ্ঞানী আইজেনস্টাড্‌ট তাঁর 'ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন'

গ্রন্থে বিভিন্ন দেশে যুবসমাজের বিকাশ ও ভূমিকা বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, যে-দেশে অর্থনৈতিক গতির সঙ্গে সামাজিক গতির সঙ্গতি থাকে না, সে-দেশের তরুণ ও যুবকদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় বেশি এবং বৈদেশিক শাসনাধীনে থাকলে রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর হয়। এই সব দেশের যুবসমাজ নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে স্বদেশী সমাজকে নানাদিক থেকে অনুদার ও স্থিতিশীল মনে করেন এবং পরিবারকে (ফ্যামিলি) সেই অনুদার ও অনুন্নত সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। সেইজন্য তাঁদের বিদ্রোহ মূলত 'ইন্টিলেকচুয়াল' বা বুদ্ধিপ্রণোদিত এবং তার লক্ষ্য 'সমাজ' ও 'পরিবার' দুই-ই।

ইয়ং ক্যালকাটা তরুণগোষ্ঠীর বিদ্রোহও মূলত বুদ্ধিপ্রণোদিত বিদ্রোহ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও মনীষীরা সেই বিদ্রোহের প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। প্রাথমিক ভাবসংঘাতেই তাঁদের তরুণমানসে পাশ্চাত্ত্যের যে সমাজপ্রতিমাটি ভেসে উঠেছিল, সেটি উদার উন্নতিশীল স্বাধীন যুক্তিবুদ্ধিনির্ভর ব্যক্তিকৃতিমুখী (অ্যাচিভ্‌মেণ্ট-ওরিয়েন্টেড') সমাজের প্রতিমা। হিন্দুসমাজের বহু পুরাতন মূর্তির সঙ্গে এই নতুন সমাজমূর্তির কোনো মিল কোনোদিক থেকে ছিল না। হিন্দুসমাজ ছিল কূপমণ্ডুক রক্ষণশীল ঐতিহাসিক ('ট্রেডিশানাল') ও কুলকৃতিমুখী বা 'অ্যাসক্রিপটিভ্', ব্যক্তিকৃতিমুখী নয়, উন্নতিশীলও নয়। কাজেই ইয়ং ক্যালকাটাগোষ্ঠীর বিদ্রোহের প্রথম লক্ষ্য হয়েছে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম, এবং তার সঙ্গে পরিবার। হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগ সাময়িকভাবে ঘটনাচক্রে পরিতৃপ্ত হয়েছে খৃষ্টধর্মে। আর হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিদ্বৎসভার উত্তপ্ত বিতর্কে ও পত্রিকাদির রচনায় সমস্ত আবেগ নিঃশেষ ক'রে দিয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে।

ইদানীন্তন কলকাতার তরুণদের মনে যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছে এবং যার ভয়াবহ অগ্ন্যুদ্গিরণ মধ্যে মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তার উদ্দীপনার উৎস অনেক। আজকের তরুণদের সমস্যাও বহুরকমের বিচিত্র সমস্যা। প্রথম সমস্যা, জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে—এবং তার সঙ্গে গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে—সমাজে যেমন প্রৌঢ়-বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়েছে তেমনি তরুণ ও যুবকদের সংখ্যাও দ্রুতহারে বেড়েছে ও বাড়ছে। এই বিশাল তরুণসমাজ ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে ও স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে এমন সব অচিন্ত্যনীয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যা উত্তরণের কোনো সম্ভাবনা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। যে বয়সে আশা ও কল্পনার রঙে বিশ্বভুবন রাঙিয়ে যাবার কথা, সেই বয়সে অগাধ নৈরাশ্যের অন্ধকারে তাঁদের জীবনের নিভৃত গৃহকোণটিও আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার উপর আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অতি-উৎকট আমলাতান্ত্রিক স্থূলতা যত বাড়ছে, তত যেন সমাজের গলায় বয়োবৃদ্ধদের শাসনরজ্জুর ফাঁস পড়ছে এবং সমগ্র যুবসমাজের সতেজ প্রাণ

তার মধ্যে হাঁসফাঁস করছে। অর্থাৎ বিগতযৌবন যাঁরা তাঁদের প্রাণহীন হৃদয়হীন ব্যুরোক্রাসির মধ্যে যাঁরা আগতযৌবন তাঁরা দিব্যচক্ষে আজ দেখতে পাচ্ছেন জরদ্গব ডেমক্রাসির মর্মন্তুদ অপমৃত্যু। তার উপর বৈজ্ঞানিক কারণে বার্ধক্য যত পশ্চাদপসরণ করছে তত যেন বয়োবৃদ্ধরা তাঁদের যৌবনচেতনার প্রান্তটি আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাইছেন এবং তাঁদের কর্মরাজ্যে তরুণ ও যুবকদের প্রবেশপথ রুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হচ্ছেন। ঘোর আদর্শবাদী রাজনৈতিক পার্টিই হোক আর যে-কোনো আমলাতান্ত্রিক সংস্থাই হোক সর্বত্রই দেখা যায় উপরতলায় 'জেরণ্টোক্রাসি' (বৃদ্ধতন্ত্র) কায়েম হয়ে বসেছে। এরকম বহু সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ মহারণ্যে প্রবেশ ক'রে তরুণ ও যুবকরা আজ নিষ্ক্রমণের পথ হারিয়ে ফেলেছেন। প্রত্যেকটি সমস্যার বিস্তারিত সামাজিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তাঁদের ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হবার সঙ্গত কারণ আছে। এত রকমের উদ্দীপনা সেকালের 'ইয়ং ক্যালকাটা'র বিদ্রোহের মূলে ছিল না। তাই বর্তমান কলকাতার তরুণবিদ্রোহ হিন্দুসমাজের ব্যভিচার ও বিকৃতির বিরুদ্ধে নয় শুধু, সমগ্র মানবসমাজের যুগযুগান্তের অন্যায় অবিচার ব্যভিচার ও বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

কলকাতার তরুণের মন

বিপ্লব নয় বিদ্রোহ, বিনতি নয় বিক্ষেপ হল বর্তমান কালের তরুণের ধর্ম। কেবল তরুণের নয়, মানুষের জীবনের একটা আবশ্যিক মাত্রাই হল আজকের দিনে 'বিদ্রোহ' কারণ বিদ্রোহই আজকের মানব-সমাজের ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য। 'বিপ্লব' শুরু হয় শেষ হবার জন্য, এবং যা শেষ হয় আবার তা শুরু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিপ্লব জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়, এবং যা নিভে যায় তাকে আবার জ্বালাতে হয়। মানবসমাজের ইতিহাসে বারে-বারে তাই বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে হয়েছে, কারণ বারে-বারে তা নিভে গিয়েছে। ভালো ভালো কল্পনারঞ্জিত জীবনের মডেল, চমৎকার মনোহর সমাজপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে মানুষ যুগে যুগে, বিপ্লবের পর বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। তারপর বিপ্লবান্তে বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষত পদাতিক মানুষ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখেছে তাদের সেই সুন্দর সমাজপ্রতিমার বিসর্জনযাত্রা। সমাজের মুখের উপর অঙ্গরাগের প্রলেপ পড়েছে অনেক—সেই প্রাচীন ক্রীতদাসের যুগ থেকে আধুনিক টেকনোলজিকাল সমাজের যন্ত্রদাসের যুগ পর্যন্ত—কিন্তু তাতে সমাজের ভিতরের কঙ্কালটির কদর্যতা ও বীভৎসতা একটুও বদলায়নি। বরং সমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বহিরঙ্গরাগের আধিক্যের ফলে বৃদ্ধা বিলাসিনীর মতো তার কুরূপটি যেন ক্রমে প্রকট হয়ে উঠেছে। যেমন উৎকট, তেমনি বিপকর্ষক সেই মূর্তি।

মনে হয় যেন একটি প্রকাণ্ড বোল্ডার সিসিফাসের মতো পাহাড়ের কোল থেকে চূড়ায় ঠেলে তুলছে মানুষ, অমানুষিক কষ্টভোগ ক'রে, এবং সেই চূড়া থেকে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে আবার সেই বোল্ডারটি গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের কোলে। তারপর আবার পাহাড়ের চূড়ার দিকে

চেয়ে, নতুন আশা নিয়ে, যতবার বোল্ডার তোলা হচ্ছে ততবার সেটি নিজের ভারেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়াটি হল বিপ্লব, আর পাথরের বোল্ডারটি হল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনার প্রতীক। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে বোল্ডারটির দিকে চেয়ে চেয়ে সিসিফাস কি ভাবছে? ভাবছে তার লক্ষ্য পাহাড়ের চূড়ার কথা, সিসিফাসের সংগ্রামের শেষ নেই, বিরামও নেই। কবে কোন সুদূর অতীতে সেই পেলিওলিথিক যুগে পাথুরে হাতিয়ার নিয়ে নির্দয় প্রকৃতির বনেজঙ্গলে মানুষের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, আর আজ পর্যন্ত এই অ্যাটম-অটোমেশনের যুগেও সুপারসনিক-জেট-রকেট ও শত সহস্র অটোমেটিক যন্ত্র নিয়েও তার সেই সংগ্রামের শেষ হল না। সিসিফাসের সর্বাঙ্গে বহুযুগের সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন, আপাদমস্তকে নিষ্ঠুর আঘাতের কালশিরের কালো কালো দাগ। কালো দাগগুলির দিকে চেয়ে সিসিফাস ভাবছে, তার জীবন কেবল সংগ্রাম আর ব্যর্থতা, ব্যর্থতা আর সংগ্রামের আহ্নিকচক্রে অবিশ্রান্ত চক্রমণ, এবং তার চক্রধর কোনো দেবতা বা অপদেবতা নয়, মানুষ। চূড়ার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে যারা বোল্ডার ঠেলার কথা বলেন, আজ বিংশ শতাব্দীর বার্ধক্যে, তাঁদের কথা শুনে সিসিফাসের অট্টহাসি পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত পাগলাগারদের পাগলদের সম্মিলিত অট্টহাসির চেয়েও ভয়ংকর সিসিফাসের অট্টহাসি।

বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আজ সিসিফাসের মতো। 'মানুষ' কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি। যাঁরা অ্যানথ্রোপোলজিক্যালি মানুষ তাঁদের কথা বলছি। অর্থাৎ যাঁরা 'হোমো স্যাপীয়েন্স' বা বুদ্ধিমান মানুষ, মননশীল মানুষ, কেবল 'বাইপেড ম্যামাল' বা দ্বিপদ স্তন্যপায়ী জীব নন, তাঁরা প্রত্যেকে, তাঁরা সকলে আজ সিসিফাসের মতো আদর্শের পর্বতচূড়ায় জীবনের বোল্ডার-ঠেলার ব্যর্থতার বোঝা বহন ক'রে চলেছেন। কেউ নীরবে নিঃশব্দে বহন করছেন, কেউ সরবে সশব্দে। যাঁরা নীরবে বহন করছেন তাঁরা ক্লান্তিতে অবসন্ন, সমাজ-জীবনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা শেষ হয়ে এসেছে, কারণ তাঁদের বয়স হয়েছে। তাঁরা বয়োবৃদ্ধ, তাঁদের ভবিষ্যৎ নেই। অর্থাৎ তাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু তা মৃত্যুর ভবিষ্যৎ; ভবিষ্যতে যাঁদের মৃত্যু, যাঁদের বিরতি, যাঁদের পূর্ণচ্ছেদ, তাঁরাই সিসিফাসের ব্যর্থতাচেতনা নিয়েও আজ নিষ্ক্রিয় ও নিঃশব্দ। নিষ্ক্রিয়তার অতলস্পর্শ নির্জনতায় তাঁরা বিচ্ছেদ-ব্যর্থতার চেতনায় সতত ক্লিষ্ট। আর যাঁরা বিচিত্রভোগ্য[illegible]প্রধান সমাজে (অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি) অবিকল অভিযোজিত—এবং বর্তমান সমাজে তাঁদের শ্রেণী-আয়তন বেশ বৃহৎ—যাঁরা ভোগলিপ্সার মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান, তাঁরা বুদ্ধিমান ক্ষমতাবান প্রতিভাবান যাই হোন না কেন, আসলে তাঁরা বাহাদুর

সেল্‌সম্যান। সমাজের সুপারমার্কেটে তাঁরা সর্বোচ্চমূল্যে আত্মবিক্রয়ের ধান্ধায় শশব্যস্ত। তাঁদের বিচ্ছেদবোধ নেই, ব্যর্থতাবোধও নেই, গড্ডলিকাপ্রবাহে পরম নিশ্চিন্তে সন্তরণই তাঁদের কাম্য। কিন্তু তরুণ ও যুবকদের সমস্যা স্বতন্ত্র। তরুণদের বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে এবং বর্তমান থেকে দূরভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত তরঙ্গময় জীবন আছে। তাঁরা দেখছেন বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ আরও বেশি অন্ধকার। সমাজের গড়ন এমন, ধরন এমন, চলন এমন, যে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলা তরুণদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ তাঁরা এগিয়ে চলতে চান, কারণ এগিয়ে চলাই তাঁদের বয়সের ধর্ম। কোনোদিকেই এগোবার পথ নেই, চারিদিকে ক্যাকটাস-বন, বালি আর কাঁকর। চলার মতো পথগুলিতে দ্বিপদ বনমানুষের কলরব। জ্যেষ্ঠরা সমাজটিকে একটি শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে পরিণত করেছেন। পর্বতচূড়ার হাতছানিতে তাঁরা আর প্রলুব্ধ হতে চান না, কারণ পর্বতের কন্দরে কন্দরে আজ তারা সিসিফাসের সেই বোল্ডার গড়ানোর গুরু-গম্ভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। বোল্ডার গড়িয়ে পড়ছে—ধনতন্ত্রের বিচিত্রভোগ্য সমাজে, সমাজতন্ত্রের সর্বার্থসাধক সমাজে। লণ্ডনে প্যারীতে মস্কোয় নিউইয়র্কে কলকাতায়, সর্বত্র সেই বোল্ডার গড়ানোর কর্ণভেদী শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এযুগের তরুণরা আজ সেই শব্দ শুনছেন আর অগণিত মেহনতী মানুষের (তরুণ ও যুবকরাই তার মধ্যে অন্যতম) দেহের উপর খোদাই-করা কালো কালো ক্ষতচিহ্নগুলির দিকে চেয়ে দেখছেন। বিপ্লবে আজ তাদের অনেকেরই বিশ্বাস টলায়মান, কারণ বিপ্লবের সমাপ্তি আছে, পরিণতি আছে, এবং পরিণতি মাত্রেরই পতন ও পচন আছে। আজ তাঁরা বিদ্রোহে বিশ্বাসী, চিরন্তন বিদ্রোহ—'রিভল্যুশন' নয়, 'রিবেলিয়ান'। বিদ্রোহ অনেকটাই আদর্শের আকর্ষণমুক্ত, নীতির নিগড়মুক্ত। কি হবে আদর্শ? কি হবে নীতি? কত আদর্শ, কত নীতির মহাশ্মশান পার হয়ে এসেছে সমাজ। অতএব আদর্শমুক্ত বিদ্রোহ আজকের তরুণদের জীবনের একমাত্র আদর্শ। এবং বিপ্লব? বিপ্লবও তাই। কেতাবী বিপ্লবের কথা কেদারায় বসে যে-সমস্ত কথাবিপ্লবী এতদিন বলে এসেছেন, তাঁরা আজ সংস্কারবাদ ও ব্যালটবক্স-বিপ্লবের অধিবক্তা। অতএব বিপ্লবের কৌশলও হবে নতুন কৌশল এবং লক্ষ্যও হবে তার জীবন্ত সজাগ লক্ষ্য। ধীরেসুস্থে ধৈর্য ধ'রে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে, কেতাবের নির্দেশাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে তারপর [illegible]—তা আর সম্ভব নয়, এই হল তরুণদের কথা। পক্ককেশ প্রবীণরা আ[illegible]দি তরুণদের ধৈর্য ধরতে বলেন, তাহলে তরুণেরা নিশ্চয় বলতে পারেন:

> 'We have had enough of waiting, from December to dismal December.'

অতএব আর ধৈর্য নয়। আরও ধৈর্য, আরও স্থৈর্য মানে একেবারে মৃত্যু। তরুণ ও যুবকরা আজ তাঁদের সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করছেন—

'Man's life is a cheat and disappointment ,
All things are unreal,
Unreal or disappointing. . .
All things become less real, man passes
From unreality to unreality.'

T. S. Eliot

মানুষের জীবন ফুলবাগান নয়, প্রতারণা ও নৈরাশ্যের বিকট ভাগাড়। এই ভাগাড়ে আদর্শের নামে প্রতারিত হতে, অবাস্তব থেকে বৃহত্তর অবাস্তবে যাত্রার জন্য আত্মবলিদান দিতে তরুণরা আজ নারাজ। তাই তাঁরা নৈরাজ্যের পথযাত্রী।

বর্তমান কালে তরুণদের সংখ্যা অতিদ্রুত বাড়ছে, এমনকি তারুণ্যেরও গতি বাড়ছে। 'তারুণ্য' বলতে অবশ্য 'অ্যাডোলিসেন্স' বা বয়ঃসন্ধির কথা বলছি। জনসংখ্যার বহুপ্রচারিত বিস্ফোরণের কথা আজ আর কারও অজানা নেই। সপ্তদশ শতকের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৫০ কোটির মতো, প্রায় বর্তমান ভারতের জনসংখ্যার সমান। ১৯২০ সালে এই জনসংখ্যা হয় প্রায় ২০০ কোটি। অর্থাৎ ১৬৫০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা দু'বার দ্বিগুণ হয়, প্রথম দ্বিগুণ হয় দুশো বছরে, দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ হয় সত্তর বছরের মধ্যে। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই জনসংখ্যাও দ্বিগুণ হবার কথা, অর্থাৎ ৪০০ কোটি। সংখ্যাবৃদ্ধির হারের দ্রুততা পরে আরও বাড়বার কথা। বর্তমান শতাব্দী বিদায় নেবার আগে আনুমানিক ৬০০ কোটি মানুষের পদধ্বনি শোনা যাবে পৃথিবীতে, এবং সে-ভার ধরিত্রীর পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে কিনা বলা যায় না। তার কারণ, ধরিত্রীর মোট পৃষ্ঠায়তন ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল এবং তার চারভাগের তিনভাগই অথৈ জল। বাকি একভাগ, অর্থাৎ একচতুর্থাংশ স্থল মাটি, ঠিক মাটি নয়—ভূভাগ। তার অর্ধেক অংশে এত প্রচণ্ড হিম, অথবা উত্তাপ যে তা চাষ-আবাদের অযোগ্য। বাকি থাকে ধরিত্রীর আটভাগের একভাগ। তার চারভাগের একভাগ পাহাড়পর্বত অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, মানুষের বসবাস শহর নগর কলকারখানা ইত্যাদির জন্য চাষের যোগ্য নয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই সামান্য ভাগটুকুও ক্রমে কমতে থাকবে এবং তার ফলে খাদ্যউৎপাদন ও সংস্থানই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতা শহরের উত্তর-দক্ষিণ-পুবে কত হাজার বর্গমাইল চাষের জমি গত তিরিশ বছরের মধ্যে জনবসতি গ্রাস

করেছে, শুধু তার হিসেব করলেই এ সমস্যার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আপাতত এ সমস্যার বিচার আমরা করব না, আমাদের সমস্যা তরুণদের সমস্যা।

তরুণদের সংখ্যা যেমন দ্রুতবর্ধমান, মোট জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অনুপাতে, তেমনি তারুণ্যের গতিও দ্রুতসঞ্চারী। ইউনেস্কোর যুবসংস্থার একটি রিপোর্টে প্রায় দশবছর আগে (১৯৫৯) বলা হয়েছে যে আজকের দিনে তরুণ ও যুবকরা বয়সের দিক থেকে অনেক আগেই তারুণ্য ও যৌবনে পদার্পণ করে, এবং মাত্র সাত-আট বছরের বয়সের ব্যবধানে আগেকার দিনের একপুরুষের অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। কলকাতা শহরেই দেখা যায়, মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নানা বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করেন। সেই বিষয়টি হল—ছেলেমেয়েদের অকালতারুণ্য। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে 'কী পাকা ছেলে, কী পাকা মেয়ে!' এই ধরনের বিস্ময়োক্তি কান পাতলেই শোনা যায়। বারো-তেরো বছরের মেয়ে, ফ্রক পরে (হতে পারে 'মিনি-স্কার্ট'), ক্রিকেট থেকে 'কালচারাল রিভল্যুশন' কণ্ঠস্থ, ডাইরীতে অসংখ্য টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা (কাদের তা কে জানে!), দৃপ্তভঙ্গিতে লক্কা-পায়রার মতো স্কার্ট ঘুরিয়ে চলে, খিলখিল ক'রে হাসে, কলকল ক'রে কথা বলে।

ইয়োরোপের শীতপ্রধান প্রাকৃতিক পরিবেশে তারুণ্যের এই আঙ্গিক উদ্গমে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে আমাদের ট্রপিক্যাল দেশের সমাজে। আর ইউরোপেই যখন অকালতারুণ্যের জৈবিক ও সামাজিক ফলাফল এখনও বিশেষ কেউ চিন্তা করছেন না, তখন মারাত্মক সামাজিক বিপর্যয় ব্যাপকভাবে ঘটবার আগে আমাদের দেশে যে এ বিষয়ে কেউ চিন্তা করবেন তা মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রসূতিসেবা, শিশুপালন ও ডায়েট-চেতনা, যে-কারণেই এই অকালতারুণ্য দেহ-মনে আবির্ভূত হোক না কেন, এবং জৈবিক ও সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই বা না হই, এটা যে এ যুগের সমাজের একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের সমাজে এই অকালতরুণদের সমস্যা আরও একটি কারণে জটিল হয়েছে ও হচ্ছে। এই কারণটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনো চেতনার লক্ষণও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। কারণটি হল, তিরিশ-চল্লিশ বছরের মা-বাবাদের সন্তানদের প্রতি আদরের একটা আদেখ্‌লেমি, গ্রাম্য বাংলায় যাকে বলে আদিখ্যেতা। এই সন্তান-আদিখ্যেতাকে আজকাল মা-বাবারা আধুনিকতা ও কালচারের নিদর্শন ব'লে মনে করেন। ড্রয়িংরুমে কিছু কারুশিল্পের নমুনা এবং দু'একটা

পটু ক্যাকটাস না থাকলে যেমন আধুনিক মুদ্রাস্ফীতিপ্রসূত মধ্যবিত্তের একাংশের রুচি ও কালচারের দ্যুতি ঠিকরোয় না, তেমনি ছেলেমেয়েদের 'ড্যাডি-মামি টা-টা' ডাক না শুনলে তাঁরা সেই কালচারের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। এই সন্তান-আদরের আদেখ্‌লেমি আধুনিক ইংরেজোত্তর ভদ্রলোকদের একটা বিশিষ্ট 'কালচার-ট্রেট'। তরুণ বয়সেও তাই ছেলেমেয়েরা 'খোকা-তরুণ' ও 'খুকু-তরুণী' হয়ে থাকে এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি সমান নয় ভেবে মা-বাবারা নিশ্চিন্ত থাকেন। অতঃপর হঠাৎ একদিন এই নিশ্চিন্ততা ভাঙে, যখন তারুণ্যের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এ-হেন উদার পরিবারের সামান্য বন্ধনটুকুও মানতে চায় না এবং যে-কোনো প্রভুত্ব ও শাসন উপেক্ষা করতে চায়। তরুণবিদ্রোহ প্রথমে গৃহের ড্যাডি-মামিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ হয়, তারপর তার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় গৃহ থেকে স্কুল-কলেজে এবং সেখান থেকে বৃহত্তর সমাজে।

অকালতারুণ্য শুধু যুগসত্য নয়, জৈবিক সত্য। শুধু দেহের সঙ্গে নয়, মনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারুণ্য কখনও মন বাদ দিয়ে শুধু অঙ্গ রেখায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। তরুণমনের এই পরিপুষ্টি সম্বন্ধে ইদানীং জ্যেষ্ঠদের ঔদাস্য—অনেকটাই সজ্ঞান ঔদাস্য—সমাজ-জীবনে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই তার স্বরূপ বোঝা যাবে। দৃষ্টান্তটি লেখকের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ। কলকাতা শহরের কয়েকজন পরিচিত ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে শুনেছি, তরুণদের মধ্যে রেজেস্ট্রি-বিবাহের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং অধিকাংশ বিবাহই পরিবারের আড়ালে হচ্ছে। পাত্রীদের মধ্যে টীনএজারই বেশি, পাত্রদের বয়স কুড়ির গোড়ার দিকে।

এটি একটিমাত্র দৃষ্টান্ত, যে-তরুণরা কতকটা স্বাভাবিক পথে চলতে চান তাঁদের কথা। কিন্তু সকলের সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশ একরকম নয়। ইংলণ্ডের তরুণসমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে মাসগ্রোভ (এফ. মাসগ্রোভ) যা দেখেছেন তা এই :

'টীনএজ' বয়সে	সম্মতি আছে	অনিশ্চিত	সম্মতি নেই
বিবাহ করা	১৪·৭%	১২·৪%	৭২·৯%
স্বাধীন জীবনযাপনের পক্ষে	৮০·৪%	৪·৯%	১৪·৭%

'টীনএজ' বয়সে (১৩ থেকে ১৯ বছর) বিবাহ করতে ইচ্ছুক ('অনিশ্চিত'দের নিয়ে) তরুণের সংখ্যা ইংলণ্ডেও অল্প নয়, প্রায় চারভাগের একভাগ। যাঁদের

সম্মতি নেই তাঁদের যে ইচ্ছা নেই, এমন কথা বলা যায় না। অসম্মতির কারণ অর্থনৈতিক ও বর্তমান সমাজে পারিবারিক জীবনের ভীতি হওয়াই সম্ভব, প্রকৃত অনিচ্ছা নয়। স্বাতন্ত্র্য তরুণমাত্রেরই কাম্য, কাজেই স্বাতন্ত্র্যপন্থীর সংখ্যা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের পথ অনেক, অন্ধকার চোরাগলি থেকে মুক্ত রাজপথ পর্যন্ত সর্বত্র তরুণদের পদধ্বনি শোনা যেতে পারে, এবং শোনা যায়ও। তার কারণ আগে বলেছি, সকল তরুণের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশ একরকম নয় এবং স্বাতন্ত্র্যের পথ নির্বাচিত হয় এই পরিবেশের নিষ্পেষণে। সকলে ক্রোধান্ধ 'অ্যাংরি ইয়ংমেন' নন—

> They are not angry youngmen. They want to find their own niche in society as good and respectable citizens, to be a good husband, a good father, and a good friend and neighbour.

তরুণসমস্যাসন্ধানী একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, ফাভিল্যাণ্ড ৎসুইগ, এই কথা বলেছেন। কথাটা লণ্ডনের তরুণদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, কলকাতার তরুণদের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। যদি কেউ বন্ধুর মতো তরুণদের সঙ্গে মিশতে পারেন, নানা বিষয়ে বেশ জমাট আড্ডার মতো কথাবার্তা বলতে পারেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন, ৎসুইগের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। এবং কথাটা তরুণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য, মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্য। কোনো দেশের মেয়েরাই নোঙরহীন জীবন কাটাতে চায় না, সমাজের পাঁক গায়ে মেখে নালা নর্দমায় ভেসে বেড়াতে চায় না, ঘর বাঁধতে চায়, সংসার করতে চায়। কিন্তু তবু আজ বেশ বড় একদল তরুণ মেয়েদের, টীনএজারদের পর্যন্ত, কলকাতা শহরেও তাই করতে হচ্ছে। কেউ কেউ জীবনের এদিকটাকে মনে করেন 'ফান্', অর্থাৎ দু'দণ্ডের রঙ্গ, এবং রঙ্গ করা তাঁদের কাছে 'অ্যা-মর্যাল' নীতিনিরপেক্ষ ব্যাপার। তাঁরা হয়তো 'ফান্ ফর দি সেক অফ ফান্' মনে করেই করেন। কিন্তু বেশির ভাগ করেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং নাগরিক সমাজের নামগোত্রহীন পরিবেশে তা করার ঝুঁকি অনেক কম মনে ক'রে অনেকে মেট্রোপলিটন-কলকাতার দূরপ্রান্ত থেকে শহর-কলকাতায় আসেন, কিছু উপার্জন ক'রে আবার ঘরে ফিরে যান। তাঁদের কাছে এটা রঙ্গ নয়, প্রয়োজন, প্রাত্যহিক জীবনধারণ ও পরিবার প্রতিপালনের প্রয়োজন। উন্মার্গ তরুণদের সম্বন্ধে তাই ফাইভেল লিখেছেন—

> ...the experience of social workers points to the conclusion that the Teddy boys include a majority of insecure youngsters from bad and broken homes...more than half came from family backgrounds which were 'absolute hell'; another quarter from homes which looked superficially all right but probably were not; while less than a quarter came from genuinely adequate homes.

এ হল লণ্ডনের সমাজের কথা। আমেরিকার 'অ্যাফ্লুয়েন্ট' সমাজে এ-সমস্যা আরও বেশি ভয়াবহ। কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী ও দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনযাত্রার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে—বিদেশী ট্যুরিস্ট বা প্রেস-রিপোর্টারের তড়িংঘড়ি পরিচয় নয়—জীবনের দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধসহ বহুমুখী অন্তরঙ্গ পরিচয়—তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে বিশ্রী বিবর্ণ ও বিচূর্ণ গৃহ-পরিবারের সংখ্যা এখানে বহুগুণ বেশি, এবং 'ইনসিকিওর ইয়ংস্টার'দের সমস্যাও সেজন্য এখানে বহুগুণ জটিল। কলকাতা ও তার প্রসার্যমাণ 'মেট্রোপলিটন কম্‌প্লেক্স'-এর কথা বলছি। একে অকালতারুণ্যের সমস্যা, তার উপর তরুণ ছেলেমেয়েদের স্থানাভাবে গৃহবাসের সমস্যা। একটি ১০০।১২০ বর্গফুট শয়নঘর, তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, তাঁদের কিশোর ছেলেমেয়ে এবং কয়েকটি শিশু, অতিরিক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও একজন থাকতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের একটু 'প্রাইভেসি' বা নির্জনতা প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় নির্জনতা? সমস্ত মিলিয়ে কলকাতার বিশাল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ ছেলেমেয়েদেব গৃহ যেন একটা জ্বলন্ত জৈবিক নরককুণ্ড, পুরাণোক্ত নরক-বর্ণনাতেও তার বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় না।

বসবাস-সংকট নয় শুধু, আজকের তরুণদের জীবনে তার চেয়েও মর্মান্তিক সংকট হল পিতৃমাতৃস্নেহ-সংকট। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের জীবন বর্তমান সমাজে পিতৃমাতৃত্বেব নিবিড় সান্নিধ্য ও স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। পাশ্চাত্ত্য সমাজবিদরা একে 'পেরেণ্টাল ডিপ্রাইভেশন'-এর সমস্যা বলেছেন। বিশেষ ক'রে মাতৃস্নেহের উপরেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। গৃহের আকর্ষণ প্রধানত মাতৃকেন্দ্রিক। সেই মা যদি দিনের প্রথম প্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে কর্মব্যস্ত থাকেন এবং সন্ধ্যায় দারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন তাহলে তাঁর পক্ষে মাতৃত্বের প্রাথমিক কর্তব্যও পালন করা সম্ভব হয় না। অথচ শিল্পোন্নত পাশ্চাত্ত্য সমাজে 'ওয়ার্কিং' স্ত্রী ও মায়েদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, কেবল যে আর্থিক অভাবমোচনের জন্য তা নয়, জীবনযাত্রার ক্রমোন্নত স্তরে পৌছনোর জন্য। আফিসের মায়েরা কখনও পরিবারের সন্তানদের কাছে আদর্শ মা হতে পারেন না, যেমন ওয়ার্কিং স্ত্রীদের পক্ষেও স্বামীর কাছে আদর্শ স্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়াও পরিবারের বাইরে কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী ও মায়েদের জীবনে যেসব নতুন সমস্যা দেখা দেয়, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনই করছি না। আমাদের মতো শিল্পানুন্নত সমাজে প্রধানত পারিবারিক বাজেট টেনেটুনে ব্যালান্স করার জন্যই অধিকাংশ স্ত্রী ও মায়েদের বাইরের কর্মজীবনে পরিবার ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু সকলে তার জন্য যান না। মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার স্তর ও মান, ভদ্রলোকত্বের উপকরণের বৈচিত্র্য এবং মেয়েদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্রমবিস্তারের ফলে স্ত্রী ও মায়েরা

আজ গৃহকোণে বন্দী হয়ে শুধু স্বামীমুখাপেক্ষী গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে নারাজ।

যূথ-জনকৃষ্টির প্রভাব কলকাতার সমাজেও মধ্যবিত্তের উচ্চস্তরে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ক্লাব পার্টি সভা সিনেমা শপিং ইত্যাদি একশ্রেণীর মহিলাদের কাছে গৃহের চেয়ে বেশি আকর্ষণপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তাঁরা মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের বোঝা আগেকার মতো প্রসন্নচিত্তে, অথবা একাকী, আর বহন করতে চাইছেন না। শুধু গৃহকোণে বসে জীবনের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁরা অনিচ্ছুক, বাইরের কাফে-অ্যাসোসিয়েশন-টি-রুমের পেয়ালার নতুন স্বাদ তাঁরা পেয়েছেন। কাজেই একালের তরুণদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ হল পিতৃত্ব মাতৃত্ব দু'য়েরই, বিশেষ ক'রে মাতৃত্বের, প্রত্যক্ষ গভীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়া। শ্রেণীভেদে কারণভেদ আছে, কিন্তু তার সামাজিক ফলাফল একই। ফলাফল হল, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু পারিবারিক গৃহকোণ থেকে আজকের তরুণরা বিচ্যুত, সামাজিক শক্তির আবর্তাঘাতে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত। আর্থিক অনটনের জন্য যাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক গৃহবাস মা-বাবার কাছেই প্রায় অবাঞ্ছনীয়, পরিবার থেকে মানসিক বিচ্যুতির সঙ্গে তাঁদের অনেকটা দৈহিক বিচ্যুতিও ঘটে। মানসিক বিচ্যুতির হাত থেকে মনে হয় শ্রেণী-নির্বিশেষে এযুগের কোনো তরুণেরই মুক্তি নেই। গৃহকোণ থেকে নির্বাসিত তরুণরা বাইরের সমাজে নানারকমের 'কোণ' বা কর্নার খুঁজে বেড়ান, কফিহাউসের কোণ থেকে রাস্তার কোণ। সমাজের চারিদিকে মৌচাকের মতো তরুণদের বিচিত্র 'ডেন' ও 'কর্নার' গজিয়ে ওঠে। এই সমস্ত 'ডেন' ও 'কর্নারে'র বৈচিত্র্য নির্ভর করে তরুণদের সামাজিক শ্রেণীগত শিক্ষাগত পারিবারিক নরক-যন্ত্রণাগত ও বিচ্ছেদচেতনাগত পার্থক্যের উপর। কলকাতার সমাজে তরুণদের মধ্যে 'ড্রিফটার'-দের সংখ্যাই তাই বেশি দেখা যায়। 'ড্রিফ্‌টা'র কারা? ফাইভেল বলেছেন—

> They are boys and girls who appear adrift, without apparent direction in life, or recognizable moral standards, rejecting all authority, living only for the immediate gratification of desire and the search for security in the mob.

'ড্রিফ্‌টার' তাদের বলা যায়, যাদের জীবনের গতি আছে কিন্তু গন্তব্য নেই, যারা কারও কোনো প্রভুত্ব মানতে চায় না, কোনো নীতি-মানের মর্যাদা দিতে চায় না, নিজেদের খেয়ালখুশির তৎক্ষণাৎ চরিতার্থতা যাদের লক্ষ্য এবং যারা জনতার স্থূলতার মধ্যে সাময়িক আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার সন্ধান করে। সমাজের জীবনতরঙ্গে গন্তব্যহীন ভেলার মতো তারা ভাসমান।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তরুণদের নানারকমের সমস্যা আছে এবং ছাত্র-আন্দোলন সেইসব বিশেষ সমস্যার সমাধানকল্পে গ'ড়ে ওঠে।

শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকর্তাদের মনোভাবের আমূল সংস্কার ভিন্ন ছাত্রসমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু আপাতত আমাদের বিচার্য বিষয় তা নয়। এই প্রসঙ্গে, অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাসংকট প্রসঙ্গে, এযুগের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি এখানে, শুধু বিষয়টির গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য। ম্যানহাইম বলেছেন যে, এযুগের শিক্ষা হল প্রধানত 'স্পেশালিস্ট এডুকেশন', ম্যাজিকের যুগের 'চ্যারিস্ম্যাটিক এডুকেশন' অথবা তার পরবর্তীকালের 'এডুকেশন ফর কালচার'-এর সঙ্গে তার পার্থক্য মূলগত। 'স্পেশালিস্ট' শিক্ষার ফলে সমাজযন্ত্রের নাট-বল্টু-স্ক্রু-হুইল-পিস্টন তৈরি হয় বিদ্যালয়ের কারখানায়, মানুষ তৈরি হয় না। বিদ্বান-বুদ্ধিমানদের যন্ত্রবোধ বৃদ্ধি পায়, সমাজচেতনা ও মানববোধ লুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান ব্যুরোক্রাটিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকদের কার্যকলাপ, এবং স্পেশালিস্টদের নিয়ে গঠিত শত শত তদন্ত-কমিটি-কমিশনের লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টের সামাজিক অনুপযোগিতা ও ব্যর্থতা, এই যান্ত্রিক শিক্ষাদর্শেরই শোচনীয় পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ যত যান্ত্রিক ক্ষেত্রে অটোমেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তত অটোমেশনের আবির্ভাব হচ্ছে, তার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কেরও পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ বিদ্যালয় যদি সমাজযন্ত্র চালু রাখার জন্য মানুষের কলকবজা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়, তাহলে সেই যন্ত্রের অঙ্গবিশেষ শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কও হয় যান্ত্রিক। যান্ত্রিক সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্থান নেই, বড়-ছোট ভেদ নেই। তাই ছাত্র-আন্দোলনে ও ছাত্রবিদ্রোহে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায় না। ছোট ছোট যন্ত্ররা বড় বড় যন্ত্রের ভয়াল ব্যাদানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তরুণরা তো যন্ত্র হতে চান না, অথচ শিক্ষকদের কাছে শিক্ষায়তনের কাউন্টিতে অনবরত তাঁদের মাথা ও মেধার উপরে অটোমেটিক হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। তরুণ ছাত্রদের মনে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হতে থাকে—শিক্ষানীতির যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, শিক্ষক-ছাত্রের যান্ত্রিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে, কমার্শিয়াল প্যাকেজতুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তঃসারশূন্য বিদ্যার মার্কার বিরুদ্ধে। তাঁরা বুঝতে পারেন, যেমন বিকৃত সমাজ তেমনি বিকৃত তার শিক্ষাব্যবস্থা। এই ধূমায়িত অসন্তোষের বিস্ফোরণ হয় ছাত্রবিদ্রোহে। পরিবার থেকে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সবই বৃহৎ সমাজযন্ত্রের ছাঁচে তৈরি বলে সেগুলি সমূলে উৎপাটনের সংকল্পও সেই বিদ্রোহে ঘোষিত হয়। সাম্প্রতিক ফরাসী ছাত্র-বিদ্রোহে এই বিকৃত সমাজযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভই প্রকাশ পেয়েছে, শুধু শিক্ষানীতি বা শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। সমগ্র তরুণসমাজের বিদ্রোহ থেকে ছাত্রবিদ্রোহ তাই বিচ্ছিন্ন নয় এবং তার উদ্দীপনারও পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সমাজের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে যুব-আন্দোলনের সমস্ত মানবিক আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে আজ যুবকদের জন্য নয়, প্রবীণদের দুর্বুদ্ধির দৌরাত্ম্যের জন্য। বিশ্বতরুণের দৃষ্টিপথে আজ আর কোনো আদর্শের মিনার নেই। কোনো পর্বতশৃঙ্গে তাঁরা আর আদর্শের বোল্ডার ঠেলে তুলতে চান না, কারণ সিসিফাসের মতো তাঁদের কানে আজ অহরহ সেই বোল্ডার গড়িয়ে পড়ার গুমগুম শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

"কোথায় তুমি? তুমি তো সর্বক্ষণ এখানে থাকতে! কথার উত্তরে বলতে 'এই তো, এখানে আমি আছি!' এখন কোথায় তুমি? কোনো কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোথায় সেই ছোটখাটো বৃদ্ধ লোকটি, যার নাম ভগবান? কেন সকলে চুপ করে আছে, কোনো কথার উত্তর দিচ্ছে না? কেন?"

তরুণ জার্মান নাট্যকার বোরশার্ট-এর 'অ্যাট দি ফ্রণ্ট ডোর' নাটকের ডায়েলগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন তাঁর বয়স ২৪ বছর, তার অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে যান—

> We are the generation without ties, without any horizon.
> Our horizon is an abyss. We are the generation without happiness, without a mother country, without a farewell· · ·
> Our sun is meagre, our loves are cruel and our youth has no youth.
> 'Now we can cry, we can sing whenever we want.'

শিল্পী বোরশার্ট এই ঘোষণাপত্রটি, মনে হয় যেন, সারা পৃথিবীর তরুণদের জন্য রচনা ক'রে গিয়েছেন। কলকাতার তরুণ, বার্লিনের তরুণ, প্রাগের তরুণ, প্যারীর তরুণ, ওয়াশিংটনের তরুণ, লণ্ডনের তরুণ, সকলের মর্মস্থল থেকে উৎসারিত এই ঘোষণা: 'আমাদের কোনো বন্ধন নেই, কোনো দিগন্ত নেই।... আমাদের দেশ নেই, আমাদের বিদায়কালীন বেদনা নেই। আমাদের সূর্য নিষ্প্রভ, আমাদের প্রেম-ভালোবাসা নিষ্ঠুর এবং আমাদের যৌবনের যৌবন নেই। এখন আমরা যখন ইচ্ছা চিৎকার করতে পারি...গানও করতে পারি।'

কেন এই ঘোষণা? কারণ 'প্লেগ ও পাথর ও অন্ধকার' (ক্যামুর ভাষায়: 'দি প্লেগ') তাদের বহুযুগের বহু ঘোষণা স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে। সারা পৃথিবীর প্রবীণ ও প্রাজ্ঞরা সকলে মিলে যদি আজ শোভাযাত্রা ক'রে যান এবং পথের কোনো বিদ্রোহী তরুণকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: 'তোমার সামনে বিস্তৃত ভবিষ্যৎ, তবু কেন তোমার মুখে এই সর্বনাশা বুলি?' তাহলে সেই হতভাগ্য হিউম্যানিস্টের মতো (সার্ত্র-এর 'দি নসিয়া') সে জবাব দেবে—

> I shall lean against a wall and as they go I shall shout to them: 'What have you done with your science? What have you done with your humanism? Where is your dignity as a thinking reed?

এই প্রশ্নগুলির কোনো জবাব আছে কি? গতানুগতিক জবাব অবশ্যই আছে। যেমন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্বের ক্যাটালগ স্কুলের ছাত্রেরও মুখস্থ আছে এবং সেই ক্যাটালগ আবৃত্তি ক'রে বলা যায়, বিজ্ঞান কি করেছে না-করেছে। আর হিউম্যানিস্ট ও চিন্তাশীল জীব হিসেবে মানুষের বিচিত্র কীর্তির কাহিনী দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় দফ্তরের রেকর্ডরুমে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানেব রূপকথা, হিউম্যানিজমের ডেফিনিশন, এসব মুখস্থ করেও তরুণরা স্বপ্ন দেখেন—বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন, বিকলাঙ্গ হিউম্যানিজমের দুঃস্বপ্ন। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন, যা দেখলে ঘুমের ঘোরে বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং ঘুমন্ত মানুষ বুকচাপা যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে। তরুণরা এই সব দুঃস্বপ্ন দেখেন আজকাল। ইউরোপেব তরুণরা যদি এই দুঃস্বপ্ন দেখেন তাহলে কলকাতার তরুণবা যে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে কালো-কালো রাতগুলো কাটিয়ে দেন তা মনে হয় না। কারণ ভিয়েৎনাম কলকাতা থেকে অনেক কাছে এবং ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের 'ফান্' ও গান হল :

> **Strafe the town and kill the people,**
> **Drop naplam in the square......**

এ গানের ধ্বনিতরঙ্গ কলকাতাতেই আগে ভেসে আসে। কলকাতার বিদ্রোহী তরুণও তাই পথের ধারে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবীণ প্রাজ্ঞদেব দিকে চেয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে বলতে পারেন—'তোমাদের বিজ্ঞান, তোমাদের টেকনোলজি নিয়ে এ কী দানবের রাজ্য তৈবি করেছ?' পশুব রাজ্য নয়, দানবের রাজ্য, কারণ পশুসমাজও বতমান মানবসমাজের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ, শান্ত ও বাসযোগ্য। শুধু দানবেব সমাজ নয়, আজকের উন্নত ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিকাল সমাজ নতুন এক ক্রীতদাসের সমাজ গড়ে তুলেছে। দার্শনিক হারবার্ট মারকুসে এই নতুন ক্রীতদাস-সমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে লিখেছেন (*One Dimensionel Man* এবং *An Essay on Liberation* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)—

> **With technical progress...unfreedom—in the sense of man's subjection to his productive apparatus—is perpetuated and intensified in the form of many liberties and comforts...The slaves of developed industrial civilization are sublimated slaves, but they are slaves, for slavery is determined...This is the pure form of servitude : to exist as an instrument, as a thing.**

এই হল শিল্পসমৃদ্ধ বিজ্ঞানোন্নত ভোগ্যপণ্যবহুল সমাজের নয়াগোলামির রূপ। গোলমরা সব উঁচুদরের উর্ধ্বলোকের গোলাম, আগেকার কালের গোলামদের মতো তাঁদের হাত-পায়ের ডাণ্ডাবেড়ি দেখা যায় না। তাঁদের 'স্টেটাস' আছে, 'কমফর্ট' আছে, 'লিবার্টি' আছে। তাঁরা নানাশ্রেণীর

ব্যুরোক্রাট টেকনোক্রাট ম্যানেজার ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার সেলস-প্রমোটার বা 'অ্যাড-মেন'—যাঁরা যন্ত্রের মতো সমাজটাকে চালাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ভোগস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার একটা লোভনীয় মরীচিকা সৃষ্টি করছেন তাঁরা সাধারণ মানুষের সামনে এবং দিনের পর দিন বিজ্ঞাপনের শতকৌশলে নেশার পিল খাইয়ে সেই ভোগস্বাধীনতার স্বপ্নে তাদের মশগুল ক'রে রাখছেন।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রময় সমাজের এই হল বর্তমান রূপ। ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। দূরদর্শী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা এর মধ্যে বহুবার সমাজনায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের মানবসভ্যতার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

পদার্থবিদ্ ও রসায়নবিদ্দের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, নিউক্লিয়ার ফল্আউট, ডেটারজেন্ট, ইনসেকটিসাইড ইত্যাদি যে পরিমাণে পৃথিবীর আলোবাতাসজল বিষিয়ে তুলছে তাতে আর কিছুদিন এরকম চলতে থাকলে 'শ্রেষ্ঠ' ম্যামাল মনুষ্যজাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের অন্যতম মূলসূত্র হল, এক-একটা জিওলজিক্যাল যুগে যে-হাতিয়ারের শক্তিতে যে-জীবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই হাতিয়ারই হয়েছে সেই প্রধান জীবের ধ্বংসের কারণ। 'মানুষ' ম্যামালিয়ান যুগের শ্রেষ্ঠ জীব এবং জীবজগতে মানুষের অর্থাৎ বাইপেড ম্যামালের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাধান্যের হাতিয়ার হল 'বুদ্ধি' (ইন্টেলিজেন্স), তাই মানুষের নৃতাত্ত্বিক নাম 'হোমো স্যাপীয়েন্স' বা 'বুদ্ধিমান মানুষ'। আশ্চর্য হল, এই বুদ্ধির হাতিয়ারই আজ আমাদের বিলুপ্তিকে আসন্ন ক'রে তুলেছে। বুদ্ধি দিয়ে আজ আমরা প্রকৃতির মৌল উপাদান পরমাণুর শক্তি নিষ্কাশন করেছি এবং সেই শক্তি দিয়ে সর্বাত্মক ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়েছি ও হচ্ছি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের সূত্রে অনুযায়ী পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে আমাদের বিদায় নেবার সময় হয়েছে, একথা বললে নৈরাশ্যবাদ প্রচার করা হয় না, বিজ্ঞানেরও অপমান করা হয় না। মানবসমাজের ভবিষ্যৎ যে ভয়াবহ, মহাশ্মশানের চেয়েও ভয়াবহ, একথা বৈজ্ঞানিক সত্য কথা, বর্তমান সমাজের সেল্সম্যানদের বিজ্ঞাপনের মনভোলানো কথার মতো মিথ্যা নয়।

সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফার্ডিন্যাণ্ড ৎস্বইগ তরুণ ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের ধারণা কি? তেইশজন ছাত্র গম্ভীর নৈরাশ্যবাদী মত প্রকাশ করেছিলেন, তেরজনের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ছিল, তেষট্টিজন ছিলেন আশাবাদী। ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার ছাত্ররা সকলেই প্রায় নৈরাশ্যবাদী। উল্লেখ্য হল, যাঁরা আশাবাদী তাঁরা বলেছিলেন যে এ-সমাজে বাঁচাই সম্ভব নয়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো আশা পোষণ না করলে। অর্থাৎ তাঁরা ভয়ে এবং অনেকটা কোনোরকমে বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে আশাবাদী।

এই হল সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি। সমাজে যাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই আছে—অন্তত থাকা উচিত—তাঁরাই তরুণ। বর্তমান হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিক্যাল যুগের নয়া-গোলামতন্ত্রের বর্তমান। ধনতান্ত্রিক হোক, গণতান্ত্রিক হোক, সমাজতান্ত্রিক হোক, সকল সমাজের বর্তমানের একই জীবনের গতি এবং সকল 'তন্ত্রে'র উপরে সবচেয়ে বড় সত্য গোলামতন্ত্র। নিছক যন্ত্র, বা পণ্য, বা নিরেট বস্তু হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া এই গোলামতন্ত্রে বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই। মানবসমাজের ইতিহাসে এইটাই হল দাসত্বের চরম পর্যায়, কারণ মিথ্যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ভোগস্বাচ্ছন্দ্যের মোহে এই দাসত্বচেতনা আচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ নিরাকার অন্ধকার ও ভয়ংকর। বর্তমানের বুকের উপর বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বিপুল আশা ও বিশ্বাস নিয়ে, দেহ-মনের পরিপূর্ণ কর্মশক্তি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দিয়ে, যাঁরা সমাজের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখবেন এবং জীবনের পথে নির্ভীক যোদ্ধার মতো এগিয়ে চলবেন, তাঁরা দেশের তরুণসমাজ। কিন্তু ভবিষ্যতের কোনো রেখাচিত্র, ইমেজ বা মডেল তরুণদের দৃষ্টিপথে আজ নেই। বহুযুগের বহু স্বর্ণকান্তি ভবিষ্যতের শিলীভূত বোল্ডার পর্বতচূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন। বর্তমানের যান্ত্রিক গোলামতন্ত্রের মোহবৈচিত্র্য ঐন্দ্রজালিক হলেও, তার কাছে তরুণের মন আত্মসমর্পণ করতে চায় না। সমাজবিজ্ঞানীরাও আজ আত্ম-প্রতারণা না ক'রে, অথবা মিথ্যা বাগ্‌জাল বিস্তার না ক'রে, ভবিষ্যৎ সমাজের কোনো সম্ভাব্য বাস্তব মূর্তি তরুণদের সামনে প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম। হারবার্ট মারকুসের ভাষায় বলা যায়—

> The critical theory of society possesses no concepts which could bridge the gap between the present and its future : holding no success, it remains negative. Thus it wants to remain loyal to those who, without hope, have given and give their life to the Great Refusal.

তরুণের মন আজ এই বিরাট না-ধর্মী মন। না-না-না এই তাঁদের ধ্বনি। ধনতান্ত্রিক সমাজযন্ত্রের বিরুদ্ধে 'না', রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে 'না', শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে 'না', যান্ত্রিক দাসত্বের বিরুদ্ধে 'না', প্রকৃতি ও মানুষের যান্ত্রিক বিকৃতি ও বীভৎসতার বিরুদ্ধে 'না'। আপাতত তরুণের মনের কোনো হাঁ-ধর্মী ভাবান্তরের কোনো আশা নেই। এরই নাম 'রিবেলিয়ান', 'রিফুউজাল', 'বিদ্রোহ'—আজকের তরুণের ও চিন্তাশীল মানুষের যা একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। বোধ হয় চিরকালই তাই তরুণের মন ও মননশীল মানুষের মন বিদ্রোহী। আজকের মন শতগুণ বেশি বিদ্রোহী। তাই তার না-ধ্বনির রূঢ়তা এত উগ্র। বিদ্রোহের সুরে বিশ্বতরুণের মনের সঙ্গে কলকাতার তরুণের মন একতন্ত্রীতে বাঁধা, এবং সেখানে শুধু না-না আর না-এর সুতীব্র ঝংকার।

কলকাতার স্ট্রীটকর্নার গ্যাং

কলকাতার কলাবাগান থেকে বামবাগান, চলন্ত লোকাল ট্রেনের কামরা থেকে বক ফুটপাথ স্ট্রীটকর্নার, সর্বত্র চলমান সমাজের টুকরো টুকরো ছবি দেখা যায়, যেগুলি 'মন্তাজ' করলে বর্তমান জীবনের চমকপ্রদ চলচ্চিত্র হতে পারে। বাইরের যে বড় সমাজ তার চেহারা একরঙা কাগজের শীটের মতো নয়। ছোট ছোট নানারঙের বিচিত্র সব 'সমাজ' নিয়ে বাইরের বৃহত্তর সমাজের 'মোজায়েক' তৈরি হয়েছে। আমরা কথায় বলি, বিপুল এই পৃথিবী, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। তারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে পারি, বিপুল এই সমাজ, যেমন জটিল তেমনি জবরজঙ্গ, তার কিছুই আমরা জানি না। যেটুকু জানি তা নিজেদের গৃহকোণ থেকে একটু জানলা ফাঁক ক'রে দূরের সমুদ্র বা পাহাড় বা মহারণ্যকে জানার মতো। বিশ্বমানবসমাজ, কি ভারতীয় সমাজ, এসব অনেক বড় ব্যাপার এবং অনেকেরই নাগালের বাইরে। বাংলার এই বাঙালী সমাজেরই বা কতটুকু আমরা জানি।

হিন্দুসমাজ মুসলমানসমাজ তার মধ্যে দরিদ্র কৃষক মজুর নিম্নমধ্য মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্য ধনিক প্রভৃতি শ্রেণীসমাজ, নানাস্তরের শিক্ষিত-সমাজ, বৈষ্ণব শাক্ত শৈব প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের সমাজ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সদগোপ গোপ মাহিষ্য কৈবর্ত বণিক প্রভৃতি শত শত জাতি-ধর্মগত সমাজ, কর্মকার চর্মকার তন্তুবায় কারুকার প্রভৃতি অসংখ্য পেশাগত সমাজ, বালকসমাজ তরুণসমাজ বা যুবসমাজ ইত্যাদি বয়সানুক্রমিক সমাজ, এবং তার উপরে নারীসমাজ ও পুরুষসমাজ —একই সমাজের মধ্যে এরকম শত শত খণ্ডসমাজ। দৈশিক ও কালিক বৈচিত্র্যও আছে সমাজের, যেমন ভারতীয় সমাজ, ফরাসী

সমাজ, চৈনিক সমাজ, আফ্রিকান সমাজ, গ্রাম্য সমাজ, নাগরিক সমাজ, প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ। সামাজিক অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে প্রত্যেকটি খণ্ডসমাজের মধ্যেও বহু অণুসমাজ দেখা যায়। সমস্ত খণ্ডসমাজ মিলিয়ে সমাজেব যে সমগ্রতা, তার প্রকৃতস্বরূপ চেনা যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই অনুমান করা যায। জীববিজ্ঞানেব সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের এইদিক থেকে একটা সাদৃশ্য আছে। যেমন এক-কোষ থেকে বহু-কোষ জীব ও জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি হযেছে, তেমনি মনুষ্যসমাজেব ক্রমবিকাশ ও বযসবৃদ্ধির ফলে সমাজও বহুকোষবিশিষ্ট সমাজ হয়েছে। অর্থাৎ সমাজেব যত বিকাশ হযেছে, বযস বেড়েছে, তত তার প্রাগৈতিহাসিক অতীতেব সহজ সবল রূপ আধুনিক জটিল রূপ ধাবণ কবেছে, বৈচিত্র্য বেড়েছে, ভিতবকাব খণ্ডসমাজ ও অণুসমাজেব সংখ্যাও বেড়েছে।

যেমন গ্রাম্যসমাজ। সমুদ্রগুপ্ত, কি লক্ষ্মণসেনেব আমলে যে গ্রাম্যসমাজ বাংলাদেশে ছিল—ছাযাসুনিবিড শান্তিব নীড ছোট ছোট গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ—তা বর্তমান যুগেব গুপ্ত-ও-সেনদেব আমলে তাপদগ্ধ অশান্তি ও অসন্তোষেব জলন্ত চুল্লীতে পবিণত হযেছে এবং ক্রমেই যত দিনের পব বাত আব বাতের পব দিন যাচ্ছে, তত যেন সেই চুল্লীব উত্তাপ বাড়ছে। তাব প্রধান কাবণ, এই চুল্লীব 'স্টোকাব' বা ইন্ধনিকেব সংখ্যা আজ দ্রুতবর্ধমান। নাগবিক জীবনেব ইন্ধন, বাজনীতিব ইন্ধন, অর্থনীতিব ইন্ধন—এবং আরও অনেক ইন্ধন ও ইন্ধনিক। ইন্ধনেব আজ অভাব নেই। দ্রুতচল যানবাহন আজ শহব-নগব ও গ্রামেব ব্যবধানও ঘুচিযে দিয়েছে। কাজেই সুদূর ভবিষ্যতের কোনো স্বর্ণযুগেই আব আমাদেব গ্রাম্যসমাজে 'শান্তির নীড' খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন কি দবিদ্রতম ক্ষেতমজুবও যদি বিনা মেহনতে গণ্ডেপিণ্ডে গিলে অঘোরে ঘুমোবাব সুযোগ পায, তা-ও না, কখখনও না। ইস্পাত-কাবখানায 'ব্লাস্টফার্নেসেব' মতো তপ্তচুল্লী গ্রাম্যসমাজেব সনাতন নীলাকাশ লাল ক'বে জ্বলতে থাকবে এবং সেই লাল আকাশেব দিকে চেযে ভবিষ্যতেব মানুষেব মনে কোনো বাজনৈতিক বা কাব্যিক বোমান্সেব শিহবণ জাগবে না। নতুন এক জীবনেব স্বাদে নতুন শিহবণ হযতো জাগবে।

কেন শিহরণ জাগবে না, কেন চোখগুলো ঝলসে যাবে, তা বর্তমান কলকাতাব নাগবিক সমাজের রূপ দেখলেই বোঝা যায। মানুষেব সমস্যা যে শুধু ঔদরিক নয, তার চেয়ে শতগুণ বেশি মানসিক, তা শহরের উদরনিশ্চিন্ত সমাজেব চেহাবাব দিকে চেয়ে যে-কেউ স্বীকাব কবতে কুণ্ঠিত হবেন না, যদি না অবশ্য তিনি রাজনীতির নাযকদের মতো দিনকানা হন। উদরেব আগুন দাবানলের চেযেও ভয়াবহ, একথা ঠিক, একথা মান্ধাতার আমলেব সত্যি কথা, এবং সেই আগুনেব ইন্ধনিক হবাব জন্য যে মার্কসীয দার্শনিক

হবার প্রয়োজন নেই, রাস্তার পাগল হলেও যথেষ্ট, সেকথাও তেমনি সত্যি। কিন্তু তাতে আজকের মানুষের ও সমাজের সমস্যার সমাধান যে হয় না তা রুশ-চীন, রুশ-চেক, রুশ-হাঙ্গেরীর 'কমরেডী-রূপ' দেখেই বোঝা যায়। রাজনীতির পাঠশালায় বাল্যকাল থেকে আমরা শিখেছি যে একদিন সাম্রাজ্যবাদ-বনাম-সাম্রাজ্যবাদে যুদ্ধ অনিবার্য, এবং সাম্রাজ্যবাদ-বনাম-সমাজতন্ত্রবাদের সম্মুখ-সমরে পৃথিবীর যুগযুগান্তের মানবসমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, তারপর দীনদুঃখী-আতুর যাবা তারাও তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলিমের-পর-ছিলিম তামাক খেতে পাবে। কিন্তু কোথায় সেই তাকিয়া আর সেই তামাক। তামাক বৈপ্লবিক বচনাকীর্ণ গ্রন্থাগারে। আজ যদি কোনো পাঠশালার হতভাগ্য শিক্ষক বলেন যে, সাম্যবাদ-বনাম-সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ-বনাম-সমাজতন্ত্রবাদেব সম্মুখ-সমর অনিবার্য এবং কমরেডদের সঙ্গে কমরেডদের খুনোখুনিতে মানবসমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতেও পাবে, তাহলে তাঁকে বৈপ্লবিক বচনেব বোমায় নিশ্চয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনুমেণ্টের তলায় বচনবোমাব বিস্ফোরণে হয়তো সেই হতভাগ্য শিক্ষকের অন্তরাত্মা আতঙ্কে কেঁপে উঠবে, কিন্তু যা সত্য তা এতটুকুও কাঁপবে না।

যে-সত্য অকম্প থাকবে তা হল বর্তমান সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যাবতীয় মানবিক সম্পর্কেব বিলুপ্তি এবং যান্ত্রিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির লক্ষ্যহীন দুর্ধর্ষগতিব এই পরিণতি নিষ্করুণ হলেও নির্মম বাস্তব সত্য। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি হবে মানুষেব দাস, সমাজ ও মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য—এই ছিল গোড়াব কথা। শেষের কথা যা আজ সত্য হয়েছে, তা হল—মানুষ হয়েছে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্রীতদাস। যন্ত্রের হওয়া উচিত ছিল মানবিক, তা না হয়ে মানুষ হয়েছে যান্ত্রিক এবং যন্ত্রমানুষের দ্বারা যে অন্তত কোনো সুন্দর সমাজ বা সভ্যতা গড়া যায় না, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েই তার বর্তমান সাক্ষী।

তা যদি হয় তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন হল, সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষের কাছে 'ভবিষ্যৎ' সবচেয়ে বেশি মূল্যবান? ষাট থেকে আশি বছরের বৃদ্ধদের কাছে? পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের প্রৌঢ় ও প্রায়-প্রৌঢ়দের কাছে? তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দ্রুত বিলীয়মান যৌবন যাদের তাদের কাছে? বয়সবিভাগ ট্রপিকাল দেশেব মানদণ্ড দিয়ে করছি না। একজন আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনশিল্পী জীবনের গতি সম্পর্কে লিখেছেন:

> To be sure, he was ageing. At forty, though he had remained as slim as a vine shoot, a man's muscles don't warm up so quickly···At forty he's not yet in a wheelchair, but he's definitely heading in that direction···
>
> Albert Camus: *'The Silent Men'*

গভীর স্বচ্ছ জল, ঝক্‌ঝকে গরম রোদ, সুন্দরী যুবতী মেয়ে, সতত কর্ম-চাঞ্চল্য—এ-ছাড়া সুখ বলতে আর কিছু ছিল না দেশে। অলবিয়ের ক্যামু তাঁর দেশের কথা বলেছেন। জীবনেও এ-ছাড়া সুখ বা আনন্দ আর কিসে আছে! যৌবন গত হলে সেই আনন্দের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ। চল্লিশ থেকেই যৌবনের বিদায়কালীন পদসঞ্চার শোনা যায়, যদিও তখন মানুষ হুইলচেয়ারে চলে বেড়ায় না, তবুও বেশ বোঝা যায়, জীবনের এই আনন্দগুলি বিস্বাদ হয়ে আসছে, দেহের স্নায়ুপেশীতে আগেকার মতো আর সাড়া জাগছে না, মনে আর দোলা বা রঙ লাগছে না। চল্লিশেব পর মানুষ হয় 'স্কাউণ্ড্রেল', একথা বার্নাড শ বলেছেন। তার প্রায় একশো বছর আগে ডস্টয়েভস্কি বলেছেন :

> I am forty years old now, and you know forty years is a whole life-time; you know it is extreme old age. To live longer than forty years is bad manners, is vulgar, immoral. Who does live beyond forty? Answer that, sincerely and honestly. I will tell you who do: fools and worthless fellows."
>
> Dostoevsky : *Notes from Underground*—1864

এরপর কেউ নিশ্চয় বলবেন না যে চল্লিশের পর জীবনের 'ভবিষ্যৎ' আছে। যদিও বর্তমানকালে পুরুষরা তো বটেই, মেয়েরাও চল্লিশের কোঠায় যুবক-যুবতীর ভাবভঙ্গি নিয়ে চলতে চান, তাহলেও জীবনের আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে তাঁদের ট্র্যাজিডির নায়ক-নায়িকা ছাড়া কিছু বলা যায় না। ভোগের অদম্য আগ্রহ থেকে যখন এই স্থূলপেশী মেদবহুলদের কৃত্রিম যৌবনভঙ্গি প্রকাশ পায়, তখন এই ট্র্যাজিডি হয় আরও করুণ ও নির্মম। তখন আরও পরিষ্কার বোঝা যায় যে যারা 'টীনএজার' (তের থেকে উনিশ বছরের) ও আদিকুড়ি (কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের), যারা বয়ঃসন্ধি ও যৌবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের তারুণ্যোচ্ছ্বাসের অকৃত্রিম ও অসংযত প্রকাশ কত স্বাভাবিক। বিগতযৌবনরা, অথবা (কন্‌সেশন-সহ) অস্তমান-যৌবন নারী-পুরুষরা যদি আজ মহানগরেব পথেঘাটে ট্রামবাসে শপিং সেণ্টারে সিনেমা-থিয়েটারে কলা প্রদর্শনীতে হোটেল-রেস্তোঁরায় সভা-সমিতিতে তাঁদের বেশভূষায় চলনে-বলনে অঙ্গভঙ্গিতে পূর্ণযৌবন যুবক-যুবতীদের প্রতিস্পর্ধী হতে চান এবং সর্বত্র সচেতনভাবে তার অভিনয় ক'রে বেড়ান, তাহলে তরুণ-তরুণীদের দৃপ্ত ও উদ্ধত আচরণের সমালোচনা করার অধিকার, অন্তত নৈতিক অধিকার তাঁদের কিছু আর থাকে না। 'টীন-এজার' ছেলেমেয়েরা যদি পথে বেরুলে দেখতে পায় যে তাদের মা-বাবার বয়সী যাঁরা তাঁরাই জীবনের রসাস্বাদনে আজ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহলে বর্তমান সমাজের এই বিচিত্র জীবনদ্বন্দ্বে তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম তারুণ্য স্বভাবতই সমস্ত নীতির বাঁধ ভেঙে আত্মপ্রকাশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

অথচ চল্লিশের প্রতিদ্বন্দ্বীদের জীবনের কোনো 'ভবিষ্যৎ' বলে কিছু নেই। তাঁদের শুধু ক্রাচের মতো কতকগুলি অবলম্বন আছে, আর আছে প্রাণপণে পশ্চাদ্ধাবন করার মতো বর্তমান ভোগবহুল স্টেটাসসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিক্যাল সমাজে কতকগুলি মৃগ—যেমন অর্থ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি। কিন্তু যাকে 'জীবন' বলে তার কোনো স্বাদ নেই এর মধ্যে। স্বর্ণমৃগ তো আর বনমৃগ নয়। যে-স্বাদ আছে ঝক্‌ঝকে রোদের তাপে, স্বচ্ছ জলের গভীরতায়, তরুণ-তরুণীর বলিষ্ঠ দেহ-মনে, পাখির ডাকে, সেই স্বাদ কোথায় টাকার সিন্দুকে? কোথায় জরদ্গবের প্রতিপত্তিতে? অথবা মৃত্যুপথযাত্রীর খ্যাতির দুন্দুভিতে? কোথাও নেই। তাই বলছি, চল্লিশের পরে ভবিষ্যৎ নেই, জীবন নেই, ধনসুখ নেই, যতই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রীবাভঙ্গি ক'রে আমরা যৌবনের রিহার্সাল দিই না কেন, তবু নেই। শুধু স্বর্ণমৃগ আছে পশ্চাদ্ধাবনের জন্য, স্থূল দেহপিণ্ড আছে উটের মতো জীবনের মরুভূমিতে বহনের জন্য, স্তিমিত স্নায়ু ও শ্লথ পেশী আছে মধ্যে মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া জীবনের বেসুরো ঝংকার শোনার জন্য। আগেকার বাণপ্রস্থকালে ছিল 'ধর্ম', বর্তমানে বাণপ্রস্থকালে তার বিকল্প হয়েছে 'রাজনীতি', চল্লিশের আরএকটি স্বর্ণমৃগ। এই চল্লিশের মা-বাবাদের ছেলেমেয়েরাই বর্তমান সমাজের সমস্যা। তাদের বয়স তের থেকে পঁচিশ বছর। তাদের জীবন আছে, জীবনের 'ভবিষ্যৎ' আছে, যদিও রাষ্ট্রনায়করা সেই ভবিষ্যৎটিকে আজ গভীর অন্ধকারে আবৃত ক'রে রেখেছেন। যাদের ভবিষ্যৎ থাকে তারাই ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখে। যদি সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়, তাহলে বর্তমানের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তারা কি করতে পারে?

বর্তমানের বুকের উপরেও দাঁড়াবার স্থান নেই তাদের। তাই তারা স্ট্রীট-কর্নারে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের যোগ্য কোনো কাজ নেই সমাজে, বর্তমানে নেই, এবং বর্তমান সমাজের চেহারা এরকম থাকলে ভবিষ্যতেও নেই। তাই তারা খেয়াল-খুশি মতো কাজ করে, যে-কোনো কাজ, অকাজ-কুকাজ যাই হোক, কারণ কিছু-না-করার চেয়ে একটা-কিছু-করা তাদের বয়সের দিক থেকে প্রয়োজন। জ্যেষ্ঠদের মতো তাদের স্বর্ণমৃগের ধান্ধা নেই, জীবনের কুটিল পথে দুরভিসন্ধি নিয়ে সন্তর্পণে পা-টিপে-টিপে তারা চলতে শেখেনি এবং নির্বিকার উদাসীন যন্ত্রের মতো মুনাফার লোভে মৃত্যুর ব্যবসা করতেও তারা জানে না। মিথ্যা ধর্মাচরণের মতো বয়স তাদের হয়নি, অধর্মের বিবেকদংশনও নেই। কোনো সম্বল বা কোনো মূলধন তাদের নেই, কেবল নতুন তারুণ্য ও যৌবনের দুরন্ত কর্মশক্তির সম্বল ছাড়া। সেই তারুণ্যের উদ্দাম শক্তি যখন সমাজে স্বাভাবিক আত্মনিয়োগের পথ খুঁজে পায় না, তখন তার খানিকটা বিচ্ছুরণ যে স্ট্রীটকর্নারে হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কলকাতার স্ট্রীট-

কর্নারে নয় শুধু, সারা পৃথিবীর শহর-নগরের স্ট্রীটকর্নারে, এমন কি গ্রামের ও পথের কোণে হাটেমাঠে আজ যুবশক্তির এই বিভ্রান্ত বিক্ষেপণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান তরুণবিক্ষোভের সমগ্র রূপ নিশ্চয় স্ট্রীটকর্নারের শক্তিবিক্ষেপণে দেখা যায় না, যেমন কোনো দেশের সমগ্র তরুণসমাজকেও শুধু স্ট্রীটকর্নারে দেখা যায় না। তবু এটাকে সেই ব্যাপক তরুণবিক্ষোভেরই একটা অগ্নি-কণা বলা যায়, পথের কোণের অগ্নিকণা। বৃহৎ তরুণসমাজের মধ্যে স্ট্রীটকর্নার সমাজ একটি খণ্ডসমাজ, এবং বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে একটি অনুসমাজ। কিন্তু এই অনুসমাজটিও যে উপেক্ষার বস্তু নয়, আণবিক শক্তির মতোই প্রচণ্ড তার শক্তি, তার পরিচয় আমরা কলকাতার স্ট্রীটকর্নার সমাজ থেকে প্রতিদিন পাই।

স্ট্রীটকর্নার সমাজ প্রধানত টীন-এজারদের সমাজ, অর্থাৎ তের থেকে উনিশ বছরের তরুণদের সমাজ। আমেরিকান সমাজে তরুণদের মধ্যে সাধারণত দু'রকমের দল বা গোষ্ঠী দেখা যায়, একটিকে উইলিয়াম ফুট হোয়াইট বলেছেন 'Corner boys', আর-একটিকে 'College boys', খানিকটা শিক্ষা, খানিকটা পারিবারিক পরিবেশের তারতম্যের জন্য এই দলগত পার্থক্য গড়ে ওঠে। 'কর্নার-বয়'দের সম্বন্ধে হোয়াইট বলেছেন : *

> Corner boys are groups of men who centre their social activities upon particular street corners ··They constitute the bottom level of society within their age group ··

> কিন্তু 'কলেজ-বয়'রা, হোয়াইটের মতে—"have risen above the cornerboy level through high education."

কর্নারের ছেলেরা তাদের বয়সী-তরুণদের মধ্যে নিম্নতম স্তরভুক্ত, শিক্ষা-দীক্ষাও তাদের বেশি নয়। এইজন্য তাদের দলকে বলা হয় 'gang' আর কলেজের তরুণদলকে 'club' বলা হয়। হোয়াইট আমেরিকান সমাজে, এবং Cornerville-র মতো একটি বিশেষ অঞ্চলে, স্ট্রীটকর্নার তরুণদল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। এরকম অনুসন্ধান আরও অনেক সমাজবিজ্ঞানী নানাদিক থেকে অন্যান্য দেশেও করেছেন। আমাদের দেশে এ-রকম সামাজিক অনুসন্ধানের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা খুব বেশি হলেও, অনুসন্ধানীদের দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজচেতনা, সাহস ও ব্যক্তিগত উদ্যমের অভাবের জন্য তা করা হয়নি। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ঔদাস্য ও অচৈতন্যও এই জাতীয় সমাজসমীক্ষার অনুকূল নয়। বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে যে মূলত তরুণসমাজের, এবং তরুণদলের,

---

* William Foote Whyte. *Street Corner Society*, Chicago, Seventh Impression, 1964.

সমস্যা সব দেশেই আজ প্রায় একরকম, এমন কি স্ট্রীটকর্নারের তরুণদলেরও। দেশভেদে তার কিছুটা বৈচিত্র্য আছে, পার্থক্য বিশেষ উল্লেখ্য কিছু নেই। তার কারণ, আর্থিক দিক থেকে 'উন্নত' ও 'অনুন্নত' দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, এবং ভোগ-বিলাসের স্তরে যে পার্থক্যই আজ থাক না কেন, সামাজিক ও মানসিক স্তরে সর্বত্র আজ পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি। এমন কি আর্থিক দিক থেকেও আজকাল আব তাই 'under-developed' বা 'অনুন্নত' দেশ বলা হয় না, বলা হয় 'developing' বা 'উন্নতিশীল' দেশ। তাহলেও আমেরিকার 'অ্যাফ্লুয়েন্ট' সমাজের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজের নিশ্চয় পার্থক্য আছে। কিন্তু যন্ত্রায়ন-শিল্পায়নের সঙ্গে 'উন্নতিশীল' অর্থনীতিব অগ্রগতির এমনই মাহাত্ম্য (যুগমাহাত্ম্য তো আছেই) যে গলব্রেথ বর্ণিত আমেরিকার সেই 'অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি'র সমস্ত উপসর্গ আজ আমাদেব সমাজেও প্রকট হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্কে বা লণ্ডনে বা প্যারীতে বা মস্কোয় নয়, কলকাতা-দিল্লীর মতো শহরেও তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। কলকাতার 'বার'-হোটেলের 'ম্যাডহাউসের' দৃশ্য ও স্ট্রীটকর্নার তরুণদলেব কীর্তির সঙ্গে আজ আব তাই কোনো অত্যুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেবও সামাজিক দৃশ্য ও কীর্তিব প্রভেদ নেই। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠবা 'ম্যাডহাউসের' অভিনেতা এবং তরুণবা স্ট্রীটকর্নারের।

সামাজিক শ্রেণীর দিক থেকে বিচাব করলে দেখা যায় যে কলকাতাব স্ট্রীটকর্নার তরুণসমাজ প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর কিশোরদের সমাজ। কিশোরী বা তরুণীদের ঠিক এরকম 'কর্নার-সমাজ' এখনো গড়ে ওঠেনি, কারণ কিশোরীদের পক্ষে স্ট্রীটকর্নারে জটলা করার অসুবিধা আছে, এবং তাদেব স্বাধীনতা থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য ঠিক ছেলেদের মতো নেই। যেমন কর্নারের ছেলেদের পক্ষে রাস্তার যাত্রীদেব কাউকে লক্ষ্য ক'রে শিস্ দেওয়া, হুইসল দেওয়া, টিপ্পনি কাটা অথবা কোড-ল্যাংগোয়েজে অপ্রিয় মন্তব্য করা যত সহজ, মেয়েদের পক্ষে আদৌ তত সহজ নয়। তাই কিশোরী মেয়েরা ঠিক স্ট্রীটকর্নারে চাক বাঁধতে পারে না, অথচ কিশোরদের কর্নারের কাছাকাছি তারা গুচ্ছে গুচ্ছে চলমান থাকে, খিল্‌খিল্‌-কল্‌কল্‌ ক'রে ফ্রক দুলিয়ে হেসে-চলে বেড়ায়, সিনেমাস্টার ও খেলোয়াড়দের গল্প করে, এক-আধ সময় দেখেছি কর্নার-দলের সঙ্গে চকোলেট-লজেন্স ছোড়াছুড়িও হয়। কর্নারের কাছাকাছি যদি কোনো মাঠ থাকে, কোনো বাড়ির ফালতু রক অথবা দোকানের চত্বর, কিশোরীরা সেখানেও ঝাঁক বেঁধে থাকে। তার মধ্যে যদি কোনো ফুচ্‌কাওয়ালা, আলুকাবলি বা ঘুগনিওয়ালা রাস্তায় হাজির হয়, তাহলে তাকে সেণ্টার ক'রে চোখের পলকে কিশোর-কিশোরীদের একটা মিশ্রসমাজ গজিয়ে ওঠে এবং পথিকদের ভ্রূক্ষেপ না করেই তাদের স্বাধীন বাক্যালাপ ও বকম্‌-বকম্‌ চলতে

থাকে। বান্ধবীদের সঙ্গে বয়-ফ্রেণ্ডদের এবং বন্ধুদের সঙ্গে গার্ল-ফ্রেণ্ডদের আলাপ-পরিচয় হয় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায়, বিহারী ফুচকাওয়ালা না-বোঝার ভান ক'রে ফুচকার মশলা মাখতে থাকে। তাই মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে স্ট্রীটকর্নারে কিশোরী-তরুণীদের সমাজও গজিয়ে উঠতে পারে, এমন কি কিশোর ও কিশোরীদের মিশ্রসমাজও, কারণ ফুচকাওয়ালার আড়াল খুব বেশিদিন টেকসই হবে বলে মনে হয় না। কলকাতার 'মেট্রোপলিটন-কম্প্লেক্সের' কথা বলছি না, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণের প্রসার্যমাণ শহরতলির নিম্নমধ্যবিত্তপ্রধান জনবহুল সমাজের দিকে চেয়ে মনে হয়, তরুণতরুণীদের দুর্বার গতি আজ স্ট্রীটকর্নার সমাজের দিকে, এবং তরুণদের স্ট্রীটকর্নার সমাজের গতি অচিন্তানীয় দুঃসাহসিক কীর্তির বৈচিত্র্যের দিকে। মেট্রোপলিটন-কম্প্লেক্সের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের রূপও অন্যরকম নয়, একরকম। এমন কি গ্রাম্যসমাজের স্বাতন্ত্র্যও এইদিক থেকে আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন।

কর্নার-সমাজের অন্যতম বিশেষত্ব হল, প্রত্যেকটি কর্নারের কিশোরদের কাছে সেই নির্দিষ্ট কর্নারের স্থানিক মাহাত্ম্য। মনে হয় যেন পুণ্যলোভীদের তীর্থের চেয়েও কর্নারের আকর্ষণ দলের ছেলেদের কাছে অনেক বেশি। রাস্তার উপর ভাঙা কালভার্ট যাদের কর্নার, রাস্তার ধারে অর্ধসমাপ্ত প্রাচীরের পাশ যাদের কর্নার, কোনো চায়ের দোকানে বেঞ্চি-টুল যাদের কর্নার, পানের দোকানের কোণ যাদের কর্নার, এমন কি দক্ষিণ কোণ ও বাম কোণ, বছরের পর বছর দেখেছি তারা সেই কর্নারেই জমা হয়। কালভার্ট থেকে প্রাচীরের পাশে যায় না, চায়ের দোকান থেকে পানের দোকানে যায় না, এমন কি দোকানের দক্ষিণ কোণ থেকে বাম কোণেও স্থান-পরিবর্তন করে না। একই রাস্তার দুই পাশে একাধিক কর্নার বিরাজ করতে পারে, অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। অনুসন্ধানী হোয়াইটের 'গাইড' কর্নার-লীডার ডকের কথা মনে হয়—

> **Fellows around here don't know what to do except within a radius of about three hundred yards.**

কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্তপ্রধান শহরতলিতে—পাইকপাড়া দমদম থেকে যাদবপুর গড়িয়া গঙ্গাপুরী পুটিয়ারী বেলেঘাটা রথতলা-কসবা হালতু পর্যন্ত—অনেক জায়গায় একশো গজের ব্যবধানে বেশ বড় বড় কর্নার-সমাজ গড়ে উঠেছে দেখা যায়। প্রত্যেক কর্নার-গোষ্ঠীর নিজস্ব ও অন্যের সীমানা সম্বন্ধে ইন্‌টিগ্রিটি-বোধ অসামান্য, সাধারণত কেউ কারও সীমানা লঙ্ঘন করে না, প্রত্যেকটি দল নিজস্ব এলাকার ডিক্টেটর। সীমানা লঙ্ঘন অথবা সীমানার কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করলে কর্নার-লীডারের অঙ্গুলি হেলনে খণ্ডপ্রলয়ও হতে পারে। এক কর্নারের ছেলে যদি অন্য কর্নারে যায়, অথবা কোনো কর্নার-লীডার দলভাঙার উস্কানি দেয়, তাতেও খণ্ডপ্রলয় অনিবার্য। এ-রকম

খণ্ডপ্রলয় অনেক দেখেছি—হাতবোমা ক্র্যাকার ছুরি ইটপাটকেল সোডার-বোতল ইত্যাদি সহযোগে রীতিমতো গেরিলাযুদ্ধ বলা চলে। বিষয়টা কর্নারের প্রতি 'লয়াল্টি' নিয়ে, অথবা কর্নারের 'টেরিটোরিআল ইন্‌টিগ্রিটি' ও 'সভরেনটি' নিয়ে। দুটোই হল কর্নার-সমাজের মূল ভিত্তিস্তম্ভ। কোনোটি ধ'রে নাড়া দেওয়ার উপায় নেই।

কর্নারের আকর্ষণ কর্নার-বয়ের কাছে তাই দুর্নিবার। কর্নার-লীডার ডকের কথায় বলা যায় :

> They come home from work, hang on the corner, go up to eat, back on the corner, up to a show, and they come back to hang on the corner.

টীন-এজার তরুণদের আজকাল কাজও করতে হয়, যোগ্যতা ও সুযোগ অনুসারে নানারকমের কাজ, এবং অসময়ে স্কুল ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে, আর্থিক অনটনের জন্য কাজ করতে তারা বাধ্য হয়। কাজ করলেও কর্নার তারা ভোলে না। কাজের পর কর্নারে যায়, বাড়িতে দুমুঠো খেয়ে কর্নারে যায়, সিনেমা বা খেলা দেখে ফিরে কর্নারে যায়। বন্ধুরা কেউ আজকাল আর বাড়িতে খোঁজ করে না, কর্নারে খোঁজ করলেই বন্ধুর খবর জানতে পারে। বাড়িতে বা পরিবারে খোঁজ করে না, কারণ বাড়ির লোক জানে না তার খবর, কর্নারের বন্ধুরা সব জানে। বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর হোয়াইট তাই এ-বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন :

> Home plays a very small role in the group activities of the corner boy. Except when he eats, sleeps, or is sick, he is rarely at home, and his friends always go to his corner first when they want to find him.

কর্নারের ছেলেদের দৈনন্দিন জীবন ও কার্যকলাপের সঙ্গে পরিবারের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার সময়, ঘুমোবার সময় এবং অসুখ-বিসুখ ছাড়া রাস্তার কোণের ছেলেদের ঘরে থাকতে দেখা যায় না এবং তার বন্ধুরা তাই তাকে ঘরে খোঁজ করে না, খোঁজ করে কর্নারে। স্ট্রীটকর্নার সমাজের উৎপত্তি ও প্রসারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, বর্তমানকালে পারিবারিক জীবনধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

আমাদের সময় ছেলেবেলা থেকে আমরা শিখেছি ও জেনেছি যে 'হোম, সুইট হোম' এবং গৃহের মতো, পরিবারের মতো আর কোনো স্থান নেই জগতে! এখন সেই গৃহ মধুময় নয়, বিষময়। যন্ত্রযুগের গড্ডল-সমাজে বাবা-মা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সকলে ভাসমান। বেশিদিন নয়, মাত্র গত পঁচিশটা বছরের দিকে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত) যদি কেউ চেয়ে দেখেন খোলা চোখে, সমস্ত পর্দা সরিয়ে, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাবেন,

পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক ও সংস্পর্শ কোন্ স্তরে পৌঁছেচে। নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব এত বেড়ে গিয়েছে যে, বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই হয় না, এবং অনেকের চেতনার সীমানার মধ্যেই আত্মীয়রা বিরাজ করেন না। বিবাহ-শ্রাদ্ধের মতো অনুষ্ঠান ছাড়া আত্মীয়দের চোখের মিলনও ঘটে না। পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেব একক-পরিবার হয়েছে—যন্ত্রযুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জন্ম থেকে এ-যুগের ছেলেমেয়েরা সমস্ত নিকট আত্মীয়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ-ভালোবাসাব সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত (গত পঁচিশ কেন, কুড়ি বছরে যে-সব ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছে, তাদের কথাই আমরা বলছি)। বাকি থাকেন বাবা ও মা।

বাবা ও মা সম্পর্কে একটি কথা সবার আগে মনে রাখা দরকার। কথাটা হল, তাঁরাও মানুষ। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের জৈবগুণ পালনের জন্য তাঁরা দৈবগুণের অধিকারী হন না। আত্মীয়হীন একক-পরিবারে সংসারের ও সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের দু'জনকে পালন করতে হয়। বাবা চিরকালই গৃহকর্তা, আর্থিক বোঝা তিনিই প্রধানত বহন করেন। বর্তমানে মায়েরাও আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগী হয়েছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে মা-বাবাদের সকলকেই প্রায় জীবিকার জন্য কোনো-না-কোনো কাজ করতে হয়। যাঁদের নিছক জীবনধারণের সমস্যা নেই, স্বামীর আয়ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট, তাঁরাও বর্তমান যুগে স্ত্রী-স্বাধীনতা কামনা করেন, বিশেষ ক'রে আর্থিক স্বাধীনতা। তার জন্য তাঁরাও স্বামীর মতো চাকরি করতে যান। স্বাধীনতাব চেয়েও বড় কথা হল, মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মান (standard of living) বর্তমান ভোগ্যদ্রব্যবহুল সমাজে দ্রুত-পরিবর্তনশীল, এবং সেই মান উন্নয়নের জন্য সকলেই প্রাণপণে প্রয়াসী। কাজেই নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের উপরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যেও দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অর্থোপার্জনে ব্যস্ত। নিম্ন থেকে উচ্চ, মধ্যবিত্তের সকল স্তরেই আজ বাবা-মা বা স্বামী-স্ত্রীর জীবন বহির্মুখী, আর্থিক কর্মমুখী—কারও নিছক জীবনধারণের জন্য, কারও বা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, সামাজিক স্টেটাস উত্তোলনের জন্য। তাই যদি হয় তাহলে আত্মীয়হীন একক-পরিবারের অবস্থা কি হয়, এবং সেই পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবস্থা ?

অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়। কল্পনার প্রয়োজন হয় না, কলকাতা শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিভিন্ন স্তরে ঘরের দিকে একটু উঁকি দিয়ে তার বাস্তব ছবি দেখলে শিউরে উঠতে হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ জনমানবহীন গ্রাম্য শ্মশানের মতো ভয়াবহ, মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবার কাকপক্ষিহীন

কেয়ারি-করা টবের বাগানের মতো কৃত্রিম, প্রাণহীন। কোনোটাই মনুষ্যবাসোপযোগী নয় এবং মনুষ্যসন্তান প্রতিপালনের অনুকূল নয়। সঙ্গতি অনুসারে এই সব গৃহ ভৃত্যদের অধীন (পুরুষ ও মহিলা ভৃত্য) থাকে এবং বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের ভৃত্যের অভিভাবকত্বে রেখে যাওয়ার ফলে যে কতপ্রকারের বিপর্যয় তাঁদের জীবনে ঘটতে পারে তা বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে না বলাই বাঞ্ছনীয়। বাবা ও মা সন্ধ্যার পরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন, অবসাদ কাটিয়ে এবং সমাজের অবশ্যকর্তব্য ক'রে ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহপ্রদর্শনের মতো মেজাজ তাঁদের আর থাকে না। যাঁদের সঙ্গতি আছে, ভৃত্যবেষ্টিত ও গ্যাজেটদুরস্ত পরিবার আছে, তাঁদের চাকুরিকর্ম ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্ম থাকে—যেমন শপিং, সান্ধ্য মজলিস, ক্লাব, আসব, সিনেমা, প্রদর্শনী—রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত তাতেই তাঁদের কেটে যায়—আধুনিক মায়েদের —কারণ আগেই বলেছি, নারীর জীবন আজকাল পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশের পর শেষ হয়ে যায় না, শেষ হয়ে যাক তাও তাঁদের কাম্য নয়। কাজেই একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা, একটু আদরযত্ন, একটু সান্নিধ্য—এসব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা আধুনিক বাবা-মা'র কাছ থেকে পায় না—এমন কি একশ্রেণীর উন্নাসিক ন্যাকামিপ্রসূত 'ড্যাডি-মামি' বা 'টা-টা'র তোতাপাখির বুলির ভিতর দিয়েও না। পাশ্চাত্ত্য সমাজে এই সমস্যা যদি অত্যন্ত প্রকট হয়ে থাকে, আমাদের সমাজে তাহলে তা অত্যন্ত বিকট হচ্ছে বলা যায়, কারণ আমাদের সমাজ পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় অনেক বেশি জবড়জঙ্গ। পাশ্চাত্ত্য সমাজের একটা পরিষ্কার আকার আছে, তা সে যে রকমই হোক না কেন, আমাদের সমাজ কিম্ভূতকিমাকার—ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম, গুরুবাদ ও নেতাবাদ, পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মবাদ, সলজ্জ সাধুতা ও নির্লজ্জ অসাধুতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, বহুদেবতা বহুদানব ও বহুমানবের এক বিচিত্র মিশ্রসমাজ।

যে পাশ্চাত্ত্য সমাজের একটা বিশেষ আকার আছে, সেখানেই বাবা-মা'র, বিশেষ ক'রে মেয়েদের বহির্মুখী জীবনের প্রতিক্রিয়া পারিবারিক জীবনে কিভাবে দেখা দিচ্ছে, সে-বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী ফাইভেল বলেছেন :

> The general exodus of married women, many of them mothers, into outside work, in itself helped to create a new social atmosphere, a new general way of family life whereby *'home' for many boys and girls becomes less important in their lives, and the companionship of the irresponsible gang therefore becomes more important.*—বাঁকা হরফ লেখকের।

পৃথিবীর সমস্ত শহরে আজ তাই তরুণদের স্ট্রীটকর্নার সমাজের বিকাশ ও প্রসার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। কলকাতা শহরও পিছিয়ে নেই, বরং ইয়োরোপের অনেক শহরের চেয়ে এগিয়ে আছে। অন্যান্য শহরের মতো

ঘর ও পরিবার কলকাতা শহরে ভেঙে গেছে, কিন্তু কলকাতার ভাঙন আরও বেশি মর্মান্তিক। লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত পরিবার আজ কলকাতার শহরতলি ও মেট্রোপলিটন কমপ্লেক্সে নির্মম জীবনসংগ্রামে লিপ্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণরা পথের ভেণ্ডার, ট্রেনের ক্যানভাসার, কারখানার সাধারণ মজুর, অফিসের বেয়ারা, অথবা বেকার। অধিকাংশেরই বাসগৃহ দরিদ্রের গোয়ালের চেয়েও নিকৃষ্ট, মাথা গোঁজার বা বিশ্রামের স্থান নেই। পিতামাতার দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েদের একশো বর্গফুট স্থানের মধ্যে সহবাসের অভিজ্ঞতা যে কি ভয়ংকর, তা যাদের বাস করতে হয় তারাই জানে। কাজেই গৃহ ও পরিবার কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণের কাছে জ্বলন্ত নরককুণ্ড— সেখানে যে শুধু স্নেহমায়ামমতা নেই তা নয়, কোনোরকমে পশুর মতো দৈহিক বসবাসেরও সুযোগ নেই। এ-ছাড়া কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্য-বিত্ত তরুণদের অধিকাংশের কাছে গৃহ ও পরিবারের কোনো আকর্ষণ নেই, কারণ মানবিক সম্পর্কের স্বাদ সেখানে তারা পায় না। তাই তারা মর্যাদার জন্য স্ট্রীটকর্নারে না এলেও, কফিকর্নারে যায়। অর্থাৎ স্ট্রীটকর্নার থেকে কফি-কর্নার বাইরের যে কোনো কর্নার আজ তরুণদের কাছে ঘর ও পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কারণ ঘর আর আগের ঘর নেই, পরিবার আর আগের পরিবার নেই, বাইরের হৃদয়হীন যান্ত্রিক সমাজের হুবহু প্রতিচ্ছবি হয়েছে পরিবার। ধনতন্ত্রের বার্ধক্যে যা হবার কথা তাই হয়েছে।

স্ট্রীটকর্নার সমাজ তরুণসমাজ। তরুণীদের কথা আপাতত থাক। স্ট্রীটকর্নার সমাজের হৃদয় আছে, মন আছে, বিবেক আছে, উচ্ছল প্রাণ আছে, তারুণ্যের উদ্দাম শক্তি আছে, সাহস আছে। এর কোনোটাই বৃহত্তর সমাজে নেই, এবং তার ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি পরিবারেও নেই। স্ট্রীটকর্নার সমাজের বৈশিষ্ট্য হল দৃঢ় গোষ্ঠীবদ্ধতা, পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুপ্রীতি, লীডার বা গোষ্ঠীপতির প্রতি অন্ধ অনুরাগ। এগুলি মানসিক গুণ এবং অবশ্যই তারুণ্যের ধর্ম। কিন্তু সমাজের মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই, ভালোবাসাও নেই বিশেষ, কারণ আজকের সমাজে খুব কম মানুষই আছেন যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, ভালোবাসার পাত্র, বিশেষ ক'রে উচ্চসমাজে। এই তরুণরা যেমন পিতামাতার স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত, তেমনি পিতামাতারাও তাদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত। স্ট্রীটকর্নার সমাজের তরুণদের যদি কোনো শ্রদ্ধা সমাজের প্রতি না থাকে, তাহলে তার জন্য তরুণরা দায়ী নয়, দায়ী সমাজ, বিশেষ ক'রে সমাজের শাসক ও পরিচালক জ্যেষ্ঠরা। আজ সমাজের জ্যেষ্ঠরা সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমস্ত আদর্শ ও নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে, এমন কি সামান্য শিষ্টাচার পর্যন্ত ভুলে গিয়ে, যে আচরণ করছেন, তাতে তরুণদের কাছে কোনো দাবি করারই তাঁদের অধিকার নেই। কর্পোরেশন-

অ্যাসেম্বলি থেকে পার্লামেণ্ট, স্কুল-কমিটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সিণ্ডিকেট, ব্যবসাক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সর্বত্র মেকীভণ্ড ও নিধিরামদের তাণ্ডব, এবং সেই তাণ্ডবের কি অশিষ্ট অভদ্র অশালীন রূপ! স্ট্রীটকর্নারের যে-কোনো হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে তরুণ তার সমস্ত ঔদ্ধত্য ও অশালীনতা নিয়ে সমাজের জ্যেষ্ঠ ও প্রাজ্ঞদের এই মিথ্যা দম্ভ ও অশিষ্টতার কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট করবে। তারপর সমাজের বিচিত্র প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে কেবল এই অপদার্থতার গুণকীর্তন এবং ভণ্ডদের জয়ধ্বনি! যেমন বাণিজ্যে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে, তেমনি রাষ্ট্রশাসনে, সর্বত্র সমান। কাজেই তরুণরা যদি আজ জ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধার পাত্র বলে না মনে করে, এবং শহরের স্ট্রীটকর্নার থেকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক শিসের শব্দ শোনা যায়, তাহলে চমকে ওঠার কিছু নেই।

স্ট্রীটকর্নারের তরুণরা 'ভায়লেণ্ট' বলেও চমকে ওঠার কিছু নেই। বর্তমানকালের বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক রাষ্ট্রশাসনের ভিত্তি হল 'ভায়লেন্স'। সমাজের অস্থিপঞ্জরে 'ভায়লেন্স'। বহুনিনাদিত, যুগে যুগে বহু মানব-অবতার ঘোষিত বড় বড় আদর্শের কি পরিণতি? শিশুর খাদ্যে বিষ, কারণ মুনাফা চাই—দেশাত্মবোধ ও শান্তিতে বিষ, কারণ আণবিক অস্ত্র-নির্মাণে মুনাফা চাই, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই। সভ্যতার পরিণতি 'ভিয়েৎনাম', আণবিক মারণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি শ্মশানযাত্রী বিশ্বমানবের মুখে 'রামনাম'। মুণ্ডিতমস্তক বিদেশীদের মুখেও চৌরঙ্গিতে 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম'। 'ভায়লেন্স' প্রকৃতির আলো-বাতাসে, মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে। তরুণদের—এবং স্ট্রীটকর্নার তরুণদের—হাতবোমা ও ক্র্যাকার, বোতল ও পাইপগান—তার কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা বা পুতুলখেলা ছাড়া কিছু নয়। কারণ 'ভায়লেন্সে'র ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র শাসক জ্যেষ্ঠদের করায়ত্ত—তাই দিয়ে তাঁদের প্রয়োজনে তাঁরা স্ট্রীট সেণ্টার থেকে স্ট্রীটকর্নার পর্যন্ত এক নিমেষেই নির্মূল করতে পারেন। তরুণরা তা পারে না, ফ্রান্সের তরুণরাও তা পারেনি। কলকাতার স্ট্রীটকর্নারের তরুণরাও তা জানে। তারা জানে তাদের মতো স্ট্রীট-কর্নারের তরুণদের ক্র্যাকারের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ জ্যেষ্ঠদের কামানবোমারুবিমানের কাছে আপাত-দৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হবে। তবু প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ তারা করবে—ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক ও ভায়লেণ্ট সমাজের বিরুদ্ধে, শ্মশানের মতো ভয়াবহ ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে, দানবের চেয়েও ভয়ংকর হিংস্র মানুষের বিরুদ্ধে, পিতৃমাতৃহীন পরিবারের বিরুদ্ধে, আদর্শ ও নীতির নামে স্তূপীকৃত ভণ্ডামি ও মিথ্যার বিরুদ্ধে।

(১৯৬৮)

হিপি-বীটনিক-বিদ্রোহ

আধুনিক যন্ত্রযুগের সমাজ-সভ্যতার বিকট দানবীয় ব্যাদানের বিরুদ্ধে আজ যাঁরা কতকটা উদ্‌ভ্রান্ত আউল-বাউলের বেশে অনুচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তাঁদের বিদ্রোহকে এযুগের সহজিয়াবিদ্রোহ বলা যায়। তাঁদের বলা হয় 'হিপ'-জেনারেশন বা 'বীট'-জেনারেশন। সারা পৃথিবীতে, নিউইয়র্ক লণ্ডন থেকে কলকাতা মহানগর পর্যন্ত, তাঁরা হিপি-বীটনিক-বীট্‌ল নামে পরিচিত, ইদানীং কলকাতায় 'হিপি' নামটাই বেশি জনপ্রিয়। হিপি-দার্শনিকদের মতে, আজকের পৃথিবীতে মানুষের সমাজে ও জীবনে শান্তি নেই, প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, এককথায় হ্যাপিনেস্‌ নেই ব'লে চারিদিকের মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মতো হিপিনেস্‌ গজিয়ে উঠছে। কিন্তু কেন হিপিদের বিদ্রোহ সহজিয়াবিদ্রোহ, এবং হিপিরা সহজিয়া বা সহজপন্থীদের সগোত্র ?

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা ধর্মসাধনে মূলত শাস্ত্রাচারবিরোধী। শাস্ত্রীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনায় প্রেম ও রস প্রধান আশ্রয় এবং স্বকীয় ও পরকীয় দু'রকম রসের মধ্যে পরকীয় রসের আশ্রয় শ্রেষ্ঠ। নর-নারীর সহজ স্বাভাবিক রতিসম্পর্ক যে স্বামী-স্ত্রীর শাস্ত্রীয় সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এই সত্যই সহজিয়ারা স্বীকার করেন। ভাবাশ্রয় ও প্রেমাশ্রয়ও তাঁদের সাধনার বড় কথা। এযুগের হিপিদের সঙ্গে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সহজিয়াদের অনেকদিক থেকে মিল আছে। প্রেম-ভালোবাসা হিপি-জীবনের বড় আদর্শ। হিপিদের আস্তানায় ও জমায়েতে 'লভ্‌' কথাটা তাই বড় ক'রে ব্যানারে লেখা থাকে। ভাবাশ্রিত হবার জন্য হিপিরা 'পট'-ধূম (কতকটা গাঁজা-সিদ্ধির মতো), নানারকমের ড্রাগ

ও সুরাপান করেন, সহজিয়ারাও গঞ্জিকা-সিদ্ধি সেবনে অভ্যস্ত। উভয়েরই মতে তা ছাড়া নাকি 'ভাব' আসে না এবং ভাবের বায়ুলোকে বিচরণ করা যায় না। সহজিয়ারা সমাজ-পরিবার বর্জন করতেন এবং কোনো বাহ্যাচার বা নীতি-বন্ধন মানতেন না। হিপিরাও তাই, তাঁরা বর্তমান সমাজ ও পরিবারের বন্ধন ছিন্ন ক'রে যত্রতত্র সহজিয়াদের মতো চলে-ফিরে বেড়ান। নিজেদের আহার-বিহারে ও মেলামেশায় স্ত্রী-পুরুষ হিপিরাও ভ্রামমাণ বাউলদের মতো কোনো সামাজিক নীতিবন্ধন মানেন না। সহজিয়াদের মতো হিপিরাও গুরু-বিশ্বাসী এবং মাথার চুল-দাড়ি পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকেও তাঁদের বাউলসাদৃশ্য লক্ষণীয়। হিপিবিদ্রোহকে তাই আধুনিক ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগের সহজিয়াবিদ্রোহ বলা যায়।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, হিপিরা বর্তমান 'সিক্ সোসাইটি' বা ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের ব্যারোমিটার। কিছুদিন আগে (জানুয়ারি ১৯৬৪) ডক্টর জন ইগান নামে একজন খ্যাতনামা আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী কলকাতা শহরে এসেছিলেন। দলে দলে আজ হিপিরা কেন সুদূর আমেরিকা থেকে, সেখানকার অ্যাফ্লুয়েন্ট বা ভূরিসমাজের ভোগলালসা ও অগণিত প্রলোভন ছেড়ে, ভারতের হিমালয় থেকে কলকাতা-হাওড়ার দিকে ধাবমান হচ্ছেন, গুরু মহেশ যোগী থেকে ভক্তিবেদান্ত ও চিরঞ্জীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন, সেই প্রশ্ন তাঁকে করা হয়। প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানী ইগান বলেন যে হিপিরা আজ এক অতীন্দ্রিয় জীবনানুভূতির জন্য লালায়িত এবং ধ্যান-যোগসাধনা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সেই অনুভূতি আস্বাদনের অমরাবতী হল ভারতবর্ষ। কাজেই হিপিরা আজ ভারতাভিমুখী এবং হিমালয়ের গুহাগহ্বর থেকে কলকাতা হাওড়ার অলিগলি পর্যন্ত তাঁদের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত। ইগান অবশ্য একথাও উল্লেখ করেন যে ভূরিসমাজের ভোগবিলাসিতা ও সুখোচ্ছ্বাসের (ইউফোরিয়া) প্রতি হিপিদের যে বীতরাগ ও অনাসক্তি তা আন্তরিক এবং তার কারণ হল যন্ত্রজর্জর, নীরেট আমলা-অধ্যুষিত সমাজের ব্যক্তিসত্তানাশ, কপটতা ও অত্যুৎকট কৃত্রিমতার বিরুদ্ধেই হিপিদের বিদ্রোহ। আমেরিকার তরুণ ছাত্রবিদ্রোহ ও হিপি-বিদ্রোহের সামাজিক উৎস যে কতকটা একই, সেকথাও ইগান ইঙ্গিত করেন।

বিষয়টা ভাববার মতো। অন্তত সমাজবিষয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা আজ হিপি-বীট্‌ল-বীটনিকদের আন্দোলন-আচরণ যতই বিসদৃশ হোক, তাচ্ছিল্যভরে তাঁদের উপেক্ষা করতে পারেন না। যদি তাঁরা মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধদের একটি গোষ্ঠী হতেন, তাহলে এটা না হয় তাঁদের জীবনের তৃতীয়াশ্রম বানপ্রস্থ অথবা চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসেরই একটা রূপ ব'লে ব্যাখ্যা করা যেত। কিন্তু হিপিরা অধিকাংশই বয়সে তরুণ ব'লে তাঁদের বিদ্রোহী ও আপাতোদ্ভট

জীবনদর্শন রীতিমতো চিন্তনীয়। মানবসমাজের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনোকালে সমাজমঞ্চে এরকম বিচিত্র অভিনয় দেখা যায়নি, যেখানে অভিনেতারা সকলে তরুণ-তরুণী, নাট্যবস্তু চলমান সমাজ-জীবন এবং সমাজদর্শন পরিবর্জন। এ বিদ্রোহের মৌল প্রকৃতিও অনন্য। তাই সেটা যার কাছে যত কিমাকারই মনে হোক, তার স্বরূপ বোঝার সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়—সারা পৃথিবীব্যাপী 'ইউথ রিভোল্ট' বা তরুণবিদ্রোহ আজ দু'টি ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। একটি ধারা 'ছাত্রবিদ্রোহ'—যার ভিতর দিয়ে সমাজে এক নতুন ছাত্রশক্তির (যাকে 'স্টুডেন্ট পাওয়ার' বলা হয়) অভ্যুদয় হচ্ছে। এটি 'পজিটিভ' ধারা। অন্য ধারাটি হল—হিপি-বীটুল-বীটনিকদের আত্মান্বেষী আন্দোলনের ধারা—জীবনবিদ্রোহ বলা যায়। এটি 'নেগেটিভ' ধারা। সমাজ-রাষ্ট্রজীবনের একই প্রদাহী পরিবেশ এই বিশ্বব্যাপী তরুণবিদ্রোহের উভয়ধারার উৎস ও ইন্ধন।

হিপ্-জেনারেশনের আলোচনায় এই সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমি মনে রাখা প্রয়োজন। মনে রেখে হিপিদের সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা যাক। ক্যালিফোর্নিয়ায় হিপিদের একটি বিখ্যাত আড্ডায় একবার কোনো কৌতূহলী দর্শক উপস্থিত হন, হিপি-জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে। প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করেন : "আমার জানতে ইচ্ছে করে, এইভাবে জীবনযাপন করার ও বেঁচে থাকার ব্রত আপনারা গ্রহণ করেছেন কেন?" দলের ভিতর থেকে একজন এলোকেশী তরুণী হিপি, কণ্ঠমালার গুটি নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এসে, ছিমছাম শহুরে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে মিনিট দুই নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে (হিপনোটাইজ করার ভঙ্গিতে) বললেন, একটু উত্তেজিত সুরে :

"আপনার নিজের দিকে চেয়ে দেখেছেন, কে আপনি? বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন। কোনো মানুষের সঙ্গে সহজভাবে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন না আপনি, বলতে গেলে দু-তিন পেগ সুরাপান ক'রে নিজের মুখোশটা ফেলে দিতে হয়। কেন হয়? যে-কোনো নীতি, যে-কোনো মানবিক গুণ, কড়ির মূল্যে আপনারা কিনতে পারেন, নারীর নারীত্ব, ব্যবসায়ীর সততা সবই কড়ির স্পর্শে উবে যায়। আপনারা শান্তির কথা, অহিংসার কথা, মানবতার কথা, মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা দিনরাত বেতারে সংবাদপত্রে এবং হাজার হাজার বইতে প্রচার করেন, অথচ ভিয়েৎনামের নিরীহ মানুষ হাজারে হাজারে হত্যা করতে আপনাদের সংকোচ হয় না। যন্ত্রের মহিমাকীর্তনে আপনারা পঞ্চমুখ, অহরহ বলছেন যে যন্ত্র দিয়ে এ পৃথিবীকে স্বর্গ বানিয়ে ফেলবেন। কিন্তু তবু কেন আজও এ-পৃথিবীর অধিকাংশ অসহায় মানুষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করছে, খুনোখুনি

মারামারি করছে ? মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ও মর্যাদা আজও আপনারা গায়ের সাদা-কালো রঙ দেখে বিচার করেন, অথচ আপনাদের বড় বড় আদর্শের বুলির ধ্বনিতে কানের পর্দা ফাটার উপক্রম। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী আজ আপনাদের টাকার গোলাম, আপনাদের মুনাফার বিকট হাড়িকাঠে উৎসর্গিত। সেই বিজ্ঞান দিয়ে আজ আপনারা সর্বসংহারক মারণাস্ত্রের পরীক্ষায় পৃথিবীর আলো-জল-বাতাস পর্যন্ত বিষিয়ে তুলছেন, মানুষের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করছেন। এ তো আপনাদের সমাজ ও সভ্যতা, এবং এই সভ্যতারই একজন প্রতিমূর্তি আপনি। আপনি কি বলতে চান, আপনার বা আপনাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে—কেমনভাবে বেঁচে থাকতে হয়, এবং কেমনভাবে জীবনযাপন করা উচিত ? And you think you're going to tell us how to live ?"

মুক্তকেশী হিপি তরুণীর এই উত্তর শুনলে জ্যঁ পল সার্ত-এর 'নসিয়া' গ্রন্থের সেই হতভাগ্য হিউম্যানিস্টের কথা মনে হয়—যে হিউম্যানিস্টের প্রয়োজন আজকের মানুষের ফুরিয়ে গেছে, যে চিরদিনের মতো তাই নির্জনতার রাজ্যে প্রবেশ করেছে – কারণ অকস্মাৎ আজ তার চোখের সামনে সব ভেঙে পড়েছে, সংস্কৃতির সব স্বপ্ন, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ও প্রীতির সব স্বপ্ন—

> That poor humanist whom men don't want any more···Now he has entered into solitude—forever. Everything has collapsed at once, his dreams of culture, his dreams of an understanding with mankind.

হিপিদের এই হতভাগ্য হিউম্যানিস্ট বলা যেতে পারে। আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে অহিংসা, প্রেম-ভালোবাসাই হিপিদের কাম্য। 'Why can't everybody live in peace ? Then the whole world can be happy. Love, that's what we all need. More love. That's what we hippies want to give to the world.'

যন্ত্রযুগের মানুষ হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতিকেও যন্ত্রের স্পন্দন মনে করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার বন্ধন নেই, প্রীতির বন্ধন নেই, অর্থসর্বস্ব পুণ্যময় জগতে কেবল টাকার বন্ধন আছে, 'ক্যাশ নেক্সাস'। ধনিকতন্ত্রের কি-বা মাহাত্ম্য ! মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করাই হিপিদের লক্ষ্য। তাই হিপিরা বলেন যে গৌতম বুদ্ধ একজন আদি-অকৃত্রিম হিপি, এবং যীশুখ্রীস্টও একজন হিপিশ্রেষ্ঠ—"Buddha was one of the original hippies····Jesus was the first hippie you know."

বুদ্ধ ও যীশু উভয়েই হিপিদের মতে আদি-অকৃত্রিম হিপি হলেও, খ্রীস্টধর্মের প্রতি হিপিদের আকর্ষণ বিশেষ নেই, তার চেয়ে ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ তাঁদের অনেক বেশি। তাঁরা বলেন যে, খ্রীস্টধর্ম যীশুর কোনো আদর্শ মেনে চলেনি এবং ধর্মের নামে সারা পৃথিবীতে খ্রীস্টানরা যত অধর্ম ও অন্যায় করেছেন, অশান্তি হিংসা-বিদ্বেষ অত্যাচার যুদ্ধবিগ্রহাদির

প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাতে ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যাণ্ট কোনো চার্চের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি হয় না। বরং বৌদ্ধ হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের নীতি আদর্শ ও আচরণের মধ্যে একটা আন্তর সঙ্গতি আছে এবং তার যোগসাধন ধ্যান তপস্যা জপ মন্ত্রাদির মধ্যে আত্মোপলব্ধির ও আত্মশক্তিবিকাশের সুযোগ আছে। তাই হিপিরা এই যোগ-ধ্যান-জপমন্ত্রের অনুগামী। তাঁদের বিশেষ কোনো ধর্মমত ব'লে কিছু নেই, তবে ধর্মাচরণের বাহ্যাড়ম্বরে তাঁরা বিশ্বাসী নন। ধর্মের ভিতর দিয়ে তাঁরা সমাহিত প্রশান্তি চান। কোথাও কোথাও তাঁরা এক নতুন ধরনের চার্চ গড়েছেন আমেরিকায়, যেখানকার যাজকরা বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু যোগীর মতো এবং তাঁদের বলা হয় বু-উ-হু-উ। কিছুই না, শুধু একটা শব্দ, যার ধ্বনি আছে কিন্তু অর্থ নেই, যেমন তাঁরা সূর্যস্তব করেন, সমবেত কণ্ঠে 'ওঁ' ধ্বনি করেন এবং অর্থহীন বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্ত্র (তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের মতো) উচ্চারণ করেন। এতেই নাকি হিপিরা একটা অতীন্দ্রিয় আনন্দের আস্বাদ পান, যা গির্জার গতানুগতিক যীশুর প্রার্থনায় পাওয়া যায় না। 'আজ আমাদের রুটি খেতে দাও, হে যীশু, লোভের পথে ঠেলে দিও না'—এই প্রার্থনার পাশে 'ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রের গভীর অনুরণনের কোনো তুলনাই হয় না। একটি উৎকট নীরেট গন্ধ, আর-একটি বাচ্যাতিরিক্ত অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিতরঙ্গ, যে-তরঙ্গের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে নিজ সত্তার গহন অন্তস্তল পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া যায়। হিপিরা এইভাবে আত্মসত্তার গহনে ডুবে যেতে চান ব'লে জপ-তপ-ধ্যানমন্ত্র ও যোগসাধনের পথ, ধর্মের ক্ষেত্রে, তাঁরা বেছে নিয়েছেন। এই পথেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাম্য প্রশান্তি।

এই সমাহিত প্রশান্তির যাত্রাপথে হিপিকুলের অন্যতম সহায় হল নেশা। নেশার মধ্যে অ্যালকহলের পরেই হল মারিজুয়ানা পট-স্মোকিং, কতকটা চরস-গাঁজা-সিদ্ধির মতো এবং তারপর এল-এস-ডি, হেরোইন ও নানরকমের সব ড্রাগ। পট-স্মোকিং, মনে হয়, ভারতীয় যোগীসাধুপুরুষদেরই প্রভাব। মারিজুয়ানা ধূমপানের অভ্যাস আমেরিকান হিপিদের মধ্যে এত দ্রুত বিস্তারলাভ করছে যে স্কুলের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাও 'থ্রিলের' সন্ধানে এইদিক দিয়ে হিপিপন্থী হয়ে উঠছে। ড্রাগের আকর্ষণও যথেষ্ট। পট-ধূমপান বা ড্রাগ সেবন ছাড়া নাকি, হিপিদের মতে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করা যায় না। স্যান ফ্রান্সিস্কোর এক হিপিচক্রাধিপতি মারিজুয়ানা-ড্রাগ-সেবনের গুণ ব্যাখ্যা করেছেন—

> I float up and up and up until I'm miles above the earth. Then I begin to come apart. My fingers leave my hands, my hands leave my wrists, my arms and legs leave my body and I just *flooooooat* all over the universe.

'মনে হয় যেন আমি উপরে, আরও উপরে, আরও উপরে ভেসে বেড়াচ্ছি, পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক মাইল উপরে। আরও কিছুক্ষণ পরে মনে হয় যেন আমি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেসে যাচ্ছি। আমার আঙুলগুলো হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, হাত দুটো কব্জি থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে, হাত-পা সব একে-একে দেহের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ফেলছে, এবং আমি কেবল ব্রহ্মাণ্ডের উপর দিয়ে উ-উ-উ-উড়-ছি।'

খণ্ড খণ্ড দেহ নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের উপর দিয়ে এরকম উড়ে ও ভেসে চলার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আজ পর্যন্ত আমেরিকা বা সোভিয়েট রাশিয়ার কোনো নভশ্চরের চন্দ্রগ্রহ অভিযানের পথেও হয়েছে কিনা সন্দেহ। যদিও বা হয়ে থাকে, তার জন্য কত হাজারকোটি টাকা যে অপব্যয় হয়েছে তার ঠিক নেই। হয়তো হিপিরা এই অঢেল অপব্যয়ের প্রতিবাদ ক'রে বলতে চান, কত সামান্য খরচে কিছু মারিজুয়ানা অথবা ড্রাগ সেবনে করলে চন্দ্রলোক অভিযানের এই অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

সে যাই হোক, পট-স্মোকিং ও ড্রাগ সেবন ক'রে হিপিদের উড়ু-উড়ু ভাবসঞ্চারের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয় না হলেও, এ বিষয়ে কোনো সমালোচনা তাঁরা একদম সহ্য করতে পারেন না। কিছু বললেই তাঁরা বলেন, 'বাইরের সমাজে 'বার-রেস্তোরাঁয়' হোটেলে-মোটেলে নাইটক্লাবে ককটেল-পার্টিতে এবং এরকম অজস্র আড্ডায় আপনাদের যে পান-ভোজন-নৃত্যের উৎসব চলতে থাকে তাতে যদি কারও কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে আমাদের হিপিদের পট-স্মোকিং ও ড্রাগ সেবনের জন্য আপনারা নীতিবাগীশের মতো চোখ রাঙান কেন? আমাদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য চিন্তা করতে হবে না, নিজেদের কথা চিন্তা করুন।' এই মনোভাবের জন্য প্রীস্ট মর‍্যালিস্ট বা সাইকোলজিস্ট কারও সমালোচনা বা সমবেদনা হিপিদের উপর একটুও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বর্তমান সমাজের মর‍্যালিস্টদের হিপিরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

বেশভূষায়, নারী-পুরুষের সম্পর্কে, মেলামেশায় ও আচরণে তাঁরা সমাজের কোনো তোয়াক্কা করেন না। কলকাতা-হাওড়া ও শহরতলিতে হিপিদের মধ্যে মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাঁদের আস্তানাও কয়েকটা এই সব অঞ্চলে আছে এবং এদেশী গুরুও আছেন। পুরুষরা আঁট-সাঁট ট্রাউজার্স বা ক্যাটা জীন পরলেও, অনেক সময় খালিপায়ে চলেন। চুল-দাড়ি অপরিচ্ছন্ন ও এলোমেলো, তার সঙ্গে মালা ও ঘণ্টা থাকে। মেয়ে-হিপিদের চুল বাঁধা থাকে না, সোজা ক'রে পিঠের ওপর ফেলা থাকে। বেশির ভাগ মেয়ে-হিপি খুব উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরেন, লাল গোলাপী বা গেরুয়া, এবং শাড়ি পরার ভঙ্গিও তাঁদের বিচিত্র, কোমরের অনেক নিচে পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া। এর নাম হয়েছে 'হিপি-স্টাইল।' আমাদের দেশের কাপড়ের মিলমালিকরা ইদানীং এই হিপি-স্টাইলে শাড়ি পরা মেয়েদের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতেও আরম্ভ করেছেন। তাতে নাকি শাড়ির কাটতি হয় ভালো।

এবং হিপি-স্টাইলে শাড়ি-পরা বাইরের মেয়েদের মধ্যেও 'পপুলার' হয়। হিপি-মেয়েরাও 'বীড' ও 'বেল' ব্যবহার করেন। অবিন্যস্ত কেশ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করলে তাঁরা জবাব দেন, এইটাই স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক ও যেটা স্বভাবধর্ম তাই তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে বেশভূষায় আচার-ব্যবহারে পালন করতে চান। অর্থাৎ প্রকৃতিবিরোধী কোনো কাজ করতে চান না।

আমেরিকার বড় বড় শহরে মধ্যে মধ্যে হিপিদেরও মিছিল বেরুতে দেখা যায়। কালো নিগ্রোদের মিছিলের মতো, বিক্ষুব্ধ তরুণ ছাত্রদের মিছিলের মতো, হিপিদের মিছিলও বিদ্রোহী তরুণদের একরকমের মিছিল। মিছিলে নানারকমের ব্যানার ও শ্লোগান থাকে—

'লিগালাইজ পট্' ছাড়া বোধ হয় হিপিদের বর্তমানে আর কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক দাবি নেই। বাকি সবই তাঁদের আদর্শের কথা—'জন্ম ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি নেই, কাজেই মধ্যের কটা দিন আনন্দ করো', 'প্রেম ভালোবাসা' 'শান্তি' 'অহিংসা' ও আরও সব ভালো ভালো কথা। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত, রুক্ষ চুল-দাড়ি, পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, সমাজসভ্যতার প্রতি আন্তরিক অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা চোখেমুখে পরিস্ফুট, সমবেত কণ্ঠে ওংকার

THER IS
NO CURE
FOR BIRTH
OR DEATH
SAVE TO
ENJOY

LEGALISE
POT

LOVE
LOVE
LOVE

ধ্বনি হ্রীঁ ক্রীং হুঁ ফট্-এর মতো কোনো তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের আড়ষ্ট উচ্চারণরত—এরকম তরুণ-তরুণী দলে দলে যখন আমেরিকার মতো যান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যের বড় বড় মহানগরের স্কাইস্ক্রেপার অটোমোবিলের ভীড়ের ভিতর দিয়ে মৌন শোভাযাত্রা ক'রে চলতে থাকে, তখন মনে হয় হাজার হাজার

কোটি টাকা মুনাফার মহাযজ্ঞে আহুতি দিয়ে চন্দ্রলোকযাত্রার চেয়ে মর্ত্যলোকের এই বিচিত্র বিদ্রোহী তরুণদের শোভাযাত্রার সামাজিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

আর যাই হন, তামাসার পাত্র নন হিপিরা। মানবসমাজের ইতিহাসে, একথা স্বীকার করতেই হবে, এ একটা অত্যাশ্চর্য বিদ্রোহ—বর্তমানের ঘুণধরা ধনতান্ত্রিক পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও যান্ত্রিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তরুণদের বিদ্রোহ। তবে 'নেগেটিভ' বিদ্রোহ যে তা আগেই বলেছি। সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ মূল্যবোধ বিচারবোধ—সমস্ত কিছু মূল্যায়নের মানদণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের কারণ কি? আগেই বলেছি, যে কারণে পৃথিবীব্যাপী তরুণ ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ, সেই কারণেই তরুণ সমাজের একাংশ হিপি-বীটনিকদের বিদ্রোহ। যে জীর্ণ জরাগ্রস্ত শ্রেণীশোষিত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহুকালের অন্যায়-অবিচার বিকার-ব্যভিচার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন যে আমেরিকার সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রতি হিপিরা হলেন 'রেড ওয়ার্নিং লাইটে'র মতো। ক্যালিফোর্নিয়ার একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে আমাদের অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের ব্যারোমিটার হলেন হিপিরা। বয়সে তাঁরা তরুণ তো বটেই, বেশির ভাগই দশের কোঠার মধ্যে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বেশি, তবে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়। যুদ্ধবিগ্রহ, বিশেষ ক'রে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, পারমাণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা, পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা, জাতিবিদ্বেষ বর্ণবিদ্বেষ, হিংসা কপটতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে হিপিদের বিদ্রোহ। উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় হিপিদের সম্বন্ধে বলা যায়:

> They have *rebelled* against society and turned away from its hypocrisy, shams and frauds. They are *against* the organization man, mass society, this computerized world we live in. They are against competition in business.

এ যুগের শিল্পোন্নত যান্ত্রিক সমাজের স্বরূপ যিনি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, এবং যিনি নাকি বর্তমানকালে, ইয়োরোপের তরুণবিদ্রোহের অন্যতম আদর্শগুরু ব'লে স্বীকৃত, সেই হার্বার্ট মারকিউসে তাঁর বিখ্যাত 'ওয়ান ডাইমেনসানাল ম্যান' গ্রন্থে এই হিপি-বীটনিকদের বিদ্রোহের তাৎপর্যের কথা ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। পরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একটি সম্মেলনে (কংগ্রেস অন দি ডায়েলেকটিক্স্ অফ লিবারেশন, ১৫-৩০ জুলাই ১৯৩০) হার্বার্ট মারকিউসে তরুণ হিপি-বিদ্রোহের তাৎপর্য আরও স্পষ্টভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন:

I would like to say my bit about the Hippies. It seems te me a serious phenomenon. If we are talking of the emergence of an instinctual revulsion against the values of the affluent society, I think here is a place where we should look for it.

পণ্যপ্লাবিত যান্ত্রিক ভূরিসমাজের জীবনবোধ ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে হিপিদের বিদ্রোহকে মারকিউসে 'সাহজিক বিদ্রোহ' বলেছেন। আমাদের ভাষায় আমরা হিপিদের সহজপন্থী বলতে পারি এবং তাঁদের বিদ্রোহকে বলা যায় 'সহজিয়াবিদ্রোহ'।

জ্যাক কেরুয়াক (বীটনিকদের 'প্রিন্স' বলা হয়) তাঁর একটি রচনায় ('ভিজন্‌স অফ জিরার্ড অ্যাণ্ড ট্রিস্‌টেস' ১৯৩০) প্রশ্ন করছেন: "মানুষকে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় কেন? কেন আমরা আশায় উদ্‌ভাসিত মানুষের প্রশস্ত ললাট লক্ষ্য ক'রে তপ্ত লৌহশলাকা ছুঁড়ে মারি?" উত্তরে একজন বলছেন: "জিরার্ড, তুমি ছেলেমানুষ, তাই এখনও জান না—জীবনটা একটা জঙ্গল, যেখানে মানুষ খাচ্ছে মানুষকে,—হয় তুমি খাবে, না হয় তোমাকে খাবে, যেমন বেড়াল ইঁদুর খাচ্ছে, ইঁদুর পোকা খাচ্ছে, পোকা চিল খাচ্ছে আবার শেষে সেই পোকা মানুষকেও খাচ্ছে।"

There's no explaining your way out of the evil of existence—'In any case, eat or be eaten'—we eat now, later on the worms eat us.

'কেন যে জন্মেছি এবং বেঁচে আছি তা বাস্তবিক ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায় না। যেটা বোঝা যায় সেটা হল—হয় তুমি কাউকে খাবে, না হয় তোমাকে কেউ খাবে, এবং আমাদের এই খাওয়া-খাওয়ি শেষ হলে অবশেষে পোকায় খাবে আমাদের।'

শ্রেণীশোষিত মানবসমাজের এই হিংস্র আরণ্যক মূর্তির বিরুদ্ধে তরুণ হিপিদের বিদ্রোহ। সভ্যতা সংস্কৃতির নামে কপটতা শঠতা ও বর্বরতার যে তাণ্ডব পৃথিবীব্যাপী চলেছে, তার বিরুদ্ধে আবেগ উদ্বেল তরুণ চিত্তের বিদ্রোহ। ব্যারিকেড, গেরিলাযুদ্ধ, হিংসার বদলে হিংসার বিদ্রোহ হল তরুণসমাজের 'পজিটিভ' বিদ্রোহ। হিপি-বিদ্রোহ 'নেগেটিভ' হলেও একই সামাজিক পরিবেশ থেকে উৎসারিত এক অভিনব সহজিয়াবিদ্রোহ। পৃথিবীব্যাপী তরুণবিদ্রোহের বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই হিপি-বীটনিক-বিদ্রোহকেও একটি তরঙ্গ ব'লে স্বীকার করতে হয়, যদিও সেই তরঙ্গের মধ্যে আঘাত হানার বা ভাঙনের উদ্দামতা নেই—আছে সহজ পথে, সমস্ত নোঙর-বন্ধনছিন্ন সহজিয়ার বেপরোয়া গতি।

বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত এবং মার্কসবাদ

জলেব উপব আগুন জ্বলছে/জ্বলন্ত আগুন জলে নিভছে না/কলিকালে হচ্ছে কি/উপাচার্য অপমানিত শিক্ষক লাঞ্ছিত/অশোভন উদ্ধত ভঙ্গি বিদ্রোহী তরুণ ছাত্রদেব/তরুণীরা বেণী দুলিযে স্কুটারেব পেছনসীটে দুবন্তবেগে উধাও/লোকসভা বিধানসভায কেবল হাও-হাও-হল্লা/কর্পো-রেশন থেকে পরিবাব বা শ্মশান কোথাও শান্তি নেই শুধু ধস্তাধস্তি ঘুষোঘুষি ছুরিভোজালি/চাঁদে হাঁটছে নভোচব বাহাদুব আর্মস্ট্রঙ ভূচব দ্বিপদ চতুষ্পদ বেবাক অবাক/কোটি কোটি ডলারের বন্যায় যদি চন্দ্রগ্রহে ঘাঁটি গেড়ে কোনো মাবণাস্ত্র নিক্ষেপ ক'বে এই দুষ্টগ্রহ পৃথিবীটাকে আবার চাঁদের মতো জীবনশূন্য জীবশূন্য করা যায়/ঢাল নেই তলোযাব নেই হতভাগ্য নিধিবামবা গেবিলাফোকো থেকে বল্লম আর হাতবোমা নিয়ে নিউক্লিয়াব বোমার মালিকদের শাসায়/দুর্গাপুর দমদম ক্যানিং কেরল রুশচীনসীমান্ত সর্বত্র কমরেডি কাটাকাটি কে সাচ্চা কে ঝুটা বিপ্লবী লেনিনশাস্ত্রমতে/এদিকে মন্দির মসজিদ মোল্লা পুরোহিত বক্ষা করা দায়/তাব উপর মাছের পেটে বোমা কিশোর ছেলের হাতে বোমা সিনেমাব সীটে বোমা পোস্টব্যাগে বোমা হাসপাতালে বোমা বিবাহ বাসবে বোমা শবযাত্রায বোমা পবীক্ষাহলে বোমা/কালে কালে হল কি ঘোব কলি এল কি বুড়োবুড়িদের কান্না বানপ্রস্থীদের উষ্মা চেয়াবম্যানদেব দেডবেগতী হাঁই দুর্ভাবনায় পুঁজিপতিদের পেট ফুলে ঢাঁই/মহানগরের পথে পথে দেহবেচা দু'টো টাকায় ফুচ্‌কা চৌরঙ্গির স্ট্যাণ্ডে স্ট্যাণ্ডে ময়দানে ঘুরপাক খাওয়া হোটেলবারে খানাপিনার হল্লা বাজাব মন্দা মদ্যপানাধিক্যে সরকাবী আয়বৃদ্ধি খাদ্যাভাবে বেসবকারী আয়ুক্ষয়/বাবা তারকনাথের জয়ধ্বনিতে আকাশ কম্পমান পার্টিনেতার বক্তৃতার করতালিতে মেদিনী কম্পমান/মহানগরের

অলিগলিতে শত শত আশ্রমে ঐশী গুরুদের আত্মপ্রকাশ/হরিসভায় ভিড় ব্রাহ্মসভার শূন্যগৃহে চামচিকের উপদ্রব/উত্তর-অকটরলোনি শহীদ মিনারের পাদপীঠে বেকার সমকামুকদের দিবানিদ্রা/মুক্ত মেলায় কবিতাপাঠ বাউলগান হিপি তরুণ-তরুণীদের বিচরণ/বোম্বে ডাইঙের সুইটহার্টশাড়ি স্কুটারশাড়ির বিবস্ত্র বিজ্ঞাপন/মুক্ত অঙ্গনে অ্যাবসার্ড ড্রামার অভিনয়/বিবসনা চিত্রতারকার পোস্টার দেয়ালে/চীনে হোটেলে প্লাটনদের কিউ/পার্কস্ট্রীটের ম্যাডহাউসে মত্ততার কলরব/লেনিনশরণির অলিগলিতে বোতল আর ছিপি আর পিপে আর পাপের বন্যাস্রোত শিককাবাব আর গোস্ত/পলিমাটির স্যাঁতসেঁতে মহানগরের অন্ধকার কানাচে গেরিলাফোকো/শেক্‌সপীয়রশরণির চারিদিকে রূপচাঁদ পক্ষীর গান 'ক্ষুদ্র লোক হয় রুদ্র ধন অহংকারে/ধনহীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে'/চায়ের পেয়ালার ধোঁয়ায় সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন আর চেঁ গুয়েভারার কথা/রাইটার্স বিল্ডিঙে খাঁটি বিপ্লবীদের পদধ্বনি এবং উত্তম চিত্রতারকাদের পদধূলিতে অভূতপূর্ব শিহরণ চিত্তচাঞ্চল্য/হরিনাম সত্য না ভিয়েৎনাম সত্য কামানজয়ী ক্ষমতা সত্য না ভোটজয়ী ক্ষমতা সত্য তা ঈশ্বর জানেন অথবা লেনিন/মনে হয় প্রতিদিন মৃতের মর্মরমূর্তিতে আর শরণির নামকরণে যেন মহানগরটা একটা প্রাগৈতিহাসিক মেগালিথিক মহাশ্মশান তার মধ্যে আবার অতিবৃদ্ধ ফকিরের কণ্ঠে গান 'জগতে মানুষ কেহ নাই, মনের মানুষ কোথা পাই' তার মধ্যে আবার মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী বিদেশী কৃষ্ণভক্তদের চৌরঙ্গির পথে পথে খোলকরতাল সহ নাম গান হরেকৃষ্ণ হরেরাম, সমস্তই যেন তান্ত্রিক বীজমন্ত্র হ্রীঁ ক্রীঁ হুঁ ফট্‌-এর মতো দুর্বোধ্য।

সমাজ-জীবনের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্র দিয়ে কোনো 'মন্তাজ' রচনা করা সহজসাধ্য নয়। পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজ পর্যন্ত মনে হয় যেন জীবনের সুরতালছন্দমাত্রা সব ভেঙেচুরে গেছে, কোথাও আর পরিচিত রাগরাগিণীর আলাপ আর শোনা যায় না। এত বিচিত্র বেসুর দিয়ে সিম্‌ফনি রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু গড়নের যেমন ছন্দ আছে ভাঙনেরও তেমন ছন্দ আছে, সৃষ্টির যেমন তাল আছে, স্থিতির তেমন তাল আছে, লয়েরও তেমন তাল আছে। আজকের বেসুর বেতাল বেআব্রু জীবন যত আপাতবিসদৃশ উৎকট হোক না কেন, তারও একটা আন্তরমিল আছে এবং সেটা খুঁজে বার করার দায়িত্ব আছে বুদ্ধিমান মানুষের অর্থাৎ 'বুদ্ধিজীবীদের'।

মাত্র একপুরুষকালের মধ্যে মানুষের ধ্যানধারণা রীতিনীতি আশাভরসা স্বপ্নবাসনা আদর্শ আস্থা সমস্ত কিছুর মূল পর্যন্ত যেন উপড়ে গেছে হঠাৎ। একটা বেয়াড়া ঝড়ে। বহুকালের বাহ্যস্থিতি এবং এই অকস্মাৎ নির্মূলনের মধ্যে কালিক দূরত্ব এত কম বলেই বুদ্ধিমানদের বিভ্রান্তি এত বেশি। অথচ পুরনো

ঘোলাটে চশমা খুলে একটু তাকালেই দেখা যায় যে যুগযুগান্তের বহুবিঘোষিত হৃষ্টপুষ্ট আদর্শের বিস্তীর্ণ ভাগাড থেকে এই ঝড়ের উৎপত্তি। বেশি নয়, একটা দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। 'ফ্রীডাম' (স্বাধীনতা) বা মুক্তির আদর্শের কথা অনেক কাল ধরে আমরা শুনে আসছি। আর্থিক স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, কত বকমের স্বাধীনতার নিটোল গোলাকার চকচকে সব বুলি। কিন্তু আজ শোনা যায় এই সমস্ত 'স্বাধীনতা'র গোরস্থান থেকে কেবল পাগলের আকাশফাটা অট্টহাসি। বিগত তিনচারশো বছরের ইতিহাসের ময়লা পাতাগুলোর উপর একবার চোখ বুলোলেই দেখা যায় সভ্যতার অগ্রগতির পথে সাধাবণ মানুষের উপর যত অত্যাচার ও বর্বরতার নির্বিকার অনুষ্ঠান হয়েছে তার অধিকাংশই এই 'স্বাধীনতা'র নামে। প্রচার করা হয়েছে 'স্বাধীনতা'যেন 'দেবতা', কিন্তু সেটা মিথ্যা প্রচার,আসলে 'স্বাধীনতা' ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয়কালের জারজ সন্তান। যেমন আর্থিকবাণিজ্যিক স্বাধীনতার নামে সমাজে দারিদ্র্যের প্রসাব এবং শোষণযন্ত্রের বিস্তার হয়েছে, যার ফলে সমাজে ও মানুষের জীবনের স্তরে স্তরে পরাধীনতার নাগবন্ধন দৃঢ় হয়েছে। ধনতন্ত্রেব ক্রমবিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার মুখোশ পরে ব্যক্তিদাসত্বেব অভিনব নৃত্য চলেছে। এক একটা বিপ্লবের বিলোড়ন থেকে এক একটি 'স্বাধীনতা'ব প্রত্যয় উদ্ভূত হয়েছে, তারপর সেই বিপ্লবের নায়কদের প্রভুত্ব বজায়ের স্বার্থে রচিত বিধিবিধানেব বেদীমূলে সেই স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়েছে। আজও ইতিহাসের এই আবৃত্তি শেষ হয়নি। ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক কোনো সমাজেই হয় নি। চণ্ডসিদ্ধদের চতুরালিতে বহুকালের ভূত যে তাদের স্কন্ধ থেকে নামেনি এবং কোনো পরাধীনতার ছাঁদন ছেঁড়েনি, সে বিষয়ে আজ সাধারণ মানুষের চৈতন্যের উদয় হয়েছে। অবিমিশ্র ঘৃণা, প্রতিহিংসা, জ্বালানী জিঘাংসা দিয়ে এই সমুত্থিত* চৈতন্যের প্রতিটি পরত গঠিত। এবং কেবল শাসকশোষক, চতুর চণ্ডসিদ্ধ, বুলিসর্বস্ব বিপ্লবী বা স্বেচ্ছাচারীদের দিকে এই চৈতন্য ধাবিত নয়, তাদের প্রতিমূর্তি এই সমাজের সংস্থাপ্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র গঠন বিলোপের দিকে চালিত। প্রাজ্ঞরা বলবেন, এ হল হাস্যকর নৈরাজ্যবাদ, বালখিল্যের বিদ্রোহবিলাস। তা নয়, একেবারেই তা নয়। ন্যাপলামের সঙ্গে হাতবোমা, হাইড্রোজেন বোমার পাশে বল্লম তীরধনুক, বাসি বুদ্ধির বিচারে হাস্যকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ ক'রে আমাদের মতো স্বার্থচতুর আরামকেদারী বুদ্ধিবিলাসীদের কাছে ভয়ংকর হাস্যকর এবং গৌতম-গান্ধীর দেশে তো বটেই। কিন্তু একেবারেই তা নয়। আমাদের মতো ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে পূর্বসংস্কার পরিহার ক'রে অথবা বদ্ধধারণার মোহমুক্ত হয়ে বর্তমান সামাজিক-রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের আন্তর তাৎপর্য বোঝাই সম্ভব নয়, কারণ শ্রেণী হিসেবে

শাসনশোষণের নির্যাতনযন্ত্রণা বুদ্ধিজীবীদের কোনোদিন তেমন ভোগ করতে হয়নি। ইতিহাসে চিরদিন তাঁরা প্রধানত শাসকশ্রেণীর পারিষদের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁদের মজুতবুদ্ধিতে বর্তমান সামগ্রিক নৈরাজ্য-বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করা যাবে না। এমন কি যাঁরা বিপ্লবী তাঁরাও যদি তাঁদের গতানুগতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নতুন ক'রে revolutionize না করেন, তাহলে বর্তমানের 'Revolution in the Revolution'-এর প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটন করা তাঁদের পক্ষেও অসম্ভব।

নৈরাজ্যের অথবা বিদ্রোহের অথবা বিপ্লবের পূর্বধারণা বর্তমান সমাজে অচল। কারণ এর জাত আলাদা। যন্ত্রবিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতির যুগে, সমগ্র মানবসমাজ নিশ্চিহ্ন করতে পারে এরকম নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নির্যাতিত মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় গেরিলাবাহিনী গঠন ক'বে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সংকল্প করে যে পদে পদে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তারা মুক্তির পথে, প্রকৃত স্বাধীনতাব পথে অগ্রসর হবে, তখন মনে হয় না কি যে এ বিদ্রোহের জাত আলাদা! বহুকালেব নির্যাতন পীড়ন শোষণ ও বৈপ্লবিক শঠতার বিরুদ্ধে এ হল সমগ্র মানবসত্তার বিদ্রোহ। এ হল 'instinctual revolt', 'biological hatred'-এব বিস্ফোরণ (Marcuse ১, Political Preface, 1966)। নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রেব সামনে নিরস্ত্র মানুষেব সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের অঙ্গীকার হল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্নায়ুপেশী শিরা-উপশিরা দিয়ে প্রতিরোধ-সংগ্রামের অঙ্গীকার। দেহের প্রতিটি অঙ্গ তাব অস্ত্র এবং দেহের ভিতরে স্নায়ুপেশী শিরায় শিরায় যখন ঘৃণা ও প্রতিহিংসাজনিত জিঘাংসার আলোড়ন হয় তখন প্রতিটি অঙ্গ বুলেট-দুর্ভেদ্য হয়ে উঠে, বজ্রমুষ্টি ও অ্যাটমবোমাকে রুখে দাঁড়ায়। যেমন কিউবায় ভিয়েৎনামে বলিভিয়ায়, যেমন তরুণবিদ্রোহে ছাত্রবিদ্রোহে। যেমন চন্দ্রগ্রহজয়ী আমেরিকান দৈত্যদের ন্যাপলামী নৃশংসতার বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামীদের "বজ্রমুষ্টির প্রতিরোধ, যেমন চেকোস্লোভাকিয়ায় ব্রেজনেভী স্বাধীনতা উপঢৌকনের বিরুদ্ধে চেক-জনসাধারণের নিজস্ব স্বাধীনতাসংগ্রাম।

সেই 'স্বাধীনতা'! চারজন তরুণী ও একজন তরুণ বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের কার্যালয়ের সামনে চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক সতীত্ব রক্ষার্থে সোভিয়েটের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন উলঙ্গনৃত্য ক'রে এবং সমবেত দর্শকদেব সামনে সোভিয়েট পতাকা অগ্নিদগ্ধ করার পরে পোশাক পরিধান ক'রে ঘরে ফিরে যান[১]। উলঙ্গনৃত্য

বজ্রমুষ্টি সবই আদিম ব্যাপার। 'biological hatred'-এর প্রকাশ বলেই আজকের গণবিদ্রোহে আদিমতার উপাদান এত বেশি। অস্থির অশান্ত অবাধ্য তরুণ ছাত্রদের কাছে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামক 'বিদ্বান'-উৎপাদনের কারখানার উপাচার্য-অধ্যাপকদের নাজেহাল বা অপমানিত হওয়া নিশ্চয় তরুণীদের উলঙ্গ প্রতিবাদনৃত্যের মতো আদিম বা অশোভন নয়, অতি নগণ্য ব্যাপার মাত্র।

প্রশ্ন হল, এবং খুব বড় প্রশ্ন, আজকের মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কেবল মাত্রিক নয়, এরকম চারিত্রিক পরিবর্তনের কারণ কি? যে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এগুলি ঘটছে তার প্রকৃতি অনুধাবন করতে না পারলে জনসংগ্রামের এই পর্বান্তর দুর্বোধ্য মনে হবে। প্রথম ও প্রধান কারণ হল, গত একশো বছরের মধ্যে নিপীড়িত মানুষের একমাত্র অবলম্বন ও অনুপ্রাণনার উৎস বৈপ্লবিক মার্কসীয় চিন্তাধারায় পরিপার্শ্বের পয়োনালী থেকে রাশি রাশি আবর্জনা এসে ঢুকেছে এবং তার ফলে মানবেতিহাসের সবচেয়ে বেগবতী বলিষ্ঠ চিন্তাপ্রবাহের পথে অনেক পঙ্কিল আবর্ত, অনেক বদ্ধসংস্কারের ডোবা, অনেক বিকার বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মর্মান্তিক হল যে দেশে অর্ধশতাব্দীর উপর মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত যে দেশ ছিল সারা পৃথিবীর শাসিতশোষিতের শ্রেষ্ঠ আশাভরসাস্থল, সেই দেশ (সোভিয়েট ইউনিয়ন) হয়েছে আজ মার্কসীয় চিন্তাবিকৃতির প্রধান নায়ক। তার সমস্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করার অবকাশ এখানে নেই, কিছু কারণ সংক্ষেপে আমরা উল্লেখ করব। তবে মূল কারণ মনে হয়, মার্কসীয় চিন্তাধারায় মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তের প্রাধান্য, এমনকি মার্কসীয় বিপ্লবোত্তর কালেও। তাই মধ্যবিত্তসুলভ যাবতীয় গোঁড়ামি সংস্কার চিত্ত-দৌর্বল্য স্বার্থপরতা আত্মম্ভরিতা সুবিধাবাদ আজ মার্কসীয় চিন্তাধারাকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। এরই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায়, মার্কসীয় পার্টিগত নেতৃত্বে পুরুষান্তর ব্যবধান (generational gap) বেড়েছে, উপরে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন প্রভুত্ব কায়েমের ফলে, এবং এত বেড়েছে যে প্রবীণ প্রৌঢ়দের সঙ্গে তরুণ যুবকদের চিন্তাধারার কোনো সংযোগ নেই। আজ পৃথিবীব্যাপী তরুণবিদ্রোহ ছাত্রবিদ্রোহ এবং 'student power' বা 'youth power' নামে

of 50 onlookers last night, the protesters put their clothes on and walked away—' (*Reuter*). সোভিয়েট সামরিক অভিযানের বছরপূর্তি উপলক্ষে চেক-জনসাধারণ ও তরুণরা সর্বত্র সোভিয়েটবিরোধী বিক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ ক'রে শোভাযাত্রা করে। ব্রেজনেভনীতির বিরোধী মস্কোর ১৬ জন বুদ্ধিজীবী এই উপলক্ষে চেকবাসীদের জানান: 'We declare our solidarity with the people of Czechoslovakia, who wished to prove that *socialism with a human aspect* is possible.' (Moscow, August 21, 1969—(*Reuter*)—Italics লেখকের।

তৃতীয় শক্তির (শ্রমিক কৃষক ছাড়া) অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণও এই পুরুষান্তর বিচ্ছেদ। গণতন্ত্রের নামে সর্বত্র বৃদ্ধপ্রৌঢ়তন্ত্রের প্রতিপত্তি, ডেমক্রাসির পরিবর্তে জেরনটোক্রাসি, বৈপ্লবিক মার্কসিস্ট পার্টিতেও। এক নতুন শাসকশ্রেণী আমলাশ্রেণীর আবির্ভাব, অচল অটল অনড়।

দ্বিতীয় কারণ, যে-ধনতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎপত্তি, পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্রমোন্নতির ফলে সেই ধনতন্ত্রের আদত রূপ ঠিক থাকলেও বাহ্যরূপের এমন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে যা পঞ্চাশ বছর আগেও সম্ভব হয়নি। এমনকি পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও ধনতন্ত্রের বর্তমান রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি। অত্যুন্নত বস্তুশিল্পসমাজে আজও বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির দরুন সাধারণ মেহনতী মানুষের দুঃখ-ক্রমবৃদ্ধির (increasing immiseration) যে প্রাথমিক মার্কসীয় ধারণা তা আজ অনেকটাই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কারণ বস্তুবিজ্ঞান ও টেকনোলজির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আজ ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এমন এক উন্নত স্তরে পৌঁছেচে এবং প্রচারকলাকৌশলে এমন এক লোভনীয় শিখরে ভোগেচ্ছাকে উন্নীত করা হয়েছে এবং নিয়ত হচ্ছে যে মেহনতী মানুষ তাতেই নেশাখোরের মতো বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। কৃত্রিম পণ্যময় সমাজে এক বিচিত্র সুখোচ্ছ্বাসের তরঙ্গে ও দিবাস্বপ্নে সকলে সর্বদা ভাসমান। মূলধন ও মেহনত, মালিক ও মজুর, বড়সাহেব ও ছোটকেরানী সকলে আজ একই তরণীর সহযাত্রী, অদম্য ভোগেচ্ছা-তরণীর, সামাজিক অপচয়ের দিগন্তবিস্তৃত পণ্য-সমুদ্রে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও তাঁর লেডি টাইপিস্টের মনের গড়নে কোনো পার্থক্য নেই, কারখানার মালিক ও শ্রমিকের শ্রেণীগত বিরোধ শ্রমিকের ক্রমবর্ধিষ্ণু সুখলালসার অন্তরালে ঝাপসা হয়ে গেছে। অত্যুন্নত পণ্যশিল্পসমাজের এই টেকনোলজিক্যাল ঔদার্য অস্বীকার ক'রে, তার অকৃপণ ভোগেচ্ছাপূরণের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা ক'রে, শতকরা ক'জন মেহনতী মানুষ বা কারখানার শ্রমিক আজ তার অন্তরালবর্তী ধনতান্ত্রিক কঙ্কালের দিকে চেয়ে দেখবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তার আকঙ্কাল পরিবর্তনে উৎসাহিত হবে? অথচ এই উন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে মার্কসীয় আত্মবিচ্ছেদের (alienation) সত্যতা শতগুণ বেশি অকাট্য প্রমাণিত হয়েছে। যদিও তার আদল পালটে গেছে, তাহলেও বর্তমান উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে এই আত্মবিচ্ছেদের ব্যাদান মানুষের মনে যে অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই আত্মবিচ্ছেদের ফলে বেদনা নৈরাশ্য আত্মবিকার সমাজে ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়েছে, বৈপ্লবিক চেতনায় মরচে ধ'রে গেছে আরও বেশি। কাজেই সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, আধুনিক উন্নত ধনতন্ত্র ও তার টেকনোলজিক্যাল উল্লম্ফন সমাজটাকে এমন এক বিশাল মধুচক্রে রূপান্তরিত করেছে

যার মধ্যে মানুষ মৌমাছির মতো আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। উৎপাদনযন্ত্রের মতো প্রশাসনযন্ত্রেরও চরম টেকনোলজিক্যাল উন্নতি হয়েছে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে বর্তমান সর্বজনতন্ত্র বা mass democracy-র নিয়ন্ত্রণ। এই ধনতান্ত্রিক সমাজের সর্বজনতন্ত্রের বিশেষত্ব হল এও একটা 'অ্যাপারেটাস' 'ইনস্ট্রুমেণ্ট' অর্থাৎ যান্ত্রিক মুখোশ বা অবগুণ্ঠন, যার অন্তরালে উৎপাদন-উৎসাদনের কলাকৌশলসহ রাষ্ট্রনায়করা সহজেই গা ঢাকা দিতে পারেন এবং কি পরিমাণ মানবিক শক্তি অপচয় ক'রে সমাজে তাঁরা পণ্যসুখ বিতরণ করছেন তাও লোকচেতনা থেকে অপসারিত করতে পারেন২। এই অবস্থায় উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিহতি (containment of social change) আজ অনস্বীকার্য রূঢ় সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে (Marcuse ২, ৩)। অথচ এই অবস্থা যে ধনতন্ত্রের অতিবার্ধক্যের উপসর্গ অথবা তার প্রাস্থানিক পর্ব তা প্রায় মানুষের বোধশক্তি থেকে বিলীয়মান।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতির এই পর্যালোচনা বর্তমান সমাজের জনবিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চারিত্রিক পরিবর্তনের কারণগুলির উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু পর্যালোচনার আরও একটু বিস্তার প্রয়োজন। তা না হলে আজকের তরুণের বিদ্রোহ অথবা নিরস্ত্র নিপীড়িত মানুষের সশস্ত্র বিপ্লবের অঙ্গীকারের মূলপ্রেক্ষণ সম্ভব নয়।

একালের ধনতন্ত্রের উপসর্গগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, উৎপাদন ও উৎসাদন, ভোগনিবৃত্তি ও উৎপীড়ন-দমন, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, যুক্তি ও অযুক্তি, এই ধরনের বিপরীতধর্মী সমাজকর্মগুলি একটি অবিচ্ছেদ্য অখণ্ডমূর্তিতে, যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণে জনমানসে প্রতিভাত হয়। ধনতান্ত্রিক Welfare State হল Warfare Stateএর নামান্তর এবং তার লক্ষ্য হল 'progressive brutalization and moronization of man' (Marcuse, ৩)। উনিশ শতকে, এমন কি বিশ শতকের প্রথম পর্বেও, ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীবিরোধের যে মার্কসীয় চিত্র বেশ স্পষ্টাকারে দেখা যেত, পরবর্তীকালের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে তা অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। উন্নত টেকনোলজির যুগে ধনতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান রূপ দেখলে মনে হয় না যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের সেই আদিরূপ অবিকৃত আছে এবং তাদের

পরস্পরসংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে[৩]। তাছাড়া টেকনোলজিক্যাল গতির প্রবণতাই হল টোটালিটেরিয়ান বা সামগ্রিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দিকে। পণ্যশিল্পোন্নত সমাজের উৎপাদন-বণ্টনের টেকনিক্যাল কলাকৌশল (অটোমেশনের অগ্রগতিসহ) শুধু যে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম পেশাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, সমগ্র আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চাহিদা থেকে সেই চাহিদানিবৃত্তির উপাদান পর্যন্ত নির্ধারণ করে। লক্ষণীয় হল টেকনোলজির এই পূর্ণ কর্তৃত্বের প্রভাব বর্তমানে উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের চৌহদ্দি পেরিয়ে অনুন্নত অর্ধোন্নত ক্রমোন্নত সমাজে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি 'ক্যাপিটালিজম্' ও 'কমিউনিজম্'-এর বিকাশের মধ্যেও উপসর্গগত সাদৃশ্য স্থাপন করেছে (Marcuse, ২)।

অগ্রসর ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীগত বিস্ফোরণ-সম্ভাবনা যে অনেক কমে গেছে তা অস্বীকার করার অর্থ হল বাস্তব ইতিহাস অস্বীকার করা। শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয়েছে ঐকত্রিক দরকষাকষির আন্দোলন, বাজারের ক্রেতাবিক্রেতার মতো, তার মধ্যে বিদ্রোহ-বিপ্লবের কোনো নামগন্ধ নেই, তার কোনো চৈতন্যও নেই। তার ফলে 'লেবর অ্যারিস্তক্রাসি' 'হোয়াইট কলার ইউনিয়নিজম্' এবং অবিমিশ্র 'ইকনমিজম্' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে 'সামাজিক শ্রেণী' সম্বন্ধে বনেদী মার্কসীয় প্রমিতির (Marxian concept) ক্ষেত্রে। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশেষ ক'রে) সামাজিক শ্রেণীর মার্কসীয় বিচারপদ্ধতিকে এবং মার্কসীয় বিন্যাসকে সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌রা এত তরল ও ঘোলাটে ক'রে দিয়েছেন যে তার লেজামাথা কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় না। আমেরিকান ফরাসী ও জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্‌রাই এই শ্রেণীভেদ তরলীকরণের কাজে অগ্রণী হয়েছেন সবচেয়ে বেশি, বিশেষ ক'রে আমেরিকানরা। বস্তুত সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ফলনপ্রাচুর্য আমেরিকার অগ্রসর ধনতান্ত্রিক সমাজের উর্বর টেকনোলজিক্যাল জমিনেই সম্ভব হয়েছে, কারণ এই দু'টি বিদ্যার অন্তরঙ্গ সহযোগিতাও এই সমাজের সঙ্গে সর্বাধিক। এখানে প্রসঙ্গত ফরাসী ছাত্রবিদ্রোহের (১৯৬৮) কথা মনে পড়ছে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ছাত্ররা (Nanterre বিশ্ববিদ্যালয়ের) তাদের পাঠ্যবিষয় অনাবশ্যকভাবে অত্যন্ত অ্যাকাডেমিক মনে ক'রে পরীক্ষা বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মিলিতকণ্ঠে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান ক'রে

এবং 'Why do we need sociologists?' নামে একটি প্রচারপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিলি করে। এই প্রচারপত্রে বর্তমানকালের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বক্তব্যের মধ্যে দু'তিনটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বক্তব্য, অ্যাকাডেমিক সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বুজরুকি বর্তমান ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিক্যাল সমাজের ফাঁকা প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। দ্বিতীয় বক্তব্য, সামাজিক মনোবিজ্ঞান নামক বিদ্যাটি এই ধনতান্ত্রিক সমাজের আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয় বক্তব্য, 'American sociologists have discarded the very concepts of classes and the class struggle, substituting the theory of a continuous scale of increasing status.'[৪] আমেরিকা নয় শুধু, অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।

যন্ত্রজগতের টেকনিকের মতো আধুনিক সমাজবিজ্ঞানও কেবল অন্তঃসারশূন্য টেকনিকের ('methodology' বলা হয়) কসরত, বিচিত্র প্রমিতিক যুযুৎসু এবং নিছক পারিভাষিক ভোজবাজি প্রদর্শনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। দু'তিন কিলোগ্রাম ওজনের, গড়ে আশীনব্বুই টাকা মূল্যের আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানীদের বইগুলিতে দেখা যায় সারবস্তু সামান্য, বাগাড়ম্বর অত্যধিক এবং অসহ্য। এহেন সমাজবিজ্ঞানের উৎপাদনও আমেরিকায় অটোমোবিল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। আর এই আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রভাববিস্তার, বিশেষ ক'রে এশিয়ার অনুন্নত অর্ধোন্নত দেশগুলিতে, লক্ষণীয় ব্যাপার। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে আমেরিকান ডলারের আমদানি ও ইনভেস্টমেন্টের মতো আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানেরও (ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানসহ) আমদানি হয়েছে। উভয়ের উদ্দেশ্য একই, মার্কসীয় নীতির ভিত্তিক্ষয় করা, শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণী-সংগ্রাম শ্রেণীভেদবোধ সম্বন্ধে মার্কসীয় মানগুলিকে নস্যাৎ করা। যেমন আধুনিক ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকানদের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁদের গবেষণা ও কাজকর্ম প্রধানত আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানীদের রীতিনীতি অনুযায়ী পরিচালিত[৫]।

সমাজে 'শ্রেণী' ব'লে গণ্য হতে পারে এরকম স্থিতিশীল কোনো মানবগোষ্ঠী নেই এবং শ্রেণীর কোনো অবিচল সংজ্ঞাও নির্দেশ করা যায় না। এই হল

৫ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে (যেমন ভারতে) আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের বই সুলভ মূল্যে প্রকাশ ও বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তা ছাড়া গত কুড়ি বছর ধ'রে আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানীরাই প্রধানত ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের গুরুগিরি করেছেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তেমনি ইতিহাস, অর্থনীতি ও নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতিপাদ্য। *class stratum status elite* এবং এই ধরনের কতকগুলি প্রত্যয়ের সাহায্যে বর্তমান সমাজের গতিশীল রূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, শুধু 'শ্রেণীর' মতো কোনো বদ্ধধারণা দিয়ে করা যায় না। ক্লাস স্ট্রেটাম স্টেটাস এলিট এগুলিরও আবার উঁচুনিচু স্তরভেদ আছে অনেক এবং স্তর থেকে স্তরান্তরে ওঠানামার সুযোগ সম্ভাবনাও আছে সমাজে। সুযোগ সম্ভাবনা সকল মানুষের সমান নয় এই পর্যন্ত, অবস্থাগুণে ও বংশগুণে 'automatic increment'-এর দৌলতে (Schumpeter, ১) কারও সুযোগ বেশি, তার অভাবে কারও কম। কিন্তু মনোভঙ্গি বাল্যকাল থেকে দৃঢ় হলে (যেমন 'achievement orientation'—McClelland) এই সুযোগের অসমতা অতিক্রম করা খুব কঠিন নয়। বিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যার গুণে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজটাকে মনে হয় যেন 'snake and ladder' খেলার বোর্ডের মতো। ব্যক্তিদের খেলার গুণে, এবং সমাজবিজ্ঞানীদের social mobility-র ইন্দ্রজালগুণে লেজ থেকে মাথায় ওঠা যায়। মইয়ের নিচের ধাপ থেকে উপরের ধাপে লাফ দিয়ে ওঠা যায়, আবার নামাও যায়। সমাজে সকল মানুষই 'ক্লাইম্বার' এবং মুনাফা জীবিকা প্রতিষ্ঠা সব কিছুর অবাধ প্রতিযোগিতা হল মই-মই খেলার মতো। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সামাজিক 'মোবিলিটি'র এমনই মাহাত্ম্য যে সামান্য 'লেবর' বা 'ফার্মার' বা 'লোয়ার মিড্‌ল'—চেষ্টা ও লক্ষ্য থাকলে—স্বচ্ছন্দে ধনী অতিধনী কর্পোরেট-ধনীর স্তরে (Wright Mills ২) আরোহণ করতে পারেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে কতখানি বাষ্পীয় পদার্থ মনে করেন, তা নিচের তালিকা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

Metropolitan 400	Upper Middle	
Celebrities	Middle	
Very Rich	Lower Middle	
Chief Executives	Opportunity-class	Wootton
Managers	Snob-class	Wootton
Corporate Rich	Maladapted	Wootton
Power Elite	Middle class mobiles	Gans
Elite	Routine-Seekers	Gans
White collar	Action-Seekers	Gans
Old Middle	Labour	
New Middle	Farmer	

উপর থেকে নিচে দু'দিকে দু'টি তীরলাইন দিলে 'সোশ্যাল মোবিলিটির' ডায়েগ্রামও তৈরি হয়ে যায়। এই তালিকাটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, 'শ্রেণী' নামে সামাজিক পদার্থটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর হাতেকলমে কতখানি তরল হয়ে গেছে, মার্কসীয় ধারণার এক কণাও তার মধ্যে অবশিষ্ট

নেই। আসলে 'শ্রেণী' কি বস্তু, বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীদের মতে? 'A man's class is a part of his ego, *a feeling on his part of belongingness to something* : an *identification* with something larger than himself' (Centers). এরকম বিচিত্র শ্রেণীসংজ্ঞা আরও অনেক উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আপাতত একটিই যথেষ্ট। যে-কোনো মানুষের শ্রেণীবোধ তার অহমিকারই প্রতিচ্ছবি, একটা কিছুর সঙ্গে তার একাত্মতার অনুভূতি এবং তার চেয়ে বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে তার অভিন্নতাবোধ। এরকম শ্রেণীর সোপান দিয়ে যদি সমাজ গঠিত হয় তাহলে তার মধ্যে বিরোধ বা সংঘাত, মার্কসীয় অর্থে, থাকতে পারে না। রেষারেষি হানাহানি রাহাজানি সবই থাকতে পারে, শুধু মার্কসীয় অর্থে শ্রেণীসংঘাতজনিত বিদ্রোহ বা বিপ্লব ছাড়া।

সমাজবিজ্ঞানীদের শ্রেণীব্যাখ্যানের এই তাবল্যেব মধ্যে আরকিছু না-হোক আধুনিক উন্নত ধনতন্ত্রের যন্ত্রীকৃত সমাজের ভিতরের চেহারাটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কসীয় শ্রেণীসমাজের মডেল এবং শ্রেণীবিরোধের মূল প্রত্যয় ধূলিসাৎ করা তাঁদের লক্ষ্য হলেও, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যে মার্কসীয় 'প্রলেটারিয়েট' দ্বারা ঘটানো বেশ কঠিন, এই সত্যই তাঁরা পরোক্ষে প্রমাণ কবতে চেয়েছেন। পুঁজিপতি-মালিক আর শ্রমিকে প্রাক্তন সম্পর্কের স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষতা সবকিছুই আজ অতিজটিল টেকনোলজি-ক্যাল পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে (Marcuse, ২)। কার্ল মার্কস অবশ্য পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ভবিষ্যৎ চেহারাবদল তাঁর দূরদৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন এবং আধুনিক জয়েন্টস্টক কোম্পানি ও কর্পোরেশন, অথবা কোঅপারেটিভ ও শিল্পরাষ্ট্রীকরণের ফলে মূলধনের গোত্রান্তরও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। জয়েন্টস্টক কোম্পানি বা কর্পোরেশনের বিকাশের ফল যে 'complete alienation of capital from the real producers, and its opposition as alien property to all individuals really partici-pating in production, from the manager down to the last day-labourer' (Capital, III)—এ সত্য মার্কসের অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি দিয়ে যা তাত্ত্বিক সত্য হিসেবে বুঝেছিলেন, তার প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। মালিকানা (ownership) ও পরিচালনার (control) বিচ্ছেদের ফলে একদিকে যেমন ম্যানেজার মজুরের সামাজিক ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মালিকরা প্রত্যক্ষ উৎপাদনক্ষেত্রের অন্তরালে থেকে তাঁদের শোষণভূমিকা নিশ্চিন্তে সক্রিয় রাখার সুযোগ পেয়েছেন। এই বিশ্লেষণের পরবর্তী ধাপে এগিয়ে গেলেই বলতে হয়, 'capitalists without function' yield to the 'functionaries

without capital' এবং ধনতান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্রের বিশেষ কোনো সাদৃশ্য নেই আগেকার কালের 'full capitalist'-দের সঙ্গে (Dahrendorf)[৬]। এঁদের জাতই আলাদা।

মূলধন ও পুঁজিপতিশ্রেণীর এই গোত্রান্তরের মধ্যে যন্ত্রীকরণের অবাধগতি অব্যাহত রয়েছে এবং তার ফলে ভোগ্যপণ্যের অফুরন্ত প্রবাহ সমাজের মেহনতী মানুষের সর্বস্তরে, কারখানার মজুর থেকে কর্পোরেশনের ম্যানেজার পর্যন্ত, এমন এক সুখোচ্ছ্বাসের রুমোজ্জ্বল মোহ বিস্তার করেছে যে তাদের শ্রেণীচেতনা তো দূরের কথা, শ্রমদাসত্বের বেদনা পর্যন্ত আজ বিলীয়মান। সর্বজনসমাজের (mass society) প্রসার্যমান গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্তমান ধনতন্ত্রের অত্যন্ত শক্তিশালী চতুর রাজনৈতিক কৌশল, যেজন্য সাধারণ মানুষের দাসত্ববেদনা ও তজ্জনিত বিদ্রোহী মনোভঙ্গি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেছে আরও বেশি। তাই দার্শনিক মার্ক্যুসে বলেছেন[৭] : 'A comfortable, smooth, reasonable, democratic *unfreedom* prevails in advanced industrial civilization, a token of technical progress'. দাসত্বের (unfreedom) বিশেষণগুলি অনুধাবনীয়—মনোরম স্বচ্ছন্দ যুক্তিযুক্ত গণতান্ত্রিক দাসত্ব। এই দাসত্বের বন্ধনমুক্তির জন্য অধীর আগ্রহ অথবা কঠোর সংগ্রামেচ্ছা কি আজ উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে মার্কসীয় বৈপ্লবিক চেতনার প্রেরণায় জাগা সম্ভব? তাহলে কি বিদ্রোহ-বিপ্লব চিরদিনের মতো আজকের ধনতান্ত্রিক যন্ত্রীকৃত সমাজ থেকে নির্বাসিত হবে? তা হবে না। সেই মুক্তিসংগ্রামের ডায়েলেক্‌টিক্‌স হবে অন্যরকম।

তার আগে মার্কসীয় আত্মবিচ্ছেদের সমস্যার কথা কিছু বলা প্রয়োজন[৮]। শ্রমিক ও তার শ্রমোৎপন্ন পণ্যের নিঃসম্পর্কতা ধনতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই নিঃসম্পর্কতাই আত্মবিচ্ছেদ ও মানুষের খণ্ডিতসত্তার মূল উৎস। এই আত্মবিচ্ছেদের বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস তাঁর *Capital* গ্রন্থে পণ্যভূতপূজা নামে (Commodity Fetishism)। তার আগেই তাঁর

৬. C. Wright Mills তাঁর *White Collar* গ্রন্থে The Managerial Demiurge অধ্যায়ে, *The Power Elite* গ্রন্থে The Chief Executives, The Corporate Rich ও The Power Elite অধ্যায়ে, William H. Whyte তাঁর *The Organization Man* গ্রন্থে এই মূলধনের গোত্রান্তরজনিত সামাজিক শ্রেণীচিত্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত J. K. Galbraith-এর *The Affluent Society* দ্রষ্টব্য।

৭. এটি Herbert Marcuse-এর *One Dimensional Man* গ্রন্থের উদ্বোধন লাইন, unfreedom কথাটির উপর জোর দিয়েছি আমি।

৮. মার্কসীয় 'alienation' সম্বন্ধে 'পরিশিষ্টের' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রথমদিকের রচনায় (অসম্পূর্ণ notes) মার্কস এই আত্মবিচ্ছেদের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন :

'Under the prevailing economic conditions, the realization of labour appears as its opposite, the negation of the labourer. Objectification appears as loss of and enslavement by the object, and appropriation as alienation and expropriation.'—*Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.*

পরবর্তী অনেক রচনায় মার্কস এই আত্মবিচ্ছেদের বিস্তারিত বিশ্লেষণব্যাখ্যা করেছেন তাঁর *Critique, The German Ideology, Capital,* প্রভৃতি গ্রন্থে (Marcuse ৪, ২৭৩-৮৭)। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের অতিজটিল যন্ত্রপিঞ্জরে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নয়, সর্বশ্রেণীর কর্মরত মানুষের মধ্যে এই আত্মবিচ্ছেদবোধ ভয়াবহরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। তার ফলে দাসত্বচেতনা লুপ্ত হয়েছে এবং যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের দাস যারা তারা আজ 'sublimated slaves' হলেও আসলে যে অকৃত্রিম দাসানুদাস সেই বোধ নেই। কারণ, বাধ্যতা দিয়ে অথবা কঠোর মেহনত দিয়ে দাসত্ব বিচার করা যায় না। যন্ত্র-জগতে একটি উপযন্ত্র বা নাটবল্টুর মতো থাকা এবং বস্তুজগতে নিছক বস্তুতে পরিণত হওয়াই হল আসল দাসত্ব। আত্মবিচ্ছেদের সঙ্গে এই দাসত্ববোধলোপ হল যন্ত্রীকৃত সমাজের লক্ষণ।*

আধুনিক সমাজে আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষ অনেক নামে পরিচিত—'stranger' 'free floater' 'outsider,' এমন কি 'existentialist' পর্যন্ত বলা যায়। সে যেমন ডস্টয়েভস্কির underground-এর মানুষ, তেমনি কামুর outsider, তেমনি নিউইয়র্ক ও অন্যান্য মহানগরের 'lonely 'crowd'-এ নির্জন মানুষ। মহানগরের বিপুল জনস্রোতে সে নির্জনতার দ্বীপে নির্বাসিত। প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি ঘৃণা দুঃখ বেদনা আনন্দ অনুকম্পা অনুভূতি সবই তার কাছে হৃদয় নামক কম্পিউটারের স্নায়ুঝংকার-গণনা। কেউ কেউ বলেন একালের অস্তিবিবেকবাদী (existentialist) জীবনদর্শন এই আত্মবিচ্ছিন্নতারই একটা বিশেষ দার্শনিক রূপ মাত্র। ধর্মবিশ্বাসের মূল যেদিন থেকে নড়ে গেছে, যেদিন থেকে মানুষ হত্যা করেছে ঈশ্বরকে (নীট্‌শের সেই পাগলের ভাষা 'Whither is God. I shall tell you. We have killed him—you and I.'), সেদিন থেকে তার চিরন্তন জীবনের প্রত্যয়েরও মৃত্যু হয়েছে। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে বিশাল এক শূন্য প্রান্তর, কোনো রঙ নেই, একমাত্র

* ফরাসী মনীষী Francois Perroux-এর ভাষায়, 'Slavery is determined neither by obedience nor by hardness of labour but by the status of being a mere instrument, and the reduction of *man* to the state of a *thing*'. (Marcuse 2, p. 41)

অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর নিথর কালো রঙ ছাড়া[৯]। এযুগের বড় বড় কারখানায় পণ্যোৎপাদনের যান্ত্রিক ছন্দের সঙ্গে শ্রমিকের দৈহিক প্রতিক্রিয়ারও কোনো মিল নেই, সেই ছন্দের কোনো মাত্রার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, সে শুধু নিছক উপযন্ত্র মাত্র। কাজেই উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ চরম স্তরে পৌঁছেছে[১০]। তার বাইরে যে বিশাল প্রশাসন সংগঠন ও বিজ্ঞাপনের জগৎ, সেখানকার আত্মবিচ্ছেদ অন্যদিক থেকে আরও ভয়াবহ। এই আত্মবিচ্ছেদের সমগ্ররূপ কি?

> Internal darkness, deprivation
> And destitution of all property,
> Dessication of the world of sense,
> Evacuation of the world of fancy,
> Inoperancy of the world of spirit :
>
> T. S. Eliot, *Burnt Norton*

সমগ্র সত্তা আবৃত ক'রে এই যে গভীর অন্ধকার, অরণ্যময় গ্রাম্য শ্মশানের অমানিশার মতো এই যে শূন্যতা ও রিক্ততাবোধ, এই হল বর্তমান সমাজজীবনে মানুষের আত্মবিচ্ছিন্নতার অভিশাপ। এই শাপমোচন যন্ত্রায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজে অসম্ভব।

ধনতন্ত্রের উদ্‌যোগ ও মধ্যপর্ব পর্যন্ত শিল্পীসাহিত্যিকদের artistic alienation-এর ঊর্ধ্বায়ন হত একরকমের বিদ্রোহের মধ্যে, সাধারণভাবে বলা যায় ধনতান্ত্রিক জীবনদর্শন ও জীবননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। রোমান্টিক কাব্যে এবং নাটক গল্প উপন্যাসের অ-সাধারণ সব চরিত্রের মধ্যে—যেমন 'the artist, the prostitute, the adulteress, the great criminal and outcast, the warrior, the rebel-poet, the devil, the fool'—যারা কেউ স্বাভাবিক নিয়মে উপার্জন ক'রে অর্থাৎ মেহনৎ ক'রে বেঁচে থাকে না। প্রচলিত সমালোচনার মানদণ্ডে একে 'রোমান্টিক' বলা হয়, কিন্তু এ হল শিল্পীদের নিজস্ব অবাধ্যতা ও প্রতিবাদ, কোনো আরোপিত কৃত্রিম জীবননীতির বশ্যতা স্বীকার না করা। আজকের যন্ত্রোন্নত ধনসমাজে এই শিল্পীসুলভ আত্মবিচ্ছিন্নতার ঊর্ধ্বায়ন আর প্রয়োজন নেই, শিল্পীদের 'great refusal'-এর দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই দেখা যায় আজকের 'the vamp, the national

*৯. Daniel Bell এবিষয়ে তাঁর *The End of Ideology* গ্রন্থে (Glencoe, 1960) আলোচনা করেছেন।

১০, Eli Chinoy : *Automobile and The American Dream* (N. Y. 1955) দ্রষ্টব্য। এরকম কারখানাকেন্দ্রিক অনুসন্ধান আরও অনেক হয়েছে।

hero, the beatnik, the neurotic housewife, the gangster, the star, the charismatic tycoon perform a function very different from and even contrary to that of their cultural predecessors' (Marcuse, ২ তৃতীয় অধ্যায়)। এসব চরিত্র আগেকার বারাঙ্গনা সমাজত্যাজ্য খুনী শিল্পী বিদ্রোহীদের মতো 'images of another way of life' নয়, এরা হল 'freaks or types of the same life, serving as an affirmation rather than negation of the established order' (Marcuse ২, পৃ ৬০)। অর্থাৎ শিল্পীর বিচ্ছিন্নতাবোধের উধ্বর্ায়নের বদলে আজ অবনয়ন (desublimation) হয়েছে। এই অবনয়নের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল বর্তমান শিল্পসাহিত্যে ও সিনেমায় যৌন উপাদানের বাহুল্য ও চরম বিকৃতি। আগেকার সাহিত্যশিল্পে (ধনতান্ত্রিক যুগের) বৈধ-অবৈধ প্রেম, যৌন-সম্ভোগ, কামকেলি সবই রূপায়িত হ'ত সামগ্রিক আরতিক (erotic) মূর্তিতে। তখন যৌনজীবনের একটা 'landscape' ছিল, যার মধ্যবর্তিতায় 'libidinal experience' পূর্ণতালাভ করত। সেই ল্যাণ্ডস্কেপ অটোমোবিলের যুগে মহানগরের স্টীলকংক্রীট ও ম্যাকাডামাইজড পথে একেবারে মুছে গেছে। তার ফলে আজকের যৌনজীবন 'de-eroticized' হয়ে গেছে, মানুষ হয়েছে শিশ্নোদরপরায়ণ এবং যৌনজীবন হয়েছে কেবল শিশ্নকেন্দ্রিক। ফ্রয়েডীয় ভাষায় বলা যায় 'Eros'-এর যুগ শেষ হয়ে গেছে, বর্তমান যুগ 'Sexuality'-র যুগ। এই 'localization and contraction of libido, the reduction of erotic to sexual experience and satisfaction' (Marcuse ২, পৃ ৭০), আজকের সাহিত্যশিল্পসিনেমায় প্রতিফলিত এবং 'বিজ্ঞাপন' নামক প্রচারকলাতেও।

শুধু সাহিত্যশিল্পসিনেমায় নয়, পোশাকপরিচ্ছদেও আঙ্গিক যৌনচেতনা অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরিচ্ছদ হয়েছে বহিরঙ্গের প্রসারণ মাত্র—'an extension of the outer surface of the body' (McLuhan)। আমেরিকান মহিলাদের পোশাক প্রসঙ্গে ম্যাকল্যুহান বলেছেন, 'the American woman for the first time presents herself as a person, to be touched and handled, not just to be looked at,' অর্থাৎ পোশাক পরে সেজেগুজে আজ আর মহিলারা শুধু বলতে চান না 'আমাকে ছাখো', তাঁরা যেন বলতে চান 'আমাকে স্পর্শ করো, নেড়েচেড়ে ছাখো' (McLuhan, পৃ ১২১)। আমেরিকায় নয় শুধু, সকল দেশেই, ভারতবর্ষে ও বাংলা দেশেও, পোশাক সম্বন্ধে ম্যাকল্যুহানের কথা সত্য হয়ে উঠেছে। পোশাকও 'de-eroticized' হয়েছে। তার উৎকট প্রকাশ হচ্ছে আধুনিক

বিজ্ঞাপনে (advertisement)[১১] এবং সিনেমায়। চটকদার ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞাপনের কথা বলেছেন ম্যাকলুহান—'The art of advertising has wondrously come to fulfil the early definition of anthropology as 'the science of man embracing woman' (McLuhan, পৃ ২২৬)। পোশাকপরিচ্ছদের বিজ্ঞাপন (যেমন শাড়ি, বক্ষাবরণী), সিগারেটের বিজ্ঞাপন, ইলেকট্রিক ফ্যানের বিজ্ঞাপন (হাওয়াতে শয্যার উপরে মহিলার শাড়ি উড়ছে), স্কুটারের বিজ্ঞাপন (পেছনসীটে মহিলার চুল ও শাড়ি উড়ছে), সিনেমার পোস্টারের কথা তো বলাই বাহুল্য—সর্বত্র শুধু নারীর বিশেষ অঙ্গকেন্দ্রিক যৌনাকর্ষণ[১২]। যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজ যেন নারীকে স্বাধীনতার মোহে ভুলিয়ে তাকেই সবচেয়ে বেশি যান্ত্রিক পণ্যে ও উপযন্ত্রে পরিণত করেছে এবং পর্যাপ্ত ভোগ্যপণ্যের মতো মানুষের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির পথও চারিদিক থেকে খুলে দিয়েছে। সে-পথ বিকারবিকৃতির পথ হলেও পুরুষ-নারী কারও চৈতন্য নেই। এবং সে-স্বাধীনতা যে কোন্ জাতের স্বাধীনতা তা টাইপরাইটার-টেলিফোনের যুগের লেডিটাইপিস্ট ও 'কল্-গার্ল'দের কথা ভাবলেই বোঝা যায়:

> 'The typewriter and the telephone...have taken over the revamping of the American girl with technological ruthlessness and thoroughness....The prostitute was a specialist, and the call girl is not. A 'house' was not a home; but the call-girl not only lives at home, she may be a matron.' (McLuhan, ২৬৫-৭৪)।

যন্ত্রোন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের এই মনোরম গণতান্ত্রিক 'unfreedom' ও ভোগবিলাসের স্বাচ্ছন্দ্য দেখলে তার আমূল পরিবর্তন অথবা বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্বন্ধে কোনো পন্থা নির্দেশ করা, অন্তত মার্কসীয় নীতি অনুসারে, বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অভ্যস্ত চিন্তাধারায় বিপ্লব-বিদ্রোহের কোনো সম্ভাবনাও এই সমাজে বিশেষ দেখা যায় না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির মৃতপ্রায় অবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়, যদিও দুই দেশে বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন এবং অভিজাত পেশাদার একশ্রেণীর মজুরনেতার আবির্ভাব অনেককাল হয়েছে। যে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে শক্তিশালী গণপার্টি হওয়া উচিত ছিল, মার্কসীয় নীতি অনুসারে, সেখানে কেন

---

১১. Colin Golby: Eroticism in Modern Advertising *(Penguin Survey of Business and Industry. 1965)*.
Vance Packard: *The Hidden Persuaders*, Pelican 1962.

১২। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন ও মন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আজ তা কয়েকজন কমিউনিস্ট তত্ত্ববিলাসীর ঘরোয়া বৈঠকখানায় পরিণত হয়েছে তা ভেবে দেখা কর্তব্য। ফ্রান্স ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি ইয়োরোপের মধ্যে বড় শক্তিশালী পার্টি, অভিজ্ঞতাও দীর্ঘকালের, কিন্তু আকৈশোর আমরা দেখে আসছি এই দুই পার্টির নেতৃবৃন্দের যেমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি, তেমনি তার শক্তিব হ্রাসবৃদ্ধিও উল্লেখ্য কিছু হয়নি, বিপ্লবের বদলে ভোটনীতিই পার্টির কর্তৃপক্ষের প্রভুত্বরক্ষার প্রধান কৌশল হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার কারণ কি? প্রধান কারণ, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের এতাবৎ-কালের মহাতীর্থ সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লবের কিছুদিন পর থেকে সমাজতন্ত্রের গতিপথে মার্কসীয় নীতির প্রয়োগপদ্ধতিতে নানারকমের গলদ বিচ্যুতি বিভ্রান্তি ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে এই যে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংস্কারবাদী নীতির (Revisionism) শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তির জোবে আজ সে ছোট ছোট প্রতিবেশী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকেও তার তাঁবেদারি করার জন্য হুকুম দিচ্ছে। একথা ঠিক যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংস্কারবাদী ধারা প্রবর্তনের জন্য মূলত দায়ী পার্টির কর্ণধার স্তালিন, যদিও সোভিয়েত রাষ্ট্রের দৃঢ় বনিয়াদ গঠনে তাঁর দান স্মরণীয়, কিন্তু যাঁরা স্তালিনের মৃত্যুর পরে বিপ্লবীর ছদ্মবেশে 'de-Stalinization'-এর ঢাকঢোল বাজিয়ে বর্বরের মতো স্তালিনকে কবরান্তরিত পর্যন্ত করেছেন, তাঁরা আজ সংস্কারবাদকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতাব যে ঘৃণ্য স্তর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছেন, আত্মম্ভরিতা সত্ত্বেও দৃঢ়চিত্ত স্তালিন আজ বেঁচে থাকলে তা নিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এই সংস্কারবাদী প্রতিক্রিয়ার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আজ মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ নয় শুধু, দুই কমিউনিস্ট শিবিরের সম্পর্ক আজ ক্যাপিটালিস্ট-কমিউনিস্ট শত্রুতার চেয়েও ভয়ংকর। এইটাই হল বর্তমান পৃথিবীব গতিশীল ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ মর্মান্তিক ঘটনা।

কিন্তু এই মর্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে হলে মার্কসীয় সংস্কারবাদের উৎপত্তি, বিস্তার ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্তত তার উপসর্গগুলি জানা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলা যায়—যুদ্ধ ও শান্তিনীতি, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে শ্রেণীবিরোধ সমাধানের নীতি সম্পর্কে মার্কসীয় বিচারভঙ্গির পার্থক্য থেকে সংস্কারবাদের উৎপত্তি। ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী শত্রুবেষ্টিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সংকটকালে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির সাময়িক প্রয়োজন থাকলেও, পরে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রাকালে, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পরে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রাম যখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার ভিতর দিয়ে আগেকার উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মধ্যে শ্রেণীবিরোধ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করল, তখন সহাবস্থান হয়ে দাঁড়াল ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতারই নামান্তর। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আলজিরিয়া, কিউবা, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে, কঙ্গো, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েট, ফরাসী, ইটালি ও অন্যান্য সমভাবাপন্ন কমিউনিস্ট পার্টির বকধার্মিক মনোভাবে এবং পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদী-সহযোগিতার নীতি অনুসরণে। শুধু তাই নয়, নিউক্লিয়ার বোমার ভয় দেখিয়ে পর্যন্ত সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি (যে-বোমার বড় মালিক সোভিয়েট ও আমেরিকা) শ্রেণীসহযোগিতার নীতি চালু করতে চেয়েছে এবং দুঃখের বিষয় যে ফ্রান্স ও ইটালির কমিউনিস্ট নেতারা তার প্রতিধ্বনি করেছেন[১৩]। তাজ্জব যুক্তি! ইতিহাসে যদি এতদিন বন্দুক কামান ট্যাঙ্ক বোমারু বিমান সমাজের শ্রেণীগড়ন ও শ্রেণীবিরোধ নিশ্চিহ্ন করতে না পেরে থাকে, তাহলে নিউক্লিয়ার বোমার মারণশক্তি অনেক বেশি মারাত্মক ব'লে সমাজ থেকে শ্রেণীগুলি পর্যন্ত আজ লোপ পাবে কেন, অথবা অহিনকুলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হবে কেন? একথাও অতিরঞ্জিত নয় যে নিউক্লিয়ার বিশ্বযুদ্ধ হলে মানবসভ্যতা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শুধু সেই সম্ভাবনায় বা বিভীষিকায় সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য 'অটোমেটিক্যালি' অন্তর্ধান করবে কেন? এসব কথাবার্তার শব্দতরঙ্গ যদি গোরস্থানের মাটির গভীরে প্রবেশ করে তাহলে মার্কস ও লেনিন উভয়ের শুকনো হাড়গুলো পর্যন্ত কবরের তলায় কেঁপে উঠবে। শ্রেণীসহযোগিতার উদ্দেশ্যে মার্কসীয় নীতির নিউক্লিয়ার ব্ল্যাক-মেইলিঙেও আজ সোভিয়েট পশ্চাৎপদ নয়। এই নীতির পরিপূরক হল— পৃথিবীতে আজ আর কোথাও কোনো বিরোধ নেই, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের বিরোধ ছাড়া। এ-ধারণাও সোভিয়েটের বদ্ধমূল। এর নির্গলিতার্থ হল ধনতন্ত্রের প্রতিভূ আমেরিকা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো বিরোধ নেই কোথাও। এই বিরোধের সমাধানের পথ হল হোয়াইটহাউস-ক্রেমলিনের সভাকক্ষে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের আলোচনা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ, নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা, স্পেস-ফ্লাইটের প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান,

---

১৩. …'the nuclear bomb does not adhere to the class principle'—Open letter of the CC of CPSU, 14 July 1963, '…atomic weapons have changed the very nature of war'—Togliatti, L'Unita, 22 January 1962. এই ধরনের আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। শ্রীসমর সেন সম্পাদিত *Frontier* পত্রিকায় Monitor লিখিত 'On Marx' প্রবন্ধ (১.৬.৬৮—২৯.৬.৬৮) দ্রষ্টব্য। গ্রন্থের শেষে 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে জমকালো অধিবেশন ও বক্তৃতা এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতা (অবশ্যই foreign aid-সহ)। আর্থিক ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল হল ধনতান্ত্রিক market economy-র প্রসারণ এবং কেন্দ্রগত পরিকল্পনার (সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের) অন্তরালে ধনতন্ত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখা (ব্যক্তিগত মূলধনের বিলোপ সত্ত্বেও)[১৪]। সোভিয়েট সমাজে তাই মানুষের যান্ত্রিক শ্রমদাসত্বের অবসান হয়নি, নতুন যুক্তি ও আদর্শের নাগপাশে তার বন্ধন অনেক বেশি দুশ্ছেদ্য হয়েছে :

> 'the transition from capitalism to socialism appears, in spite of the revolution, still as quantitative change. The enslavement of man by the instruments of his labour continues in a highly rationalized and vastly efficient and promising form.'—Marcuse ২, পৃ ৪৮

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এই নির্গুণ মাত্রিক গতির ফলে সোভিয়েট সমাজের গড়নেরও কোনো মৌল গুণগত পরিবর্তন কিছু হয়নি, বরং দেখা যায় অনেক দিক থেকে যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান গড়নের সঙ্গে তার সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে। অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টে (১৯৩৯) স্তালিন বলেছিলেন, সোভিয়েট সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের পার্থক্য এই যে সোভিয়েটে কোনো 'antagonistic, hostile classes' নেই, শোষিতশ্রেণী বিলুপ্ত হয়েছে এবং শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা—'who make up Soviet society'—বন্ধুর মতো সহযোগীর জীবন যাপন করে—'live and work in friendly collaboration'। কাজেই স্তালিন ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন যে সাম্যবাদী সমাজের উচ্চতর স্তরে উত্তরণ—রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলোপ, পার্টির বিলোপ, সীমিত শ্রম ও পর্যাপ্ত ভোগ, সকল রকম দৈহিক মানসিক বন্ধনমুক্তি—ধীরেসুস্থে উন্নত কৌশলে (যান্ত্রিক) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসারের ভিতর দিয়ে সম্ভব হবে ('the continuous expansion and perfecting of socialist production on the basis of higher technique'), তার জন্য আর কোনো সামাজিক সংগ্রাম বা আলোড়নের প্রয়োজন হবে না[১৫]। ধনতন্ত্র থেকে (যদিও জারের রাশিয়াকে সামন্ততন্ত্র-

ধনতন্ত্রের মিশ্রণ বলতে হয়) সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের গতিপথে কেবল কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোককে সোভিয়েট পদ্ধতিতে purge ক'রে, সমাজকে স্থির শান্ত রেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, আগেকার ফিউডাল ও বুর্জোয়াশ্রেণী, তাদের বংশধর, নতুন বুর্জোয়াভাবাপন্ন শ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, সকলে হৃদয়ের পরিবর্তনের ফলে de-classed হয়ে যাবে, স্তালিনের এই বিশ্লেষণ থেকে এই কথাই ভাবতে হয়। কিন্তু কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষে তা ভাবা বোধহয় সঙ্গত নয়। আমেরিকান অর্থবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরাও তাঁদের সমাজের ভবিষ্যৎ 'classlessness' সম্বন্ধে এইভাবে চিন্তা করেন। সোভিয়েট নায়কদের এই অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে একজন সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন[১৬] :

> This means by way of evolution, in the same sort of way in which Americans who, while taking the 'optimistic' view, do not yet regard the American society of today as a 'classless' society, visualize the further democratization of the United States.

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকে মনে করেন 'historical changes in the social structure may well give substance to the American creed of 'classlessness.' (Sjoberg)। অর্থাৎ আমেরিকারও 'ক্রীড' হল 'শ্রেণীহীনতা' এবং সমাজগড়নের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে সেই 'ক্রীড' বাস্তব সত্য হতে পারে। আমেরিকানরা শুধু সোভিয়েটের মতো 'সোশ্যালিস্ট' কথাটি ব্যবহার করেন না, তার পরিবর্তে 'ডেমক্রাটিক' কথা ব্যবহার করেন, এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন হল তাঁদের মতে ডেমক্রাসি ও টেকনোলজির ক্রমপ্রসার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের টেকনোলজিক্যাল উন্নতির ফলে গণতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে 'শ্রেণীহীন সমাজ' প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনেরও টেকনিক্যাল উন্নতির ফলে 'শ্রেণীহীন সমাজ' গঠন সম্ভব। একই পদ্ধতিতে সম্ভব, ধীরেসুস্থে মন্থরগতিতে ('gradual change'), বিনা ঝঞ্ঝাটে, বিনা বিদ্রোহ-বিপ্লবে আলোড়নে। তাছাড়া নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের যুগে বিদ্রোহ-বিপ্লব তো অবাস্তব দিবাস্বপ্ন মাত্র, কারণ তার আতঙ্কে সামাজিক 'শ্রেণী'-ই তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে!

অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে ধনতান্ত্রিক সমাজের যে রূপায়ণ সম্ভব তার পরিচয় আগে দিয়েছি, আমেরিকান সমাজের শ্রেণীগড়নের আলোচনা প্রসঙ্গে।

সোভিয়েট সমাজে ব্যক্তিগত মূলধন ও মুনাফার বিলোপের ফলে (যা নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং যার জন্য আমেরিকা বা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য অবশ্যই আছে) আজ সেখানে কোনো কোটিপতি ধনিকশ্রেণী নেই বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত তিনশ্রেণীর (শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী) সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক টেকনোলজিক্যাল উন্নতি ও প্রতিযোগিতার ফলে আজ সেখানেও 'ম্যানেজেরিয়াল রেভল্যুশন' হয়েছে, মর্যাদা (status) ও কৃতিত্বমুখী (achievement-oriented) সামাজিক স্তরের (social strata) অভিনব বিন্যাস হয়েছে। আমেরিকার মতো 'কর্পোরেট ধনী'র বিকাশ না হলেও, কেন্দ্রগত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ফলে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার ব্যুরোক্রাট ও নতুন মধ্যশ্রেণীর বিস্ময়কর বিস্তার হয়েছে[১৭]। এঁদের কোনো ধনিকশ্রেণীর দাসত্ব করতে হয় না, কেবল রাষ্ট্রনেতাদের (অর্থাৎ পার্টি বস্-দের) দাসত্ব করতে হয়। তার উপর সোভিয়েট রাষ্ট্রযন্ত্রের আর্থিক-সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই ম্যানেজার-ব্যুরোক্রাট-নব্যমধ্যশ্রেণীর প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বেড়েছে এবং সোভিয়েট অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতির সংস্কারবাদী আদর্শের প্রতিক্রিয়ায় ক্রমে আরও বাড়ছে। যত বাড়ছে তত সংস্কারবাদী চিন্তা সোভিয়েট সমাজে দৃঢ়মূল হচ্ছে (অবশ্য এই নতুন মধ্যবিত্ত সমাজে), তত ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার ব্যগ্রতা বাড়ছে, তত নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ও স্পেসস্যাটেলাইটের ক্রমোন্নতির দ্বারা পৃথিবীতে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের বিচিত্র ধারণা উগ্রতর হচ্ছে এবং বিপ্লবচিন্তাকে 'ব্যাক্‌ডেটেড' ব'লে বিদ্রূপ করার প্রবৃত্তি জাগছে। সোভিয়েট সংস্কারবাদকে তাই সেখানকার সোশ্যালিস্ট সমাজের নতুন ম্যানেজার-ব্যুরোক্রাট-মধ্যবিত্তের মার্কসীয় চিন্তাধারা বলা যায়।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল এই উভয়সংকট থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কি? একদিকে যন্ত্রোন্নত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের আরামদায়ক অধীনতা, অন্যদিকে যন্ত্রোন্নত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজের আর্মচেয়ারী ক্রমবিকাশতত্ত্ব, এই উভয়সংকট থেকে মানুষের মুক্তি কোন পথে? রাজনৈতিক কর্মীদের তো বটেই, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর—বিশেষ ক'রে যাঁরা মার্কসীয়

১৭. Ralf Dahrendorf *Class and Class Conflict in Industrial Society*, London, 2nd Impression, 1961. এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'Karl Marx's Model of the Class Society,' দ্বিতীয় অধ্যায় 'Changes in the Structure of Industrial Society Since Marx' এবং তৃতীয় অধ্যায় 'Some Recent Theories of Class Conflict' এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। এ ছাড়া *Transactions of the Third World Congress of Sociology*-র (1956) মধ্যে সোভিয়েট সমাজবিজ্ঞানীদের papers এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

সমাজচিন্তার অনুগামী—তাঁদের আজ এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। যাঁরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান, অথবা নিজেদের প্রমাণকে সমস্ত প্রমাণের উর্ধ্বে স্থান দিতে চান, অথবা ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মতো তর্কের ধূম্রজাল বিস্তার ক'রে মার্কসীয় তত্ত্বের অভিনব টীকা করতে চান, তাঁদের স্বার্থ কি তা আজকের দিনে বুঝতে কষ্ট হয় না। পেন্টাগন ও ক্রেমলিনের মনোলোভা রজতজালে জড়িয়ে থাকাই তাঁদের কাছে নিরাপদ পন্থা। আমাদের মতো যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের অধীনদেশের সদ্যোমুক্ত বুদ্ধিজীবী—জ্যঁ পল সার্ত যাঁদের 'walking lies' বলেছেন[১৮]—ফ্যানন যাঁদের বলেছেন 'know-all, smart, wily intellectuals', অর্থাৎ যাঁরা সবজান্তা কেতাদুরস্ত চতুর, যাঁরা বর্তমানে জাতীয় গভর্নমেন্টের লুণ্ঠন-পরিকল্পনার বুদ্ধির যোগানদার ও সহযোগী অংশীদার, তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয়[১৯]। তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিযুক্তির, ধ্যানধারণার পুরাতন শিকড় উপড়ে ফেলা রীতিমতো কঠিন। কিন্তু যে-শিকড়ে পচন ধরেছে তা উপড়ে ফেলাই ভালো এবং যদি তার কোনো জীবন্ত শাখা থাকে তাহলে তা নতুন মাটিতে রোপণ করাই শ্রেয়।

আধুনিক যন্ত্রায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজের মুক্তিসমস্যা বাস্তবিকই জটিল। কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি কাম্য হলে সহজ পথ অনেক আছে, সবই চোরাগলি ও বাঁকাপথ। যেমন আত্মহত্যা। প্রতিদিন পৃথিবীতে এখন গড়ে একহাজার ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তার আটগুণ (অর্থাৎ আট হাজার) আত্মহত্যার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ প্রতিবছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যার পথে এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি কামনা করে[২০]। আত্মহত্যা ছাড়া আছে আত্মবিচ্ছেদবোধজনিত ব্যর্থতার দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করা, অথবা হিপি-বীটনিকদের মতো (যাদের 'new boheme' 'poor refuge of defamed humanity' বলা যায়, (Marcuse ১, পৃ ১৭)

---

১৮. Frantz Fanon : *The Wretched of the Earth*, Penguin 1969, 'Preface' by Jean-Paul Sartre : 'The European *elite* undertook to manufacture a native *elite*. They picked out promising adolescents ; they branded them as with a red-hot iron, with the principles of western culture, they stuffed their mouths full with high-sounding phrases···These walking lies had nothing left to say to their brothers ; they only echoed'.

১৯. 'We find in them the manners and forms of thought picked up during their association with the colonialist bourgeosie. Spoilt children of yesterday's colonialism and of today's national governments, they organise the loot of whatever national resources exist'. Fanon, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প ৩৭।

বিচিত্র বিদ্রোহীর বেশে দিন কাটানো। আত্মহত্যাও প্রতিবাদ, হিপি-বীটনিক-বিদ্রোহও প্রতিবাদ, তবে 'ট্রেডিশান্যাল' প্রতিবাদ নয়, কারণ পুরাতন পদ্ধতিতে প্রতিবাদের পথ আধুনিক one-dimensional সমাজে প্রায় বন্ধ। তবে এই প্রতিবাদের লক্ষ্য বিকৃত ব্যক্তিমুক্তি, সুস্থ সমাজমুক্তি নয়।* সমাজমুক্তির লক্ষ্য নিয়েও প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সম্ভব, নতুন পদ্ধতিতে। কাদের দ্বারা সম্ভব? দার্শনিক মার্কুসে বলেন, 'the substratum of the outcasts and outsiders, the exploited and persecuted of other races and other colours, the unemployed and the unemployable' (Marcuse ২, পৃ ২০০)। মার্ক্যুসে প্রবীণ মার্কসীয় পণ্ডিত হলেও তাঁর এই ভয়ংকর উক্তি (কৃষকমজুরশ্রেণীবর্জিত) অ-মার্কসীয় বলতে হয়। মার্ক্যুসে তাঁর এই সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের মধ্যে যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে অধিক নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিয়েছেন, যদিও তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। শ্রমিক-আন্দোলন যদি ইকনমিজম্ ও রিফর্মইজমের সংস্কারমুক্ত ক'রে প্রকৃত বৈপ্লবিক আদর্শে গ'ড়ে তোলা যায়, তাহলে শ্রমিকদের স্বখাচ্ছন্নতা দূর হবে, শ্রমদাসত্বচেতনা তীব্র হবে এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের পাশে তারা প্রবল সংহত শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া যন্ত্রোন্নত ধনসমাজে যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাংশে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে, এমন কথা বলা মার্কসবাদসম্মত নয়। বৈপ্লবিক সম্ভাবনা যে নিশ্চয় আছে তা ফ্রান্সের তরুণবিদ্রোহে শ্রমিকশ্রেণীর একাংশের সহযোগিতা থেকে বোঝা যায় (ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও)[২১]। তবে ঐতিহাসিক অবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং মারণাস্ত্রোন্নত রাষ্ট্রের বিকট ও ব্যাপক মারমূর্তির ফলে এই বিদ্রোহের রূপ অন্যরকম হতে বাধ্য। সশস্ত্র শাসকদের সুসংগঠিত violence-এর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র শোষিতদের বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন violence-ও এর আংশিক প্রকাশ হতে পারে। এমনও সম্ভব যে নিরস্ত্রদের অস্ত্র হবে আদিযুগের পাথুরে হাতিয়ার (এমন কি জীবজন্তুর 'corporeal tools' হাত পা নখ দাঁত পর্যন্ত) থেকে যে-কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ও বিস্ফোরক। দেহের সমস্ত স্নায়ুপেশীর সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে সেগুলি তারা নিক্ষেপ করবে জৈবিক ঘৃণাবোধ থেকে, বর্তমান শোষণদমনযন্ত্রের বিরুদ্ধে। তারা ব্যারিকেড করবে, বর্তমান আইন-শৃঙ্খলার শিকল ছিঁড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, প্রতিরোধ করবে। শৃঙ্খলাবাদীদের শাস্ত্রবচন ও শাসানি, হিংস্রতার প্রতিমূর্তিদের মুখে অহিংসার বাণী, কোনো কিছুতে তারা কর্ণপাত করবে

* এই গ্রন্থে 'হিপি-বীটনিক-বিদ্রোহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২১. Cohn-Bendit : পূর্বগ্রন্থ, পৃ ৯১-১০৩, ১৪৭-৬৮।

না। অনেককাল করেছে, আজ আর করবে না। আজকের বিদ্রোহীদের এই violence বালখিল্যের আস্ফালন নয়, বর্বর বৃত্তির পুনরুজ্জীবন নয়, নিছক প্রতিবাদ বা ক্রোধপ্রকাশও নয়। এ হল বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের পর্বতপ্রমাণ স্তূপে অগ্নিসংযোগ এবং সেই আগুনের ভিতর দিয়ে চিরকালের অমানুষদের 'মানুষ' রূপে পুনর্জন্ম২২। কিন্তু এই ক্রোধঘৃণার হিংসাত্মক প্রকাশ অথবা বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খলা মার্ক্‌স-লেনিন-মাও নির্দিষ্ট প্রকৃত বিপ্লবের প্রস্তুতি কি না, যাঁরা বাস্তবক্ষেত্রে বিপ্লবী তাঁরা নিশ্চয় তা চিন্তা করবেন। মাও-এর বিখ্যাত কথা বিপ্লব 'ডিনার পার্টি' নয়, অনেকেই জানেন। তেমনি বিপ্লব কখনই নৈরাজ্যবাদের আতসবাজী নয়।

আজকের পৃথিবী ও সমাজের দিকে চেয়ে মনে হয় যদি এতকালের সভ্যতার ইতিহাসে আমরা বেশির ভাগ মানুষকে 'অমানুষ' ক'রে থাকি, সমাজে 'মানুষ' (বিশেষ ক'রে 'সভ্য') ব'লে তাদের মনুষ্যত্বের মাপকাঠিটাই ঠিক করতে না পেরে থাকি, এবং সেই গণ্যমান্য মানুষরাই যদি নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের প্রয়োগে খেয়ালবশে সভ্যতাকে যে-কোনো সময় ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাহলে চিরকালের অত্যাচারিত অমানুষরা যদি আজ তাদের বিচ্ছিন্ন নাশকর্মের ফলে সমাজসভ্যতাকে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যায় তাতেই বা ক্ষতি কি, অথবা সেই কারণে তাদের অন্যায়টাই বা অধিকতর মারাত্মক হবে কেন? যারা বিপর্যয়ের পথে অন্ধবেগে অগ্রগামী, তাদের সামনে বিকল্প সুন্দর মানবিক সমাজেরই বা আশা ভরসা কোথায়? বক্তৃতায়? পার্টির নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে? কোথায়? বোঝা যায় না, মার্কসীয় অমার্কসীয় গান্ধীয় খ্রীস্টীয় কোনো যুক্তিতেই বোধগম্য নয়।

তরুণবিদ্রোহ ছাত্রবিদ্রোহ আজ যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ। Third World-এর মুক্তিসংগ্রামের মতো Third Power যুবশক্তি-ছাত্রশক্তি আজ বিদ্রোহী মানুষের একটি বড় ভরসা, উদ্দীপনার উৎস। এবং অনুন্নত অনগ্রসর একদা-পরাধীন দেশে (যেমন ভারতবর্ষে) যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের (যেমন আমেরিকার) অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের (বৈদেশিক সাহায্য ও টেকনিক্যাল সহযোগিতার নামে) মতো নৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিও যেহেতু মারাত্মক সত্য ঘটনা, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবীরাই তার অন্যতম বাহক, তাই ছাত্রবিদ্রোহের লক্ষ্য আজ, ধনতান্ত্রিক

২২. Frantz Fanon পূর্বগ্রন্থ, Preface। ফ্যাননের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'Concerning Violence' দ্রষ্টব্য। অবশ্য ফ্যাননের 'violence'-এর পক্ষে যুক্তির মধ্যে বেশ উচ্চগ্রামে নৈরাজ্যবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে, এবং আলজিরিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশে যে-যুক্তি অনেকটা প্রযোজ্য, তা সকল দেশের সামাজিক অবস্থায় অবশ্যই প্রযোজ্য নয়। ফ্যানন যতটা মার্কসবাদী বিপ্লবী নন, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্ধ ভাবপ্রবণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী।

দেশের মতো আমাদের দেশেও, এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত গতানুগতিক আদর্শের ধারক-বাহক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আর কিছু নয় এবং সেই আদর্শ তার পাঠ্যবিষয়ে, ডিগ্রিতে, গবেষণায় পাস-ফেলের পরীক্ষায়, কৃতিত্বের বিচারে, সর্বত্র প্রতিফলিত। বিদ্যাও বাণিজ্যের পণ্য, ডিগ্রি হল ক্রেতার জন্য লোভনীয় প্যাকেজ, এবং এই পণ্য ও প্যাকেজ ম্যানুফ্যাক্চারিঙের কারখানা হল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যায়তন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যায়তন, বিদ্বান শিক্ষক-অধ্যাপক, কারও প্রতি আজকের বুদ্ধিমান ইতিহাস-সচেতন তরুণ ছাত্রদের, সেকালের গুরুর আশ্রমের ছাত্রদের মতো অন্ধভক্তি নেই, থাকতে পারে না[২৩]। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত কি পরিমাণ আমেরিকান অর্থাশ্রিত আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, স্বাধীনতার পরে ভারতীয় বিদ্যার্থী ও 'স্কলার'দের আমেরিকায় যাতায়াত ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে লেনদেন, বিভিন্ন আমেরিকান 'ফাউণ্ডেশন'-এর গ্র্যান্ট বিতরণ ইত্যাদি বেড়েছে, সেবিষয়ে তদন্ত করলে বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে*। সাংবাদিকতা ও প্রকাশনক্ষেত্রেও আমেরিকান অর্থানুকূল্য কম চমকপ্রদ নয়।

এই সমস্ত কারণে আমেরিকা-ইউরোপের মতো উন্নত এবং ভারতের মতো অনুন্নত দেশের তরুণবিদ্রোহ-ছাত্রবিদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। বর্তমান নীতিহীন আদর্শহীন সমাজের অরণ্যে জীবনের ভবিষ্যৎশূন্য ভরসাশূন্য তরুণরাই অত্যধিক লাঞ্ছিত নিগৃহীত বঞ্চিত, বিশেষ ক'রে দরিদ্র তরুণরা, কাজেই ভবিষ্যতে বিদ্রোহী তরুণশক্তির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে, এসিয়া আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার মতো অনুন্নত দেশে, যেখানে সর্বক্ষেত্রে বিদেশী ও দেশীয় ধনতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এই বিদ্রোহী তরুণশক্তি মজুর-কৃষকের বৈপ্লবিক শক্তিসংহতিকে অনেক

---

২৩. 'The mediocrity of university teaching is no accident, but reflects the life-style of a civilization in which culture itself has become a marketable commodity and in which the absence of all critical faculties is the safest guarantee of 'profitable specialisation of university studies.' The only way to oppose this type of stupidity is to attack all those academic restrictions whose only justification is that they exist...' Cohn-Bendit. পূর্বগ্রন্থ, পৃ ৩৫।

বেশি দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করবে, এবং বৈপ্লবিক মার্কসবাদকে সংস্কারবাদের বিকারমুক্ত করতেও সক্ষম হবে। বস্তুত চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) মাধ্যমে সেখানকার বর্ধিষ্ণু কমিউনিস্ট ব্যুরোক্রাসি ও সংস্কারবাদের পরিবর্জন-পরিশোধনে তরুণদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—'The most picturesque and startling feature of the Cultural Revolution was the part played in it by school children and students.' (Joan Robinson)—এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেকথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি[২৪]। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাষ্ট্রনেতা বা পার্টিনেতা তাঁরই হাতে গড়া রাষ্ট্র ও পার্টির নৈতিক অবনতি ও আদর্শবিচারের কঠোর সমালোচনার জন্য মুক্তকণ্ঠে সর্বজনকে আহ্বান করেছেন, বিশেষ ক'রে তরুণদের—এবং সেই আহ্বানের সাড়ায় যখন ব্যাপক বিদ্রোহ ও তীব্র সমালোচনার জোয়ার শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে তখনও বলেছেন 'Rebellion is justified'—'বিদ্রোহ সঙ্গত'—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয় শুধু, কল্পনাতীত। মাও-সে তুঙ তাই করেছিলেন। একসময় দেখা যায় তাঁর আহ্বানে দূর গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে প্রায় বিশ লক্ষ তরুণ পিকিং শহর অভিমুখে অভিযান করে (এ-দৃশ্য আমরা ঠিক কল্পনা করতেও পারব না) এবং পোস্টারে ও বিতর্কে পার্টিনেতাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে, কিন্তু তখনো মাও 'বিদ্রোহ সঙ্গত' বলতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হয়েছে—'In such a great revolutionary movement, it is hardly avoidable that they (তরুণরা) should show shortcomings of one kind or another, but their main revolutionary orientation has been correct from the beginning.'—এতবড় একটা বৈপ্লবিক ঘটনাবর্তের মধ্যে বিদ্রোহী তরুণদের পক্ষে ভুলভ্রান্তি করা স্বাভাবিক কিন্তু তাদের বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি গোড়া থেকেই নির্ভুল ছিল। যিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্বের জোরে বিরুদ্ধবাদীদের ম্যাজিসিয়ানের মতো নিশ্চিহ্ন (purge) করতে পারতেন, তিনি কেন এই পন্থা অবলম্বন করলেন—'Why did he rely on the young people to open the attack for him?' (Robinson)। কারণ তিনি জানেন, বেশি বয়সের একটা গোঁড়ামি আছে, একটা ক্ষমতাপ্রিয়তা ও আরামকেদারীয় মনোভাব আছে, একটা সর্বজ্ঞানীর দম্ভ আছে, যা তরুণরা ছাড়া কেউ ধূলিসাৎ

করতে পারবে না। পর্দার অন্তরালে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'purge'-এর মতো তিনি যদি তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে বিরুদ্ধবাদীদের অপসারিত করেন, তাহলে তাঁর আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সেই উদ্দেশ্য হল, তিনি চান যে তাঁর অবর্তমানে জনগণের পার্টির কর্তৃত্ব যাতে জনসাধারণের হাতেই থাকে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে না যায়[২৫]। তাই তরুণবিদ্রোহ মাও স্বেচ্ছায় আহ্বান করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই এ এক বিচিত্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহ যিনি প্রকাশ্যে আহ্বান করেছেন তিনি পার্টি ও তার অধীন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক, বয়সে অত্যন্ত প্রবীণ, তৎসত্ত্বেও তরুণদের বলেছেন সেই পার্টি ও রাষ্ট্রের নির্ভীক সমালোচনা করতে। বিদ্রোহকে বলেছেন 'justified', এবং বিদ্রোহ ও সমালোচনার আতিশয্য ও ভুলভ্রান্তিকেও বলেছেন 'hardly avoidable'। মস্কোর গোপন চক্রান্ত-আর-উচ্ছেদের পথ বর্জন ক'রে পিকিঙের এই পথ মার্কসীয় বিপ্লবের ইতিহাসে নতুন দিগ্‌দর্শন। মস্কোর পথ মধ্যযুগের মোগল বাদশাহদের প্রাসাদচক্রান্তের পথ, পিকিঙের পথ বৈপ্লবিক জনগণের উন্মুক্ত পথ। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি? **'To the historian of the future it will appear as the first example of a new kind of class war··· against the incipient *new class of organization men in the Communist Party*' (Robinson)**।

যন্ত্রোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের 'অর্গানাইজেশন মেন', ম্যানেজার, ব্যুরোক্রাট, একসিকিউটিভদের নিয়ে গঠিত নতুন 'power elite' কমিউনিস্ট-পার্টি শাসিত সমাজে মার্কসীয় আদর্শের যে কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে, সোভিয়েট ও যুগোস্লাভিয়া তার দৃষ্টান্ত। এবং এই পক্ককেশ ব্যুরোক্রাটদের জরদ্গবতন্ত্র (gerontocracy) যে-কোনো বৈপ্লবিক পার্টিকে যে কতদূর ভেজিটারিয়ান রিভিসানিস্ট পার্টিতে পরিণত করতে পারে, বর্তমানে ফ্রান্স ইটালি ও আরও অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক বিভ্রান্তি তার প্রমাণ[২৬]। এই সংকট থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে।

২৫. '···if Mao had cleared out the Rightists and attached the Party more firmly than ever to himself, he would have created the very situation that he was most anxious to avoid—a personal struggle for the succession, such as followed the death of Lenin and the death of Stalin. He wanted the succession to go to the people...' Joan Robinson *The Cultural Revolution in China*, Pelican

কিন্তু মাও-এর পক্ষে যে দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয়েছে, তা তাঁর উত্তরসূরীদের পক্ষে বহন ক'রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা এখনই বলা যায় না, ভবিষ্যতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে পার্টিব্যুরো-ক্রাটদের শাসনমুক্ত থাকতে হলে এবং মার্কসীয় নীতির বিকৃতি না ঘটাতে হলে বিপ্লবী জনগণ, বিশেষ ক'রে বিপ্লবী তরুণদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে হবে—'The price of freedom from Party bosses is eternal vigilance' (Robinson)—একথা ভুললে চলবে না। আমাদের ভারতবর্ষে অবতারবাদের ও গুরুবাদের ঐতিহ্য অত্যন্ত দৃঢ়মূল ব'লে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে বৈপ্লবিক নীতিগত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও অবতার-আর-গুরুর মোহ যে সহজে কাটছে না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ভারতের তরুণদের ও ছাত্রদের কমিউনিজমের এই সম্ভাব্য বিকার সম্বন্ধে সেইজন্য আরও বেশি সজাগ থাকা প্রয়োজন।

সংকটমুক্তির তৃতীয় পথ হল ভিয়েৎনাম কিউবা প্রভৃতি দেশের মুক্তি-সংগ্রামের পথ—এসিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন-আমেরিকার শোষিত অনুন্নত দেশের জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম পথ। এই ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক পথেরও প্রথম প্রদর্শক চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও-সে তুঙ। রুশবিপ্লবের শহরকেন্দ্রিক শ্রমিকনির্ভর বিপ্লবের প্রাগাদর্শ (model) যে কৃষি-কৃষকপ্রধান অনুন্নত দেশে বর্ণে বর্ণে অনুকরণীয় নয়, চীনবিপ্লব পরিচালনার কঠোর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মাও তা প্রমাণ করেন। পরবর্তীকালে ভিয়েৎনামে হো-চি মিন, কিউবায় কাস্ট্রো ও গুয়েভারা অনেকটা এই পথের সার্থক অনুগমন করেন। এ-পথ হল গ্রামকেন্দ্রিক কৃষকনির্ভর (প্রধানত) বিপ্লবী সংগ্রামের পথ, দীর্ঘ কঠোর পথ এবং সশস্ত্র গেরিলাসংগ্রামের পথ। অবিচলিত নিষ্ঠা, দীর্ঘ প্রস্তুতি, কঠোর সংগঠন, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এই পথের প্রধান অবলম্বন এবং গ্রামের কৃষকরা হল এই সংগ্রামের বৈপ্লবিক শক্তির অন্যতম উৎস।*

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। গুয়েভারা-ফ্যানন-দেব্রে অনুসৃত বিপ্লবের পথ নীতি ও তত্ত্বের সঙ্গে লেনিন-মাও অনুমোদিত পথ ও নীতির অনেক ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য আছে। অবশ্য গুয়েভারার কথা স্বতন্ত্র, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর মতো মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবী সাম্প্রতিককালে বিরল, এবং তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব (theory) তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সংগ্রাম-

* 'In the colonial countries the peasants alone are revolutionary, for they have nothing to lose and everything to gain' (Fanon ১, পৃ ৪৭)।

উপনিবেশে 'কেবল কৃষকশ্রেণী বিপ্লবী'—ফ্যাননের এই উক্তি মার্কস-লেনিন-মাওবাদ-সম্মত নয়। আফ্রিকার কোনো কোনো উপনিবেশে একথা সত্য হলেও, সকল উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্য নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তবু কিউবায় যেমন তিনি সফল হয়েছিলেন, সেরকম বলিভিয়া বা অন্যান্য দেশে (লাটিন আমেরিকার) হননি। এমন কি কৃষকদের বিপ্লববিরোধী আচরণের অভিজ্ঞতাও তিনি বলিভিয়ায় কম অর্জন করেননি। তাঁর অকালমৃত্যুর কারণও অনেকটা বলিভিয়ার বিপ্লবীদের গণসংগঠন ও গণসমর্থনের অভাব। গুয়েভারার অনেক রচনায় ও উক্তিতে বিপ্লবীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা হঠকারিতা ও কল্পনাবিলাস সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যদিও গুয়েভারা 'সবুরে মেওয়া ফলার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিপ্লবীদের ভুলচুক হবে, মধ্যে মধ্যে তাঁদের কাজকর্মে আতিশয্যও প্রকাশ পাবে, সব সময় সন্তর্পণে সাবধানে তাঁরা চলতে পারবেন না, এসব কথা যেমন মাও, তেমনি গুয়েভারাও বলেছেন। তবু বিপ্লবীদের পশ্চাদ্‌ভূমি হবে সুদৃঢ় গণসংগঠন ও জনসমর্থন—সংগ্রামের পথে তা গ'ড়ে তুলতে হবে —যাতে বিপুল গণসলিলে বিপ্লবীরা মৎস্যের মতো সঞ্চরণশীল থাকতে পারেন —একথা মাও যত জোর দিয়ে বলেছেন, গুয়েভারা-ফ্যানন-দেব্রে কেউ তা বলেননি। ফ্যানন সম্বন্ধে জঁ-পল সার্ত্র যে বলেছেন, 'Fanon is the first since Engels to bring the processes of history into the clear light of day'—তা মনে হয় একটু অতিশয়োক্তি। ফ্যানন নিঃসন্দেহে একালের অন্যতম বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে তাঁর রচনা আগ্নেয়াস্ত্রের মতো শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে ফ্যানন বা মার্কুসের বিপ্লবতত্ত্বে ট্রট্স্কিবাদ ও নৈরাশ্যবাদের বীজ অনেক ছড়িয়ে আছে এবং তার নির্বিচার গ্রহণে ও অনুসরণে লেনিন-মাওএর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনাও কম নেই। বিজ্ঞানোন্নত 'অ্যাফ্লুয়েন্ট' ধনতান্ত্রিক সমাজের স্বরূপবিশ্লেষণে মার্কুসে অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক পথ্য সবটুকু গ্রহণযোগ্য নয়।

নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর্ষণ মধ্যবিত্তের কাছে অত্যধিক, কারণ সেটা স্বচ্ছন্দ পেশায় পরিণত হতে পারে, তাই মার্কসীয় রাজনীতিও এতাবৎকাল নগরকেন্দ্রিক ও শ্রমিকনির্ভর হয়েছে, ভারতের মতো কৃষকপ্রধান অনুন্নত দেশেও। এবং যদি 'the city can bourgeoisify the proletarians' (Debray), তাহলে শহর যে মধ্যবিত্ত মার্কসিস্টদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় করতে পারে তার দৃষ্টান্ত সবদেশেই যথেষ্ট আছে। গ্রাম্য পরিবেশ ভোগীবিলাসী 'বুর্জোয়া'কেও 'প্রলেটারিয়ানাইজ' করতে পারে, করার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু শহুরে পরিবেশ মজুরকে, এমনকি গ্রাম্য কৃষককেও, অল্পদিনের মধ্যে 'আর্বানাইজ' অর্থাৎ 'বুর্জোয়াজিফাই' করতে পারে, বিশেষ ক'রে গ্যাজেটবহুল জীবনের সুখস্বর্গ আধুনিক মহানগরের পরিবেশ। কাজেই মার্কসীয় সংস্কারবাদের পরিশোধন, অনুন্নত দেশে, মহানগরে যতটা সম্ভব নয়,

তার চেয়ে অনেক বেশি গ্রামে সম্ভব। বিপ্লবের গতি প্রধানত গ্রামকেন্দ্র থেকে মহানগরমুখী হবে, অথবা মহানগর থেকে গ্রামমুখী হবে সেটা নির্ভর করবে বিপ্লবের স্থানকালপাত্রের উপর।

বিপ্লবের কোনো গতিধারাই অচল অটল অপরিবর্তনীয় নয়। বিপ্লবের গতি অনুযায়ী তার ধারা নগর থেকে গ্রাম অভিমুখীও হতে পারে। সেইরকম শুধু কৃষকই যে বিপ্লবের ধারক-বাহক হবে তা নয়। শহরের সংগঠিত বিপ্লব-সচেতন মজুরশ্রেণী নিশ্চয় বিপ্লবের ধারক-বাহক হতে পারে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাই হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে রোমান্টিক চোরাগলি আছে অনেক, তার মধ্যে প্রধান হল ট্রট্স্কাইট রোমান্টিসিজম, অসংগঠিত অতিবিপ্লববাদের কল্পনাবিলাস। বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামে এই বিপজ্জনক বিপ্লববিলাস সম্বন্ধেও সজাগ থাকা কর্তব্য।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের সুখভোগের মৃগতৃষ্ণা, সুখস্বর্গ মহানগরের আকর্ষণ, নির্বিকার আত্মদাসত্ব, নিরাকার আত্মবিচ্ছিন্নতা—আধুনিক সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের নব্য-মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারায় সংস্কারবাদের নিশ্চিন্ততা—এবং তার সঙ্গে ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ও স্পেসফ্লাইটের প্রতিযোগিতার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলে (যখন পৃথিবীর শতকরা ৭০ জন মানুষ আজও দারিদ্র্যরেখার নিম্নস্তরভুক্ত, অর্থাৎ খেয়ে পরে বাঁচতে পারে না) বাস্তবিকই মনে হয় যেন সভ্যতার মুক্ত অঙ্গনে আজ মানুষ এক বিচিত্র 'অ্যাবসার্ড ড্রামা'র অসহায় দর্শক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু 'অ্যাবসার্ড ড্রামা' ছাড়াও যে জীবনমঞ্চে ও সমাজপ্রাঙ্গণে অন্য নাটকও অভিনয় করা সম্ভব—মানবমুক্তির নাটক—সেই কথাই আমরা বলতে চেয়েছি। সেই মুক্তিসংগ্রামের পথ ছাড়া মানুষের সামনে বেঁচে থাকার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। অন্য পথ আত্মহত্যার পথ, বীটনিকবিদ্রোহের পথ, বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে নির্বাসিতের জীবনযাপনের পথ, নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আত্ম বিলোপের পথ।

বিজ্ঞাপন ও মন

মানুষ বাড়ছে তাই প্রয়োজন বাড়ছে। কাজেই বিজ্ঞাপন বাড়ছে। যদিও যাদের জন্য আসলে বিজ্ঞাপনের এত বৈচিত্র্য তারা তেমন বাড়ন্ত নয় অর্থাৎ জনসমাজের বিনা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন বাড়ছে, কারণ প্রয়োজন বাড়ছে ব'লে নয়, প্রয়োজন বাড়ানো হচ্ছে ব'লে, প্রয়োজন সৃষ্টি করা হচ্ছে ব'লে তাই। অনাবশ্যক প্রয়োজন বৃদ্ধিতে ধনবাদী সমাজের বেঁচে থাকার শেষ প্রয়াস তাই বিজ্ঞাপনবৃদ্ধি এবং বিজ্ঞাপনের অত্যাশ্চর্য ব্যয়বৃদ্ধি, কেবল অটেলসমাজে নয়, অন্যান্য উন্নতিশীল অনটনসমাজেও। অতএব সামগ্রী যত বাড়ছে চাইচাই তত বাড়ছে বিজ্ঞাপন বাড়ছে আর সমস্ত সামগ্রীবৎ হচ্ছে। যেমন আমি সামগ্রী তুমি সামগ্রী সে সামগ্রী দেবতা সামগ্রী দেশপ্রেম সামগ্রী স্ত্রীলোক সামগ্রী বিদ্যা সামগ্রী বিদ্বান সামগ্রী এবং গোটা সমাজটাই একটা বাজার। যেছে বড়বাজার আর মাছের বাজার সোনার বাজার নারীদেহের বাজার মাংসের বাজার আলুর বাজার পোস্তার বাজার তেমনি মানুষের বাজার। এদিকে মানুষের সমাজটা যত বাজারবৎ হচ্ছে—যেহেতু বাজারের জন্য সমাজটা হয়নি সমাজের জন্য বাজারটা হয়েছিল একদা—তত মানুষ সামগ্রীবৎ হচ্ছে এবং তত বিজ্ঞাপন বাড়ছে, কেনাবেচার বিজ্ঞাপন। আর চৌষট্টি কলার মধ্যে বেচাকলাই আজ শ্রেষ্ঠ কলা তাই মোড়কের বাহার বাড়ছে আর অন্দরের বস্তু অসার হচ্ছে। যেমন বিদ্যায় তেমনি বাণিজ্যে তেমনি জীবনে।

গ্রাম নরক শহর স্বর্গ। বাজার আর বিজ্ঞাপনের শহর কলকাতা। যে শহরে শুধু মৃতের উৎসব আর স্মৃতিসভা আর জীবনের সামনে শুধু জমাট অন্ধকার। মুখোশপরা মানুষ আর সঙের শহর কলকাতা, কৃত্রিম পণ্যের শহর, যোব চার্নকের বাণিজ্যকুঠি জুয়াচোর আর জুয়াড়ির

শহর। নিঅনলাইটে বিজ্ঞাপন বেতারে বিজ্ঞাপন সিনেমায় বিজ্ঞাপন সংবাপত্রে বিজ্ঞাপন ধর্মপত্রে বিজ্ঞাপন দশপাতার সংবাদপত্রে সাতপাতা সামগ্রীর বিজ্ঞাপন বাকি তিনপাতা সংবাদের নামে কয়েক ডজন নামের একঘেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন পোস্টারে বিজ্ঞাপন মনে হয় যেন কলকাতা শহরের অস্থিমজ্জায় ইটপাথরকংক্রিটলোহায় বিজ্ঞাপন। সাতাশ টাকা যে মানুষের দাম* বিজ্ঞাপনের জোরে তার দাম মাসে মাসে সাতাশ শত টাকা এবং হুবহু বেড়ালের মতো যে মানুষ বিজ্ঞাপনঢাকবাদ্যে মনে হয় যেন সে সুন্দরবনের বাঘ। যেমন কেন্নোর মতো ঘৃণ্য মানুষকে মনে হয় ঈশ্বরের অবতার তথাপি।

শিয়ালদহে হাড়গিলেদের ভিড। কৈবল্যধামে কেবলকলাবিদদের সমাধি। মাছের বাজারে কলরব। গোলদিঘিতে বিস্থার বাণিজ্যকুঠিতে কেবল বিস্ফোরণ। অবুঝ উন্মার্গ তরুণদের অকাজ। কারণ সুকাজ যাদের স্বধর্ম তারা সর্বদাই সনাতনী মার্গপন্থী যাকে বলে ঐতিহ্যসচেতন। তবু পার্কস্ট্রীটে খানাপিনাহল্লা কত নাচন-কোঁদন আর তার কি চিত্তচমকদার বিজ্ঞাপন আহা! যেমন ভাব তেমনি ভাষা আব তেমনি তার ব্যঞ্জনা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় ভেদ ক'রে মর্মে পৌছয়

Cabarets by Blushing Oriental
and Go Go Girls.
Cabarets by angelic A, Blonde bombshell B,
tantalizing L, captivating M,
and other girls—delovely D with
dynamic B at mike.
Covetous girls ! girls !! girls !!! in the
hottest cabaret in town.
Fabulous Floorshows with Dancing Damsels
Midnight Revelry
Rousing Revelry Midnight Madness
MADHOUSE
only MADHOUSE in India, except Ranchi
Super Mad Session.

ইংরেজি বিজ্ঞাপন[১] যা দেশের বেশি লোক পড়তে অক্ষম। বাংলায় হলেও তাই।

* 'The price of the human body in terms of its chemical contents is a meagre $ 3·50 (about Rs 27)...'—*The Statesman*, September 19.

১. বিজ্ঞাপনগুলি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার What's On In Calcutta-র Restaurants কলাম থেকে সংকলিত।

কারণ নিরক্ষর। আর সক্ষম হলেও বিজ্ঞাপনদাতা হোটেলমালিকদের লাভ হতো না কারণ সুপারম্যাড সেসনে তিনপ্রহর রাত পর্যন্ত ফূর্তি করার মতো কালো কুচকুচে টাকার বাণ্ডিল তাদের সিন্দুকে নেই। কেবল লাউ আছে কুমড়ো আছে বেগুন আছে কাঁচকলা আছে কচু আছে অতএব ৩৫ কোটি লোক আজ নিরক্ষর তাই রক্ষে। তৎসত্ত্বেও সার্ধজন্মশতবর্ষে বিদ্যাসাগরস্মৃতি-ব্যবসায়ীদের পবিত্র সংকল্প নিরক্ষরতামোচন এবং তদুদ্দেশ্যে কত বক্তৃতা কত বিজ্ঞাপন কত ছুঁচোব কিচিরমিচির। বিদ্যাসাগরভক্তিপ্রবাহের জোয়ার বইবে আদিগঙ্গায়। তথাপি কিন্তু নিরক্ষরের সংখ্যা হবে সত্তরের দশকে অন্তত ৪৫ কোটি এবং বিদ্যার ঠিকাদাররা কয়েকলক্ষ টাকা উদবস্থ করা সত্ত্বেও। কারণ ২·৫% ক'রে লোক বাড়ছে দেশে প্রতি বছরে এবং ০·৭৫% হারে বাড়ছে অক্ষরপরিচিতের সংখ্যা[২]। কাজেই শত শত বিজ্ঞাপনেও নিরক্ষরতামোচন সম্ভব হবে না। তা ছাড়া আরও একটা কথা হল কি বিদ্যাসাগরের মস্ত বদঅভ্যাস ছিল কারও উপর চটে গেলে পায়েব স্বদেশী চটিজুতো তার নাকের ডগার কাছে নাচানো এবং শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন এ ব্যাপারে রাজামহা-রাজাদেরও তিনি নাকি তোয়াক্কা করতেন না। হায়, তাহলে একালের ভিআইপিদের কি করতেন এবং বিদ্যাব্যবসায়ীদেব ?

তবু কেন গোলদিঘিতে বোমা, বিদ্যালয়ে বোমা! সবই নাকি উন্মাদ তরুণদের বিকট অসভ্যতা, প্রবীণ ধূতচিত্তদের রায়। হয়তো তাই অথবা তাই নয়, তবু মনে হয় যদি হোটেলরেস্তোরাঁর খানাপিনানাচগানের বিজ্ঞাপনগুলোর মর্ম বঙ্গভাষায় বেতারে প্রচার করা যায় তাহলে কেমন শোনায়! নিঅনলাইটে বিজ্ঞাপন। লালনীল আলোয় বিজ্ঞাপন। পার্ক স্ট্রীটে সাহেবদের গোরস্থান অন্ধকাব আর মৃতের স্মৃতিউৎসবে আলোর বাহাব এবং জীবিতেব চারিদিকে দুর্ভেদ্য জমাট অন্ধকাব। হায়, তবু কে দেখবি আয় ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলোর বিজ্ঞাপন কলকাতায় এবং মেগালিথিক শ্মশানে লালনীল আলোর বাহার আর বিজ্ঞাপন কেবল। মর্মরমূর্তিতে আলো কারণ জীবনেব আলো নিভুনিভুপ্রায় এবং মৃতের স্মৃতিউৎসবে মুখর শহর, যেহেতু জীবনের উৎসব স্তব্ধ নীরব।

কেবল চাইচাই খাইখাই অভাব আর অভাব এবং বিজ্ঞাপনের কাজ মানুষের ভিতরের চাইগুলোকে চাগিয়ে তোলা এবং অনাস্বাদিতপূর্ব নতুন অভাববোধ জাগানো। কতরকমের চাই তার ঠিক নেই তবু চাইয়ের প্রকারভেদ আছে, অন্তত দু'-রকমের চাই তো আছেই। সেই দু'রকমের চাইয়েব জন্য দু'রকমের বিজ্ঞাপন কারণ বিশেষভাবে জ্ঞাপন যদি বিজ্ঞাপনের মানে হয় তাহলে সেও বিজ্ঞাপন এও বিজ্ঞাপন। একটু মজুরি বেশি চাই, বাঁচার মতো দু'টো খেতে চাই, ঘর চাই

২. *Yojana*, 19 October 1969.

ভিটে চাই এরকম অনেক চাইচাই তো শহরের পথে পথে গ্রামের পথে পথে আজকাল শুনতে পাই এবং এও যখন বিশেষভাবে জ্ঞাপন তখন বিজ্ঞাপন। কেবল বাঁচাব জন্য বিজ্ঞাপন এই যা, আর তার মাধ্যম আওয়াজ। মাথার কিলিপ কাঁটা চায় মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের কাছে একটি নিবেদন গেঁটে বাত কোমরে বাত মাজা কন্‌কন্ করে ধন্বন্তরী ওষুধ আছে যদি কারো চায় তো বলবেন দুখে দুখে জনম গেল দুখ বই সুখ আর হল না বাউল গান বাসন্তী চানাচুর শ্রীরামপুরের অষ্টধাতুর আংটি ভদ্রেশ্বরের মিষ্টি জল চাই কমলালেবু ছুরিকাঁচি যশোরের চিরুনি ভাস্কর লবণ অন্ধ হয়ে ভাই বড়ই কষ্ট পাই গান আট আনায় ফাউন্টেন পেন যদি চান তাহলে। অনর্গল চিৎকার ক্যাকোফোনাস হাজার হাজার বালক কিশোর তরুণ ক্যানভাসার নিজেদের দ্রব্যের নিজেরাই প্রচারক মূর্তিমান চলন্ত বিজ্ঞাপন। কারও পিঠে কাঠের ফ্রেমে পোস্টার গলায় ঘণ্টা কাঁধে ঝুমঝুম খদ্দের আকর্ষণের অভিনব কৌশলের প্রতিযোগিতা যেমন কখন গলার স্বরগ্রামের পরিবর্তনে কখন গৌরচন্দ্রিকার চমৎকার ভাষায় কখন বা কিশোর বালকের করুণ কাকুতিতে কিছু কিনুন তা না হলে তো তাই। লাইনে লাইনে চলন্ত বালকরা মূর্তিমান বিজ্ঞাপন। গোটা বাঙালি জাতটাই যেন রাস্তার আর ট্রেনের হকার ক্যানভাসার ভেণ্ডার পেডলার ফিরিওয়ালা ক্ষুদে দোকানদারের জাত। ক্রমপ্রসার্যমান কলকাতা শহরের উত্তরদক্ষিণপুবের থিকৃথিকে শহরতলির অজস্র অলিগলির আনাচে-কানাচে দোকানদারি কারণ নেহাত দুনিয়াদারি অত্যন্ত ঝকমারি তাই দোকানদারি এবং তার রকমারিতা সংখ্যাতীত। তবু কিন্তু এসব কোনো নিত্যনতুন চাইসৃষ্টি করা নয় বরং বহুপুরাতন সনাতন কতকগুলি চাওয়া নিয়ে প্রায় চশমখোরের মতো বেচাকেনা। চারপয়সায় দু'পয়সা লাভ তা না হলে সেই লাভটুকু দিয়ে দু'বেলা কোনোরকমে পেট চলে না। সুতরাং যে চাই-সৃষ্টির কথা আমরা বলছি অথবা বলতে চাইছি সেই চাই অথবা তার স্রষ্টা এরা নয়, এদের দোকানদারিও নয়, যেহেতু এরা কেউ কখনও কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় না তাই বলছি।

চাইচাই খাইখাইয়ের যে খাদকসমাজ বা কনজিউমার সোসাইটি তার স্রষ্টা কিন্তু একচেটে ধনবাদ বা মনোপলি ক্যাপিটাল এবং ধনবাদী সমাজের এইটাই বোধহয় চরম বিকাশপর্ব। ধনতন্ত্রের পূর্ণপ্রতিযোগিতার কালে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের যুগে মুনাফার প্রয়োগ বা লক্ষ্য বা পরিসীমা সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানীদের যে ধ্যানধারণা ছিল, এমনকি কার্ল মার্কসের যে উনিশশতকী প্রত্যয় মুনাফাহারের ক্রমিক হ্রাসের সূত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তা একচেটে প্রতিযোগিতার কালে এবং আজকালকার ম্যানেজেরিয়াল ধনতন্ত্রের যুগে অনেকটাই প্রায় অচল হয়ে গিয়েছে। কারণ মুনাফাহারের গতি আজ আর নিম্নগামী নয়,

ঊর্ধ্বমুখী যেহেতু মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রতিবেশ আর একচেটিয়া বা মনোপলিষ্টিক প্রতিযোগিতার প্রতিবেশ অভিন্ন নয়, অনেক তফাত এবং এত তফাত যে তার জন্য একেবারে পুরনো ধারণা পালটে ফেলে নতুন ক'রে চিন্তা করা দরকার[৩]। কারণ একচেটিয়া ধনতন্ত্র, বিশেষ ক'রে বর্তমানের ম্যানেজেরিয়াল ধনতন্ত্রের যুগে মুনাফাহারের গতি যখন নিম্নগামী নয় বরং তার বিপরীত, তখন ধনপতিদের যে সারপ্লাস তার প্রয়োগব্যবহার সম্বন্ধেও এবং তার নতুন নতুন পন্থা সম্বন্ধেও ভাবতে হয়। একচেটিয়া ধনিকদের ক্রমবর্ধমান সারপ্লাস অথবা মুনাফা আত্মসাৎ করার অভিনব আধুনিক পন্থা হল উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রির বিচিত্র পরিকল্পনা এবং যার নাম সেল্‌স এফর্ট বা সেল্‌স প্রমোশন বা অ্যাডভার্টিজমেণ্ট বা বিজ্ঞাপন। কার্ল মার্কস উনিশ শতকে কল্পনাও করতে পারেননি যে বিশশতকের বার্ধক্যে ধনতন্ত্রের এরকম আশ্চর্য গোত্রান্তর হতে পারে এবং বিজ্ঞাপন নামক একটি ক্রিয়ার এমন ভয়ংকর ঔদ্ধত্য থাকতে পারে। একচেটিয়া ধনতন্ত্রের জীবনীশক্তি 'বিজ্ঞাপন' যা মার্কসের কাছেও ছিল কল্পনাতীত[৪]।

অবশ্য ধনতন্ত্রের একচেটিয়া প্রতিযোগিতার আগেকার পর্বেও বিক্রয়প্রচেষ্টা বা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ছিল এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাণিজ্যেও যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তাহলেও আগেকার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আজকের বিজ্ঞাপনের কোনো তুলনাই হয় না, এমন কি পঁচিশ বছর আগেকার বিজ্ঞাপনের সঙ্গেও আজকের বিজ্ঞাপনের রূপগুণগত কোনো মিল নেই। তার কারণ শ্রীমতী রবিনসনের ভাষাতে বলতে হলে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ধনতন্ত্রের একটা পরিব্যক্তি বা মিউটেশন হয়েছে বলতে হয় এবং তার মহাকেন্দ্র আমেরিকা[৫]। এমনকি যে সমস্ত দেশ ধনতন্ত্রের ডালপালাগুলি দ্রুত টপকে আমেরিকার মতো মগডালে ওঠার ধান্ধায় ব্যস্ত, অত্যন্ত অবাস্তব প্রকল্পের

৩. 'When we pass from the analysis of a competitive system to that of a monopolistic system, a radical change in thinking is called for'.—Paul A. Baran and Paul M. Sweezy :

৪. 'Surplus-utilization'-এর অভিনব পন্থা সম্বন্ধে বারান ও সুইজি বলেছেন : 'One of these alternative modes of utilization we call the *sales effort*, conceptually, it is identical with Marx's expenses of circulation. But in the epoch of monopoly capitalism it has come to play a role, both quantitatively and qualitatively, beyond anything Marx ever dreamed of.'—Baran & Sweezy, *op. cit.* p 119 (emphasis লেখকের)।

৫. 'After the war, capitalism was found to have undergone an important mutation,'—Joan Robinson : ***Freedom and Necessity, An Introduction to the Study of Society***, London 1970.

ভিতর দিয়ে, যেমন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, সেখানেও গত পঁচিশ বছরের মধ্যে বিজ্ঞাপনের এমন পরিবর্তন হয়েছে, সংখ্যাগত রূপগত গুণগত সর্বরকমের পরিবর্তন, যা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় এবং দেখতে হলে যুদ্ধের আগের ও পরের দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন পাশাপাশি রেখে দেখতে হয়। টেকনোলজির অপ্রতিহত অভিযানের যুগে একচেটে ধনতন্ত্রের যে অবাধগতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে অঢেল ভোগ্যদ্রব্য বেচার দায়িত্ব ও তাগিদ ও তজ্জনিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। একদিকে ভোগ্যদ্রব্য আর একদিকে যুদ্ধের মারণাস্ত্র এই দুইয়ের অবিরাম উৎপাদনের উপর ভর দিয়ে আমেরিকান বিজ্ঞান ও টেকনোলজি এগিয়ে চলেছে একেবারে চন্দ্রলোক পর্যন্ত মনোপলিকে স্কন্ধে নিয়ে। মারণাস্ত্রেরও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় তবে তা ভিন্নজাতের বিজ্ঞাপন। যেমন রাষ্ট্রযন্ত্র ও যাবতীয় প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিবেশ ও বিভতি জিইয়ে রাখা। যেমন দিবারাত্রি কমিউনিজম্‌বিরোধী কীর্তন গাওয়া। যেমন গণতন্ত্র গেল সভ্যতা গেল সংস্কৃতি গেল একটা সব গেল-গেল রোল তোলা এবং সবই কমিউনিস্টদের জন্য গেল অতএব ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া। অতএব মারণাস্ত্র বাড়াও এবং তৎসংশ্লিষ্ট পেন্টাগনরক্ষিত আমেরিকান মনোপলিস্টদের মুনাফা বাড়াও। এই হল মারণাস্ত্রের বিজ্ঞাপন। কিন্তু এই যে দেদার ভোগ্যদ্রব্য যার শতকরা পঁচানব্বুইভাগ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন নেই, এমন কি বাঁচার মতো বাঁচার জন্যও নেই, শুধু সামাজিক অপচয়, তা বাজারে চালাতে গেলে বেচতে গেলে তার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করতে হয় অর্থাৎ নতুন নতুন অভাববোধ জাগাতে হয় মানুষের মধ্যে এবং যা করতে হলে সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞাপন তাই একালের মনোপলি ক্যাপিটালের জীবনমরণকাঠি এবং তার জন্য বর্তমান সমাজে বিজ্ঞাপনের নৈতিক মানসিক প্রভাব যে কত গভীর স্তর পর্যন্ত প্রসৃত ও কত ব্যাপক তা সহজে ধরা যায় না৬। ধরা যায় না তার কারণ ধরতে হলে সমাজবিজ্ঞানীদের যে সততা থাকার প্রয়োজন তার অভাব, যেহেতু তাঁদের গবেষণা অনুসন্ধান সবই মনোপলির সেবায় উৎসর্গিত এবং বিদ্যাবুদ্ধি অথবা আজগুবি প্রতিভা সবই মুনাফাতন্ত্রের ক্রীতদাস।

ক্লাসিকাল কীন্‌সইয়ান নব্যকীন্‌সইয়ান ধনবিজ্ঞানের সূত্রানুগামী বিজ্ঞাপনতত্ত্ব আর একটু বাড়িয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে মনে পড়ছে নর্থকোট পার্কিনসনের কথা যিনি সম্প্রতি মার্চ ১৯৭০এ আমাদের দেশে এসেছিলেন এবং এদেশের শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও অধ্যাপকদের কাছে বিজ্ঞাপন ও শিল্পোন্নতি

৬. 'In its impact on the economy, it is outranked only by militarism. In all other aspects of social existence, its all-pervasive influence is second to none.'—Baran and Sweezy, *op. cit.*, p 12১.

সম্পর্কে কিছু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। বেশ চটকদার বুলি আউড়ে বাজারমাত করার ক্ষমতা আছে পার্কিনসনের, যেমন সকলেই জানেন আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বাণী যা পার্কিনসনসূত্র ব'লে খ্যাত। কিন্তু সে যাই হোক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পার্কিনসন দিল্লির বিজ্ঞানভবনে বলেছেন যে শিল্পোন্নত সমাজে যদি সত্যিই উন্নতিক্রম অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে বিজ্ঞাপনই একমাত্র ভরসা এবং সূত্রাকারে একটি বুলিও তিনি বিতরণ করেছেন Advertise or Perish যা ফলাও ক'রে পত্রিকাতে ছাপাও হয়েছে[৭]। অবশ্যই পত্রিকামালিকদের স্বার্থে। প্রসঙ্গত পার্কিনসন বলেছেন যে ধনবিজ্ঞানের সূত্র ডিম্যাণ্ড অনুযায়ী সাপ্লাই একেবারে বাজে কথা, কারণ ইতিহাসে ঠিক নাকি তার বিপরীতই দেখা যায়। অর্থাৎ সাপ্লাই তৈরি করে ডিম্যাণ্ড কারণ লোকে জানে না তারা কি চায়। তাই বিক্রেতারা বুঝিয়ে দেয় অবশ্যই বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং সাধারণ বিজ্ঞপ্তিসূচক বিজ্ঞাপন নয়, ক্রেতার মন হরণ করতে পারে এরকম চতুর বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের মনের গহনের অভাববোধ জাগিয়ে দেয়। তবেই তারা বুঝতে পারে তাদের কি চায় না চায় এবং তদনুযায়ী ভোগ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্যসহ উৎপাদন বাড়তে থাকে, তৎসহ শিল্পোন্নতির অগ্রগতিও অব্যাহত থাকে। মনোপলি ক্যাপিটালের পক্ষে ওকালতির দিক থেকে পার্কিনসনের যুক্তি যথার্থ, কিন্তু তিনিই এ যুক্তির প্রবর্তক নন। কারণ চেম্বারলিন এই মনোপলিস্টিক প্রতিযোগিতার তত্ত্বানুসন্ধানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। চেম্বারলিন বলেছেন যে বিজ্ঞাপন চাহিদাকে প্রভাবিত ক'রে মানুষের অভ্যস্ত অভাববোধেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং যে বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীর ট্রেডমার্ক অথবা তার নামের প্রচার করা হয় তাতে সাধারণ মানুষের জ্ঞানলাভের অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু না থাকলেও বারংবার প্রচারিত হলে সেই মার্ক ও ব্র্যাণ্ডের জিনিসের প্রতি ক্রেতারা স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। বিক্রেতারা মনোবিজ্ঞানীদের মতো ক্রেতাদের মনের ইচ্ছাআকাঙ্ক্ষাগুলোকে বুঝতে পারেন এবং নানাকায়দায় বিজ্ঞাপনের উস্কানি দিয়ে সেগুলো জাগিয়ে তুলতেও পারেন। কাজেই জ্ঞানবিতরণ নয় বরং চতুর কৌশলে মনভোলানোই বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য[৮]। অতএব ক্রেতাদের এই নতুন অভাববোধ যত সজাগ হতে থাকে, যত তীব্র তীব্রতর হতে থাকে, তত সেই অভাবপূরণের জিনিসের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং তত সেই জিনিসের দাম বাড়তে থাকে

৭. 'Advertise or Perish, says Parkinson'—*The Statesman*, March 8, 1970.

৮. 'Advertisement affects demands....by altering the wants themselves... They are not informative; they are manipulative. They create a new scheme of wants by rearranging his motives.'—E. H. Chamberlin : *The Theory of Monopolistic Competition*, Massachusetts, 1931, p 119.

আর মালিকের মুনাফার পাহাড় উঁচু হতে থাকে। মুনাফার পাহাড় যত উঁচু হয় তত বিজ্ঞাপনের বাজেট বাড়ে, তত ভাব ক্রেতা ফুসলানোর কৌশল বদলায় এবং বাজারে মূল্যপ্রতিযোগিতা কমে যায়৯। কাজেই পার্কিনসন নতুন অথবা চমকপ্রদ কোনো কথা বলেননি, উপরন্তু আসল কথাটাকে মুচড়ে এদেশের মনোপলি ক্যাপিটালের পক্ষে ওকালতি করেছেন। বস্তুত তাই করবার জন্যই তিনি লেকচারট্যুর দিতে এসেছিলেন।

ধনবাদী শিল্পসমাজের এই বিশিষ্ট গড়নকে গলব্রেথ বলেছেন টেকনোস্ট্রাকচার, যেখানে সর্বপ্রকারের প্রতিভা কুশলতা কৃতিত্ব বিশেষজ্ঞানবিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার অধিকারীদের সমাবেশ হয় ম্যানেজারগোষ্ঠীর নীতিনির্ধারণের উদ্দেশ্যে। কারণ ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের কাল অর্থাৎ সেই দস্যুব্যারনদের কাল শেষ হয়ে গিয়েছে ম্যানেজেরিয়াল বিপ্লবের ফলে। আর এই টেকনোস্ট্রাকচারোদ্ভূত খাদকসমাজের ডিজনেল্যাণ্ডে যারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট হয়েছে এবং ক্রমাগত হচ্ছে তারা যে কেবল ধনিকশ্রেণীভুক্ত তা নয়। তা মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে কারণ কেবল ধনিকরা নয় তার সঙ্গে আছে শহরের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত, যারা বড় বড় কোম্পানির দু'তিনহাজারি মনসবদার, যারা দর্শনীয়া পত্নীসমভিব্যাহারে ক্লাবে যায় ককটেলপার্টিতে যায় বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে মদ্য-সহযোগে গল্প ক'রে আত্মমর্যাদা ও আধুনিক সংস্কৃতির কেতন উড়ায়, সিনেমাপত্রিকা ও সেক্‌সিসাহিত্য প'ড়ে শিক্ষিতের জৌলুস বজায় রাখে তারাও আছে। এবং তাদের পিছনে আছে গ্রামসমাজের মধ্যশ্রেণীর চাষী যারা ট্র্যানজিস্টর ও দামী রিস্টওয়াচ নিয়ে আলুর ব্যবসা করে অথবা শহরে সব্‌জি চালান দেয় অথবা মাছের ব্যবসা করে অথবা পাকা কুমড়োর আড়ৎদারি করে অথবা ডিমের স্টলমালিক আর আছে ছোট ছোট ব্যবসায়ী দোকানদার যাদের দৈনিক মুনাফা কম নয় অথচ আয়করী কোনো ঝঞ্ঝাট নেই আর বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন উকিল ডাক্তার শিক্ষক অধ্যাপক বিলকেরানি হেডকেরানি, এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর একভাগ যারা দালাল ইউনিয়নের আওতায় ইউনিয়নিজম্ ইকনমিজম্ ক'রে বেশ লাভবান এবং একালের খাদকসমাজের চাহিদাতৃপ্তির ধাক্কায় নিজেদের শ্রেণীসত্তা সম্বন্ধেও চৈতন্যহীন। এরা সকলেই আজ খাদকসমাজের দিকে পতঙ্গবৎ ধাবমান১০।

আজকের খাদকসমাজের দিকে চেয়ে আদিম মানবসমাজের জীবনসংগ্রামের কথা মনে হয়। মনে হয় তার কারণ জীবনসংগ্রামের হাতিয়ারের উন্নতি থেকেই তো সভ্যতা তাই। আদিম মানুষের জীবনসংগ্রাম গণ্ডিবদ্ধ ছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট চাহিদাতৃপ্তির মধ্যে এবং চাহিদা বা তৃপ্তি কখনও বাঁধ ভেঙে উদ্দাম হয়নি তাই। তৃপ্তির পরে আদিম মানুষ যারা অসভ্য আমাদের বিচারে, তারা বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাসে অবসরবিনোদন করত, যেমন আনন্দমুখর নৃত্যগীত উৎসবপার্বণ শিল্পকলা এবং আরও অনেক সুন্দর সাধনা যা সভ্য মানুষ আজও ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। চাহিদা ও তৃপ্তির সীমাবদ্ধতা আদিমতা অসভ্যতার লক্ষণ মনে ক'রে সভ্য মানুষ উভয়ের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। তাই দেখা যায় যে বাণিজ্যের ইতিহাসে বিলাসের ও নেশার জিনিসের বেশি লেনদেন হয়েছে, যেমন মণিমুক্তো দামি কারুশিল্প মসলিন রেশম তামাক অ্যালকোহল চা কফি কোকো আফিম জাতীয় বহু জিনিস। আধুনিক শিল্পসমাজে এইসব বিলাস ও নেশার দ্রব্য ছাড়াও সবচেয়ে বেশি প্রতিপত্তি হল অজস্র ফালতু ভোগ্যদ্রব্যের যা ব্যবহার করলে জৈবিক প্রাণশক্তি বাড়ে না, কেবল ভ্যানিটির বেলুন ফুলে ওঠে, কেবল আলেয়ার সামাজিক মর্যাদা ক্রমোজ্জ্বল হয়। তাই আজকাল দেখা যায় যে না-আছে চাহিদার সীমানা, না-আছে তৃপ্তির শেষ ভোগের শেষ, না-আছে আয়-বৃদ্ধির হাঁসফাঁসানির ছেদ[১১]। নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষক ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত অবিরাম বিদ্যাদান ক'রে আয়বৃদ্ধি করছেন সর্বদা যে পরিবার প্রতিপালনের জন্য তা নয়, বরং খাদকসমাজের পতঙ্গবৎ। তেমনি দেড়হাজারি একজিকিউটিভের স্ত্রীও চাকরি করছেন আয়বৃদ্ধির জন্য, জীবনের গ্যাজেটবৃদ্ধির জন্য, এদিকে সব ভেসে যাচ্ছে তিস্তার বন্যার মতো। পরিবার ভাসছে পুত্রকন্যা ভাসছে মানবিক সামান্য দায়িত্বকর্তব্য সব ভেসে যাচ্ছে। তবু যেকোনো ছলচাতুরিকৌশলে আয়বৃদ্ধি করা চায় এবং খাদকসমাজে অতৃপ্তখাদক হওয়া চায়[১২]।

অ্যাফ্লুয়েন্ট বা প্রতুলসমাজে ক্রমাগত অভাবসৃষ্টি হতে থাকে অভাবপূরণের মধ্য দিয়ে এবং কথাটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন গল্‌ব্রেথ আমেরিকান খাদকসমাজের আচরণ লক্ষ্য ক'রে। শিল্পসমাজ যত প্রাচুর্যের পথে এগিয়ে যায় বিজ্ঞান ও টেকনোলজির সাহায্যে, তত অভাববৃদ্ধিও হতে থাকে চাহিদাও বাড়তে থাকে, সেই অভাবপূরণের কৌশল ও পদ্ধতির ভিতর দিয়ে, এবং এই কৌশল হল বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়কলা। উৎপাদকরা

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাহিদার বাজার ক্রমাগত চষতে থাকেন এবং নানাকৌশলে প্রলোভনের বীজ ছড়ান, যাতে ভালো ফসল ফলে অর্থাৎ নতুন একটা অভাববোধ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কোনো বিশেষ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের উপর তার অভাববোধ ও চাহিদা নির্ভর করে, যা সাধারণ ধনবিজ্ঞানসূত্রের বিপরীত মনে হয় অথচ বর্তমান সমাজে যা বাস্তব সত্য এবং এইজন্যই গলব্রেথ প্রতুলসমাজের অনির্বাণ অভাববোধকে বলেছেন ডিপেন-ডেন্স এফেক্ট, কারণ অভাব বা চাহিদা উৎপাদননির্ভর[১৩]। অতএব উৎপাদন-বৃদ্ধি তথা মুনাফাবৃদ্ধি করতে হলে অভাববৃদ্ধি প্রয়োজন এবং অভাববৃদ্ধি করতে হলে বিজ্ঞাপনের বাজেটবৃদ্ধি ও তার কলাকৌশলের অভিনবত্ববৃদ্ধি প্রয়োজন। যেজন্য দেখা যায় আধুনিক শিল্পসমাজে বিজ্ঞাপনশিল্পই রীতিমতো একটি প্রধান শিল্প হয়ে উঠেছে এবং তাতে যে কত শিল্পীসাহিত্যিকের প্রতিভা ভাড়া খাটছে তার অন্ত নেই। বিজ্ঞাপনশিল্পের প্রসার যে কী ভীষণ আকার ধারণ করেছে তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে আমেরিকায় ১৯৫৭ সালে বিজ্ঞাপনের জন্য মোট ব্যয় হয় ১০০০ কোটি ডলার, ১৯৬২ সালে হয় ১২০০০ কোটি ডলার, এবং বর্তমানে প্রায় ২০০০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৬০০০০ কোটি টাকার মতো[১৪]। এই সংখ্যা যদিও সাধারণ গণিতের নাগালের মধ্যে আসে না তাহলেও বিজ্ঞাপনের এই ব্যয়বরাদ্দ থেকে আমেরিকায় মনোপলিস্টদের মুনাফার পরিমাণও কল্পনা করা যায় এবং পরিষ্কার বোঝা যায় যে মুনাফাও সেখানে প্রায় চন্দ্রলোক পর্যন্ত ঠেলে উঠছে।

কিন্তু তাই ব'লে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ও অপ্রতুলসমাজে যে অন্য-রকম কিছু ঘটছে তা নয়। কারণ আমরাও প্রাচুর্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং আধুনিক শিল্পসমাজ গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করছি। আমাদের মডেল আমেরিকা মহাজন আমেরিকা অথচ শোনা যায় আমাদের আদর্শ নাকি সমাজতন্ত্র। অন্তত কাগজের বিজ্ঞাপন তো তাই। কাজেই আমাদের সমাজে অ্যাফ্লুয়েন্ট সমাজের উপসর্গগুলি অস্বাভাবিকভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, যেমন অনাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে তেমনি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞাপন হয়েছে প্রধানত যৌনআবেদননির্ভর অর্থাৎ সেক্স্ওরিয়েন্টেড অ্যাড। সমস্ত ভোগ্যদ্রব্যই যে অনাবশ্যক তা নয় বা তা হতে পারে না,

১৩. 'Increases in consumption, the counterpart of increases in production, act by suggestion or emulation to create wants. Or producers may proceed actively to create wants through advertisement and salesmanship. Wants thus come to depend on output. It will be convenient to call it the Dependence Effect.'—Galbraith : *The Affluent Society*, Pelican pp 135-36.

১৪. Baran and Sweezy : *op. cit.*, p 123.

তবে বিজ্ঞাপিত ভোগ্য দ্রব্যের অধিকাংশই যে অনাবশ্যক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং সেটাই আমাদের বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট। যেমন হরেকরকমের প্রসাধনদ্রব্য পোশাক-পরিচ্ছদ টেরিন টেরিলিন নাইলন প্রিণ্ট সার্ট স্যুট ব্রাসিয়েব অন্তর্বাস স্কুটার মোটর রেডিও রেকর্ড ট্রানজিস্টর বেফ্রিজারেটার কুকার হিটার ইলেকট্রিকাল গ্যাজেট ফ্যান ফ্লুয়েরেসেণ্ট এনামেল প্লাষ্টিকের বাসন পাত্র খেলনা ক্রকারি নানারকমের মাদক ও মদ্য যেমন হুইস্কি জিন রাম ব্র্যাণ্ডি ক্যান্ড ফুড সিগারেট ঘড়ি ক্যামেরা তাছাড়া ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে ব্যাধির অজস্র নতুন নতুন ড্রাগ তো আছেই আর আছে শিশুর খাদ্য বিচিত্র সব টনিক আর কুকিং অয়েল কৃত্রিম ঘৃত শুকনো ফলসব্জি স্যুপ কাচুপ সস জ্যাম জেলি স্কোয়াশ নতুন নতুন কাবিাক নামের সব জুতো তৎসহ যৌনসাহিত্য সিনেমা হোটেল রেস্তোরাঁ ক্যাবারে টুইস্ট অপাঠ্যবই পত্রিকা আর যৌনগ্রন্থি-ক্ষরণশীল আধুনিক গান সিনেমার গান অ্যাবসার্ড নাটক আর মহানগরের রঙ্গমঞ্চে রাজধানীতে ফোক্‌কালচারের মহড়া। মনে হয় কি নেই এই হবুচন্দ্রের দেশে যেখানে বিজ্ঞাপনের বহর প্রতিদিন এমন বাড়ছে যে প্রথমশ্রেণীর সংবাদপত্রে পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের জায়গা থাকছে না, কেবল আঠারকুড়ি পয়সা দাম যারা দিচ্ছে প্রত্যহ সকালে সেই সংবাদনেশাখোররা শুধু বিজ্ঞাপন পড়ছে। যথা বোম্বে ডাইংয়ের তোয়ালের বিজ্ঞাপন বা সুইটহার্টশাড়ির বিজ্ঞাপন বা মাথাব্যথার নতুন পিলের বিজ্ঞাপন বা অভিনব টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন বা ট্রানজিস্টারের বা সিনেমার হোটেলের। তবু আমরা জানি তোমরা জানো তারাও জানে, যারা খায় না দায় না অথচ মরেও না, যে এসবের কোনোটাই জীবনের উপকরণ নয়, কেবল খাদকসমাজের পতঙ্গ বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের বিলাসিতা আত্মগরিমাবৃদ্ধির উপচার আর তার চেয়েও বেশি এদেশের মনোপলিস্টদের মুনাফাবৃদ্ধির চতুর কৌশল। মহলানবীশ হাজারীরা অনুসন্ধান ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন এই পুণ্যভূমি আর্যাবর্ত কিভাবে শিল্পোন্নতির এই গ্র্যাণ্ড স্ট্র্যাটেজির ফলে মনোপলিস্টদের ভূস্বর্গ হয়ে উঠেছে ও উঠছে। যদিও সমাজ-তন্ত্রের বিজ্ঞাপন নিয়মিত চলছে বক্তৃতায় ও প্রস্তাবে এবং যদিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আসন্ন অপমৃত্যুর সম্ভাবনায় শোকার্ত শকুনদের মরাকান্নায় মধ্যে মধ্যে শিউরে উঠতে হয় তবু

তবু এই কথা ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয় যে এদেশে এসব কিসের জন্য কাদের জন্য! কোন্ ধনবিজ্ঞানের নিয়মে এইটাই জাতীয় উন্নয়নের গ্র্যাণ্ড স্ট্র্যাটেজি! হিপিশাড়ি আর টেরিন পরিচ্ছদের উৎপাদনবৃদ্ধি! আর কি আশ্চর্য এই দেশ! যেদেশে ১৯৬০-৬১ সালে দেখা যায় যে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ গ্রাম্য লোকের মধ্যে ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ লোক অতিদরিদ্র অর্থাৎ খেতে পায় না এবং অর্থনৈতিক যোজনার জয়যাত্রার ফলে যে দরিদ্র লোকের

সংখ্যা ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে ২৭ কোটির মতো আর ক্রমেই বাড়ছে[১৫]। যেমন গ্রাম্যসমাজে ভয়াবহ দারিদ্র্যের ক্রমবিস্তার তেমনি নাগরিকসমাজেও, যদিও নগরের দারিদ্র্যের চেহারা একটু আলাদা কারণ নাগরিক স্বর্গের ভিতর দিয়ে তা ঘোলাটে দেখায়। একটা আবরণ থাকে তার গায়ে যদিও কলকাতার শহরতলিতে ঘুরলে উলঙ্গ মানুষ আর উলঙ্গ দারিদ্র্য প্রচুর দেখা যায়। তবু কিন্তু এই কথা ভেবে অবাক হতে হয় যে এসব কাদের জন্য। এই কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন, এই বিপুল আবর্জনাস্তূপের মতো খাদকসমাজের ভোগ্যপণ্যের উপকরণ-বৃদ্ধি! যেছে কলকাতার পথে পথে নোংরা আবর্জনাস্তূপ মাছিকীটের ভন্‌ভনানি, তৈছে কলকাতার ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে স্টোরে মিউনিসিপাল বাজারে সমবায়ে এম্পোরিয়ামে হাজার হাজার দোকানে শপিংসেন্টারে ভোগ্যপণ্যের আবর্জনাস্তূপ এবং সেখানে মাছির মতো কীটের মতো বিত্তবান ও মধ্যবিত্তের ভন্‌ভনানি, যাকে শপিঙের ফ্যাশানপ্যারেড বলা যায়। এই কথা ভেবে তাই বাস্তবিকই অবাক হতে হয় যে সমাজের একটা বিরাট স্তর জুড়ে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে মধ্যশ্রেণীর বিস্তার আর সেই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বহুস্তরভুক্ত সব উপশ্রেণী যেন স্তূপীকৃত জ্যান্ত কেন্নোর মতো কিলবিল করছে আর গুঁড়ি দিয়ে ক্রল ক'রে এ ওর পিঠের উপর দিয়ে উপরে উঠতে চাইছে। আর সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! এই উপরে ওঠার অবিরাম প্রয়াস অর্থাৎ ক্রলিং। কারণ খাদকসমাজের বিজ্ঞাপনের আহ্বান তাই ক্রলিঙের প্রতিযোগিতা। ওর্জাঁফা বা পিকাসোর পেইন্টিংএর উপজীব্য এই মধ্যবিত্তের ক্রলিং, এ ওর পিঠের উপর দিয়ে এ ওর ঘাড়ে বেড় দিয়ে এ ওর কানের পাশ দিয়ে উপরে ওঠার ক্রলিং। কারণ বিজ্ঞাপনের ডার্লিংরা খাদকসমাজের পতঙ্গ কারণ মোদিপন নাইলন ইয়ার্ন

> E X C I T I N G
> so exotic, so provocative
> that you are bound to
> have a second look
> G L A M O R O U S
> so soft, so smooth, so crisp and
> uncrushable
> V O L U P T U O U S
> makes your heart beat faster
> S O P H I S T I C A T E D
> will make you go far into the social spectrum
>
> —advt.

১৫. 'A Configuration of Indian Poverty : Inequality and Levels of Living'

অতএব খাদকসমাজের পতঙ্গরা শোনো। যদি সামাজিক বর্ণচ্ছটা বহুদূর পর্যন্ত বিকীর্ণ করতে চাও তাহলে মোদিপনের নাইলন ইয়ার্ন ব্যবহার কর আর তা না হলে শ্রীরামের সিল্ক টেরিন স্যুট যেহেতু

> Chairman is coming, dear, I have to meet
> him at the Airport. Then there is luncheon
> meeting and cocktail party in the evening.
> Really a big day today. So I must have
> the best. SHREE RAM SILKS Terene Suit
> and Eighty twenty shirt. Thanks to you for
> your wonderful selection. —advt.

সামাজিক বর্ণচ্ছটা বিকিরণোপযোগী ভলাপচ্যুয়াস নাইলন ইয়ার্নের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আলুথালুকেশ খাইখাইভাব এক মহিলার ছবি সত্যিই ভলাপচ্যুয়াস[১৬] এবং শ্রীরামের সিল্ক টেরিন স্যুটের বিজ্ঞাপনের সঙ্গেও একটি ছবি আয়নার সামনে দণ্ডায়মান স্যুটপরা তরুণ ঠিক কন্দর্পের মতো চেহারা আর তার পাশে স্মার্ট তরুণী। মনে হয় বিবাহিতা প্রিয়া যে টেরিন স্যুটের সামাজিক উপযোগিতা বোঝে। কারণ তরুণ এক্জিকিউটিভ স্বামী বিমানবন্দরে যাবে চেয়ারম্যানকে রিসিভ করবে তারপর সেখান থেকে যাবে লাঞ্চমিটিঙে সেখান থেকে ককটেলপার্টিতে। কাজেই সিল্ক টেরিনের স্যুট আর আশিবিশ শার্ট না হলে এরকম গুরুতর সামাজিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় তাই বিজ্ঞাপন[১৭]। স্যুটশার্টে দুরস্ত হলে চলবে না শুধু। তার সঙ্গে অটো চাই মোবিলিটির জন্য। অ্যামবাসেডার কারণ স্যুইটহার্টশাড়িপরিহিতা ডার্লিং যেমন অ্যামব্যাসেডারও তাই, প্রায় দ্বিতীয়া স্ত্রীর মতো রূপেগুণে চুম্বকটানে অনন্যা অদ্বিতীয়া।

> Wife takes one half. She needs
> you, your time and attention—
> a good half of you. What do
> you do with your other half
> the working half ?

... ...

—P. D. Ojha : *Reserve Bank of India Bulletin*, January 1970. এই প্রবন্ধে ওঝা লিখেছেন : 'As compared to only 52 percent of the rural population in 1960-61, 70 percent of the population in 1967-68 was found to be at poverty levels.' p 24.

তৎসত্ত্বেও বলতে হবে যে আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছি কারণ বড বড় শিল্প কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি এবং কিছু ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি আর স্কুটার ট্র্যাক্টর কিনতে টাকা ধার দিচ্ছি আর কমিটি কমিশন কনফারেন্স ক'রে সমাজতন্ত্রের পবিত্র প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রচার করছি।

Wherever you go, let Ambassador
take care of you. Lean back,
stretch out and relax. Steer her
wherever you want to go. She
obeys you silently. She is
dependable. She is beautiful
(next to your wife). She is
smooth, she is strong. She'll go
a long way and even take a
lot of beating. She'll make you
feel important, she'll make you
feel wanted.
She will share you with your family,
ungrudgingly. As your other half,
Ambassador Mark II will respond to
your tender handling.

—advt.

এইজন্য অবাক হয়ে ভাবতে হয় আমাদের দেশ যদিও আমেরিকা নয়, যদিও আমেরিকা আমাদের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মডেল, যদিও আমেরিকা আমাদের শিল্পোন্নয়নের তহবিলের বড় মহাজন তথাপি এই ভোগ্যদ্রব্যের বিচিত্র সমারোহ আর এই বিজ্ঞাপন কিসের জন্য এবং কাদের জন্য! যাদের জন্য তারা কারা এবং সমাজের পিরামিডের কোন্ ধাপ পর্যন্ত তাদের অবস্থান! যখন জানি সমাজের প্রায় শতকরা সত্তরজন মানুষ অতিদরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত সামান্য ভাতভুট্টাও খেতে পায় না এবং নিরক্ষর অর্ধাবৃতদেহ। যখন জানি বিজ্ঞাপন মানে কৃত্রিম চাহিদাবৃদ্ধির কৌশল এবং চাহিদাবৃদ্ধি টেরিনটেরিলিনের স্যুটশার্টের য়্যুমাথাব্যথার অজস্র ড্রাগের আর পিলের এবং উৎপাদনবৃদ্ধি মানে মুনাফাবৃদ্ধি এবং প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের মধ্যে পঞ্চাশজন অথবা একশোজন মনোপলিস্টের মুনাফাবৃদ্ধি। যখন জানি শতকরা আঠারজন লোক এদেশে নগরবাসী বাকি সকলে আজও গ্রামবাসী এবং প্রায় পাঁচলক্ষ সাতষট্টি হাজার গ্রামের অধিবাসী মানুষ। এবং যখন জানি এই বিপুল গ্রামবাসীদের মধ্যে আজ প্রায় শতকরা সত্তরজন দুর্ভেদ্য দারিদ্র্যের কারাগারে বন্দী। তখন মনে হয়, বাস্তবিক ভাবতেও অবাক লাগে, কি বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ আর তার কি বিচিত্র যোজনা পরিকল্পনা উন্নয়ন! যেমন ভালো হারিকেনলণ্ঠন নেই কিন্তু আছে নাইলন ইয়ার্ন টেরিন স্যুটিংশার্টিং। যেমন ভালো হাসপাতাল নেই সাধারণ মানুষের জন্য এবং

তার বদলে আছে মুনাফাখোর শকুন ড্রাগব্যবসায়ীদের অজস্র পিল ট্যাবলেট মাইসিন অ্যান্টিবায়টিক। যেমন ভালো স্বাস্থ্যাবাস নেই বিদ্যালয় নেই অথচ লাক্সারি হোটেল আছে যেমন ব্লুডাইমণ্ড পুনার[১৮]

> Hotel Blue Diamond has
> several imaginative touches.
> For instance, the Panchali Coffee
> Room which is poised over a
> pool and has sprinkling foun-
> tains all around. And the
> Mastani Room decorated in
> Peshwa style. The hotel took
> two years to build and spells
> luxury in every line. —advt.

চতুর্দিকে বিলাসিতার উপকরণের আবর্জনার পাহাড় আর তার বিজ্ঞাপন। মধ্যিখানে দিগন্তবিস্তৃত দারিদ্র্যের ভূখণ্ড নিয়ে কি অপূর্ব ল্যাণ্ডস্কেপ—আহা!

আলফ্রেড মার্শাল যদিও মার্কসিস্ট নন তাহলেও তাঁর 'ইন্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড' গ্রন্থে দু'রকমের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা কনস্ট্রাকটিভ ও কম্‌ব্যাটিভ এবং সেই বিজ্ঞাপন কনস্ট্রাকটিভ যা সুস্থ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতাদের ইচ্ছেমতো জিনিস বাছাই ক'রে কেনাকাটার সুযোগ ক'রে দেয়, কখনও এটা ভালো ওটা আরও ভালো সেটা সবচেয়ে ভালো এইভাবে অনবরত তাদের কানে মন্ত্রণা দেয় না, যা কম্‌ব্যাটিভ বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। পরে তাঁর উত্তরাধিকারী পিগু তাঁর 'ইকনমিক্স অফ ওয়েলফেয়ার' গ্রন্থে প্রায় একই রকমের যুক্তি দেখিয়ে বিজ্ঞাপনের ভালোমন্দ গুণের বিচার করেছেন এবং এমন কথাও প্রসঙ্গত যুক্তির মুখে ব'লে ফেলেছেন যে একচেটে বাণিজ্যের প্রতাপ কমাতে পারলে হয়তো মন্দ বিজ্ঞাপনের প্রচার বন্ধ করা যেত। মন্দ বিজ্ঞাপন বলতে পিগু সেই বিজ্ঞাপনের কথা বলেছেন যার কাজ হল নানাপ্রকারের স্তোকবাক্যে ও ছলনায় ক্রেতাদের মন ফুসলানো। এর বেশি কথা মার্শাল বা পিগু বলেননি অথবা বিশ্লেষণ শেষপর্যন্ত করেননি, যেহেতু আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে মনোপলির বর্তমান একাধিপত্য তাঁদের মানসচক্ষে ভেসে ওঠেনি। আমেরিকার মতো মনোপলির ভূস্বর্গে বিজ্ঞাপনের যে কি ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তা ব্যাখ্যা ক'রে ম্যাকগ্রহিলের ধনবিজ্ঞানীরা লিখেছেন যে

সত্যি কথা বলতে কি বাজারনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় কাজ, যেমন ভোগ্যপণ্যের ডিজাইন থেকে আরম্ভ ক'রে তার মূল্যনির্ধারণ করা বিজ্ঞাপন দেওয়া, ক্রেতার দরজায় দরকার হলে ক্যানভাসার পাঠিয়ে কলিংবেল বাজানো, অবশেষে জিনিস বিক্রি করা পর্যন্ত কাজের ধারাটাই হল আমাদের ফ্রি সোসাইটির বড় লক্ষণ এবং শুধু লক্ষণ নয় এই ফ্রি সোসাইটির স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনও বটে। আর বিজ্ঞাপনের অভাবে এহেন মার্কিনী ফ্রি সমাজের হাল যে কতদূর শোচনীয় হতে পারে সে সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত আমেরিকান ব্যাংকার বলেছেন যে ক্রেতারা অর্থাৎ সমাজের লোকজন যদি কেবল প্রকৃত উপযোগিতা বিচার ক'রে পোশাক-পরিচ্ছদ জামাকাপড়জুতো কেনে, অথবা এমন সব খাদ্যদ্রব্য কিনতে ও খেতে থাকে যা পুষ্টিকর স্বাস্থ্যপ্রদ ও ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়, অথবা এমন অটোমোবিল ব্যবহার করে যা দশপনের বছরের আগে বদল না করলেও চলে এবং ঘরবাড়িও নিজের রুচি অনুযায়ী করতে থাকে, তাহলে কি ভয়ংকর শোচনীয় অবস্থা হবে এত নতুন নতুন মডেল নতুন নতুন স্টাইল আর নতুন নতুন আইডিয়ার[১৯]।

অর্থাৎ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে কনজাম্‌পশন-ইনভেস্টমেণ্ট-এমপ্লয়মেণ্টের ক্রমিক অধোগতি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব'লে যাবতীয় অস্বাভাবিক উপায়ে, যেমন বিজ্ঞাপনের সাহায্যে, একটা কৃত্রিম খাদকসমাজ সৃষ্টি ক'রে সমগ্রভাবে এফেক্টিভ ডিম্যাণ্ড বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ তা না রাখতে পারলে উৎপাদনবৃদ্ধি মূলধনবিনিয়োগ কর্মযোগ কোনোটারই ক্রমবর্ধমান চাপের সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব নয় এবং এইটাই হল টেকনোস্ট্রাকচারনির্ভর ধনতন্ত্রের মূল সমস্যা, যে-সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হল বিজ্ঞাপন। আর এই কারণেই উৎপাদনকালীন অসারতা, যাকে 'বিল্ট-ইন্ অবসোলেসেন্স বলা হয়, তা ছাড়া গতি নেই। কারণ ভালো মজবুত দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার্য জিনিস বিক্রি হবে বটে কিন্তু তার চাহিদা একবার মিটলে বেশ কিছুদিনের জন্য আর উঠবে না এবং তার ফলে উৎপাদনহার মূলধননিয়োগ সবই কমাতে হবে, যার ফলে মুনাফাও কমবে। কাজেই ভোগ্যদ্রব্য এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার মেয়াদ অল্পদিনেই ফুরিয়ে যায় এবং সেই জিনিসেরই নতুন মডেল নতুন স্টাইল নতুন লেবেলপ্যাকেজআঁটা সংস্করণ বাজারে ছাড়লে চালু হয়। তাই দেখা যায় অনবরত লেবেল পাল্টানো মডেল পাল্টানো স্টাইল পাল্টানো ডিজাইন পাল্টানো প্যাকেজকার্টনকনটেনার পাল্টানো ভোগ্যপণ্য উৎপাদকদের প্রধান কাজ, আর

১৯. 'Clothing would be purchased for its utility value; food would be bought on the basis of economy and nutritional value; automobiles would be stripped to essentials and held by the same owners for the full ten to fifteen years of their useful lives...And what would happen to a market dependent upon new models, new styles, new ideas?' —Paul Mazur: *The tandards We Raise*, N. Y. 1953, p 32.

সেইসব কাজকর্ম করার জন্য মোটামাইনের অনেক কর্মচারী কোম্পানির তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে মাথা ঘামায় এবং যাকে বলে জাতীয় প্রতিভার অতি চমৎকার সদ্‌ব্যবহার, বিশেষ ক'রে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে। যদি কোনো নতুন সাবান পাউডার সিগারেট বা যাই হোক বাজারে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-পত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন ফলাও ক'বে প্রচার করা হয় আর তার সঙ্গে খাদক বা ক্রেতাদেব প্রলুব্ধ করার নতুন নতুন কৌশল এবং কৌশলের মধ্যে দু'টি কৌশল ইদানীং প্রধান হয়ে উঠেছে। যথা যৌনগ্রন্থিউত্তেজক সচিত্র বিজ্ঞাপনেব কৌশল এবং লাকিটিকিট লটারি ও উপহারলাভেব প্রলোভনকৌশল।

আমাদের দেশের নানাবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের যদি একটা নমুনাসমীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে কয়েকশ্রেণীব বিজ্ঞাপনের পুনরাবৃত্তি ও প্রাধান্য যেমন

রেডিমেড পোশাকপরিচ্ছদ স্যুটশার্ট বিশেষত আধুনিক সিনথেটিকের জামাকাপড় শাড়ি ব্রিফ ড্রয়ার ব্রা ভেস্ট প্রভৃতি।

ড্রাগ বা ওষুধপত্র প্রধানত এমন সব ওষুধ যা সাধারণ লোক ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই কিনতে পারে যেমন স্ক্রমাথাব্যথা গাব্যথার পিল ট্যাবলেট হাঁচিকাসি-সর্দি অ্যালার্জির পিল নানাবিধ মলম দন্তব্যাধি নিবারক টুথপেস্ট প্রচুর টনিক ভিটামিন ক্যাপসুল ইত্যাদি।

জীবনযাত্রার গ্যাজেট প্রধানত ইলেকট্রিক্যাল এবং পরিবার ও কিচেনের জন্য যেমন ফ্যান হিটার কুলার কেটলি আইরন প্রেসারকুকার রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি।

অটোমোবিল ও তার সরঞ্জাম যেমন মোটর স্কুটার সাইকেল মোটরবাইক অটো-ব্যাটারি টায়ার গ্যারাজ প্রভৃতি।

প্রসাধনদ্রব্য নানারকমের সাবান পাউডার স্নো ক্রিম লোশন পলিশ প্রভৃতি যেগুলি রূপচর্চাব অপরিহার্য উপকরণ।

বিবিধ বিষয় বিবিধের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ক্যাজুয়াল বিজ্ঞাপন থেকে আরম্ভ ক'বে নতুন কোম্পানি নতুন হোটেল সিনেমা সাহিত্য লাকশাদি ট্যুরিস্ট লজ পরিবার পরি-কল্পনা ইদানীং রাজ্য-সরকারদের লটারি প্রভৃতি সবই আছে।

প্রাধান্যের পর্যায়ক্রমে অনেকটা বিজ্ঞাপনগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে মনোপলিস্টদের দামি ড্রাগগুলি, যেমন অ্যান্টিবায়টিক্স, প্রধানত মেইলিঙের সাহায্যেই প্রচারিত হয় এবং তার লিটারেচার স্যাম্পল ইত্যাদি সোজাসুজি রেজিস্টার্ড ডাক্তারদেব কাছে যায়, যেহেতু তাঁরাই সেগুলি নিজেদের রুগীর প্রেসক্রিপশন মারফত চালু কবেন আব কিছু মেডিক্যাল জার্নালেও ছাপা হয়।

রেডিমেড পোশাকের প্রচলন আমাদের দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে হয়েছে, তাও পঞ্চাশের দশকে ধীরে ধীরে এবং ষাটের দশক থেকে অতিদ্রুত গতিতে, বিশেষ ক'রে যখন থেকে নাইলন পলিয়েস্তার টেরিন টেরিলিন প্রভৃতি

সিন্‌থেটিক্‌স বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তার আগে রেডিমেড পোশাকের প্রচলন প্রায় ছিলই না বলা চলে, খুব সামান্য ছিল এবং সাধারণ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত ধনী সকলেই তখন দর্জির তৈরি বায়না দেওয়া পোশাকই পরত বেশি। তাই কুড়ি বছর আগেকার সংবাদপত্রে মোট বিজ্ঞাপনের ৫% রেডিমেড পোশাকের বিজ্ঞাপন ছিল কি না সন্দেহ, এমনকি বিজ্ঞাপনই তখন কম ছিল এবং সংবাদপত্র ছিল সংবাদের পত্রিকা তখন, এখনকার মতো প্রধানত বিজ্ঞাপনের পত্রিকা ছিল না। ইয়োরোপের মতো শিল্পোন্নত দেশে দেখা যায় মোট পরিচ্ছদের মধ্যে রেডিমেড পরিচ্ছদ বিক্রি হয় ৭০% থেকে ৯০%, আমেরিকায় প্রায় ৯০% এবং এখন আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় ৪০% যদিও ভারতের মতো দরিদ্র অনুন্নত দেশের পক্ষে তাই যথেষ্ট[২০]। রেডিমেড পোশাকে যেহেতু প্যাকেজের বাহার দেখাবার সুযোগ কম তাই বাইরের বিজ্ঞাপনই তার প্রধান অবলম্বন এবং সেই বিজ্ঞাপনের মধ্যে সেক্‌সওরিয়েন্টেড বিজ্ঞাপনই এক্ষেত্রে ডীপ্‌ ইম্প্যাক্ট প্যাকেজের কাজ করে। গত কয়েকবছরের মধ্যে তাই আমাদের দেশে যৌনাবেদনপ্রধান বিজ্ঞাপন রেডিমেড পোশাকের ক্ষেত্রে খুব বেড়েছে এবং ক্রমেই বাড়ছে[২১]। আমেরিকায় ব্রা গার্ডল অর্থাৎ কাঁচুলি কোমরবন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে যৌনবস্তুর বিশেষত্ব হল তা অতিমাত্রায় উগ্র মাচোইজম ও বডি একজিবিশনিজমের পক্ষপাতী, যথা কাঁচুলি কোমরবন্ধপরা একটি তরুণীর চুলের ঝুঁটি ধরে মেঝের উপর টানছে আধুনিক এক গুহামানব এবং বিজ্ঞাপনের শিরোনামা হচ্ছে Come out of the Bone Age, darling! অথবা যেমন কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপনে একটি তরুণী তার তরুণ বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর বাতাসে তার স্কার্ট ময়ূরের পেখমের মতো উপরে উড়ছে, ভিতরে দেখা যাচ্ছে কোমরবন্ধ এবং মেয়েটি তার তরুণ বন্ধুর দিকে চেয়ে

২০. *The Statesman*, April 30, 1970 'Readymade Garments ক্রোড়পত্রে শ্রীসুব্রামানিয়ামের প্রবন্ধ। গ্রামাঞ্চলেও রেডিমেড পোশাকের বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন সম্বন্ধে লেখক বলেছেন : 'With the growing rural prosperity, it is time that the industry bestirs itself, in its own interest, to cultivate the rural market by carrying a vigorous sales campaign'. গ্রামের সমৃদ্ধি যাই হোক একথা ঠিক যে একশ্রেণীর সম্পন্ন চাষী জোতদার আলুকফির আড়ৎদার মাছের ব্যবসাদার সচ্ছল দোকান। র প্রভৃতির মধ্যে শহরের রেডিমেড পোশাকের অর্থাৎ নাইলন টেরিনাদির স্যুটশার্টশাড়ির আকর্ষণ বাড়ছে, যাকে আর্বানাইজেশনেরই বিস্তার বলা যায়।

২১. 'The most obvious change in readymade garment advertising during the last few years has been—apart from the increase in volume and the number of competing brands—the introduction of sex as a motivating factor.' —B. P. Menon: 'Change in Readymade Wear Advertising': স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার পূর্বোক্ত ক্রোড়পত্র।

খিলখিল্‌ ক'রে হাসছে[২২]। ঠিক এর হুবহু প্রতিলিপি এদেশের বিজ্ঞাপনে চোখে না পড়লেও যা চোখে পড়ে তা কোনো অংশেই কম নয়। কেবল রেডিমেড পোশাকের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য বিজ্ঞাপনেও আমাদের দেশে ইদানীং নারী ও সেক্‌সের প্রাধান্য রীতিমতো বাড়ছে। যেমন বৈদ্যুতিক পাখার বিজ্ঞাপনে সিগারেটের বিজ্ঞাপনে কফি ওভাল্‌টিন বোর্নভিটা প্রভৃতি পানীয়ের বিজ্ঞাপনে সাইকেল স্কুটার অটোর বিজ্ঞাপনে জুতোর বিজ্ঞাপনে এয়ারলাইনের হোস্টেসের বিজ্ঞাপনে। কিন্তু প্রশ্ন হল এত যৌনভাব ও নারীপ্রাধান্য বিজ্ঞাপনে কেন? যদিও যেকোনো যৌনবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীর কাছে এই কেন-র উত্তর খুব সহজ এবং সেই উত্তর হল মানুষের আদিমতম কামপ্রবৃত্তির কাছে আবেদন করলে যত সহজে সাড়া পাওয়া যায় তত সহজে আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না। এই মহাসত্যটি অনেক কোটি ডলার খরচ ক'রে বড় বড় কোম্পানির অ্যাড ও মার্কেট রিসার্চ ও মোটিভেশনাল রিসার্চ দফ্‌তরের মোটামাইনের সাইকলজিস্ট সোসিওলজিস্টরা আবিষ্কার করেছেন। কি আশ্চর্য আবিষ্কার!

উত্তম আবিষ্কার। কিন্তু এইসব বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য কারা বা সমাজের কোন্‌ শ্রেণীর মানুষ সেকথা মনে হলে প্রথমে আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীদের ছয়টি সামাজিক শ্রেণীর কথা মনে পড়ে যেমন[২৩]

১ আপার-আপার: প্রাচীন বনেদি অভিজাতশ্রেণী।
২ লোয়ার-আপার নব্যধনিকশ্রেণী।
৩ আপার-মিড্‌ল প্রফেসানাল-ম্যানেজার একজিকিউটিভ বড় বড় ব্যবসায়ী প্রভৃতি।
৪ লোয়ার-মিড্‌ল চাকরিজীবী ব্যবসায়ী টেকনিসিয়ান প্রভৃতি।
৫ আপার-লোয়ার কুশলী কারিগর ও দক্ষ মজুরশ্রেণী।
৬ লোয়ার-লোয়ার সাধারণ মজুরশ্রেণী।

আমেরিকান সমাজে হয়ত এই উপশ্রেণীবহুল অমার্কিনীয় সামাজিক শ্রেণীভেদ আজকের দিনে অনেকটাই বাস্তব সত্য, কিন্তু আমাদের ভারতীয় সমাজের শ্রেণীভেদ এই পদ্ধতিতে করলেও কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার যেমন

১ আপার-আপার রাজামহারাজা ও মহাধনিকরা বা মনোপলিস্ট শিল্পপতিরা।
২ লোয়ার-আপার বড় ব্যবসায়ী কালোবাজারি মাঝারি শিল্পমালিকদের নিয়ে গঠিত নব্যধনিকশ্রেণী।
৩ আপার-মিড্‌ল কতকটা আমেরিকার মতো প্রফেসানাল সিনিয়র একজিকিউটিভ ম্যানেজার মিনিস্টারদের নিয়ে গঠিত।

২২. Colin Colby : 'Eroticism in Modern Advertising'—*Penguin Survey of Business and Industry*
Vance Packard : *The Hidden Persuaders* (Pelican).
২৩. Llovd Warner : Social Class in America, N. Y. 1948.
C. Wright Mills : The White Collar.

৪ মিড্‌ল-মিড্‌ল এই স্তরটি বা মধ্যবিত্তের উপশ্রেণী আমাদের দেশে বেশ প্রসার্যমান—যেমন বুরোক্রাট মোটামাইনের অফিসার মাঝারি ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার টেকনিসিয়ান কন্‌ট্রাক্টর ডাক্তার উকিল ব্যারিস্টার অধ্যাপক চিত্রতারকা খেলোয়াড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন চাষী জোতদার আড়তদার প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত।

৫ লোয়ার-মিড্‌ল এই স্তরটিও খুব বিস্তৃত। অসংখ্য কেরানি সাধারণ কর্মচারী শিক্ষক ছোট দোকানদার মধ্যবিত্ত চাষী প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত।

৬ আপার-লোয়ার কুশলী কারিগর মজুর মেকানিক প্রভৃতি।

৭ লোয়ার-লোয়ার বৃহত্তম স্তর—সাধারণ চাষী ও মজুরের।

মার্কেটরিসার্চে বিশেষজ্ঞ আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে তাঁদের পূর্বোক্ত ছয়শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ লোয়ার-মিড্‌ল আপার-লোয়াররাই হল ক্রেতাদের মধ্যে ৬৫%, কারণ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যাঁরা তাঁরা এমনিতেই কোয়ালিটি মার্কেটের ক্রেতা। কাজেই বিজ্ঞাপনের ফোকাস হল চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী, যাঁদের মধ্যে উপরের সামাজিক স্তরে ওঠার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রবল এবং আমাদের দেশে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্তর পর্যন্ত এই বিজ্ঞাপনের ফোকাস প্রসৃত। যেহেতু এই শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে মহিলারাই প্রধানত ক্রেতা তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'মিসেস মিড্‌ল মেজরিটি'—যাঁরা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞাপনদাতাদের ডার্লিং। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনদাতাদের এই ডার্লিংদের স্তর তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যেহেতু সামাজিক ল্যাডারের ধাপে ধাপে উপরে ওঠার জন্য মধ্যবিত্তের এই স্তরগুলি সতত প্রাণপণ প্রয়াসী তাই সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের মানদণ্ডগুলির দিকে তাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টিও প্রখর। এই মানদণ্ডগুলি হল দৈনন্দিন জীবনের নানারকমের গ্যাজেটের বাহুল্য, যেজন্য যাবতীয় ভোগ্যদ্রব্যের প্রধান লক্ষ্য হল এই শ্রেণীর লোক যারা বোম্বাই ফিল্মের ভায়লেন্স ও দুর্গন্ধ সেক্স্‌ঠাসা ছবি দেখার জন্য উন্মাদ[২৪]। অতএব যৌনআবেদনপ্রধান বিজ্ঞাপন ছাড়া ভোগ্যপণ্যব্যবসায়ীদের আর উপায় কি!

মৃত্যুব্যবসায়ী ব্যাধিব্যবসায়ী কেমিস্টড্রাগিস্টদের কিন্তু ভোগ্যপণ্যের মতো মনভোলানো যৌনবিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না, কারণ এক্ষেত্রে মনোপলিস্টদের একনায়কত্ব এমনই দুর্ভেদ্য এবং প্রাণবাঁচানোর দায়ে খাদ্যের আগেও যেহেতু মানুষের ওষুধের প্রয়োজন বেশি তাই। ড্রাগ উৎপাদনের মনোপলি আমেরিকায় প্রায় মারণাস্ত্রের সমকক্ষ এবং শেরিং রবিন্‌স কার্টার মার্ক হোয়েখস্ট পার্ক-ডেভিস সিবা ফাইজার প্রভৃতি বড় বড় ড্রাগব্যবসায়ীরা কিভাবে কোটি কোটি

টাকার ড্রাগ উৎপাদনে পরিবেশনে মূল্যনির্ধারণে সর্বাত্মক কর্তৃত্ব করছে তার লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন কেফাউভের[২৫]। এই বিদেশী ড্রাগিস্টরা অনেকে আমাদের দেশে নানারকমের কোলাবোরেশন ও কম্বিনেশনের ভিতর দিয়ে বিশাল মনোপলির জাল বিস্তার করেছে এবং সম্প্রতি ভারতসরকার এদের আয়ত্তে আনার লোকদেখানো একটা চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু বিশেষ জুত করতে পারছেন না। অবশ্য এ প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য নয়, বিজ্ঞাপনই আলোচ্য। তাহলেও জানা দরকার যে বর্তমান মনোপলি বজায় রেখে ড্রাগমূল্য কনট্রোল করা অতীব কঠিন এমন কি প্রায় দুঃসাধ্য। বিজ্ঞাপনের ব্যাপার হল ড্রাগিস্টদের বিজ্ঞাপন প্রধানত মেইলিং স্যাম্পল detail men বা সেলস্ প্রতিনিধির উপর নির্ভর করে এবং বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য ডাক্তাররা, আদৌ রুগীরা নয়। মেইলিং স্যাম্পল প্রতিনিধিদের বেতন বিক্রেতাদের কমিশন ইত্যাদি খাতে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় তা বহন করে ক্রেতারা বা রুগীরা। যেমন Contac নামে একটি ড্রাগ চালু করার সময় আমেরিকান মালিকরা ১৩০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করেন[২৬]। কেফাউভের এরকম আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নামজাদা সব ড্রাগের উল্লেখ ক'রে যার অধিকাংশই অ্যান্টিবায়টিক্স ট্র্যানকুইলাইজার ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত। প্রচার ও বিজ্ঞাপন ও কমিশনের সঙ্গে মালিকের মুনাফা ধরলে অধিকাংশ ড্রাগের উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজারমূল্যের যে তফাৎ দাঁড়ায়, তা প্রায় পাঁচ পয়সার জিনিসের পাঁচ টাকা দামের মতো এবং তা শুধু মেইলিং বিজ্ঞাপনের বহর থেকে অনুমান করা যায়। যেমন আমেরিকার প্রত্যেক ডাক্তার প্রতিদিন প্রায় একপাউণ্ড ওজনের ওষুধের বিজ্ঞপ্তিপত্র পান এবং তাতে দেখা যায় যে বছরের শেষে আমেরিকার সমস্ত ডাক্তারের কাছে প্রায় ২৪০০০ টন কাগজ জমা হয়। শুধু একটিমাত্র শহরে ওষুধের বিজ্ঞপ্তিপত্র ডেলিভারি দিতে দুটি রেলরোডের সমস্ত মেইলগাড়ি লাগে, ১১০টি মেইলট্রাক লাগে এবং ৮০০ পোস্টম্যান লাগে। তারপর এই কাগজের স্তূপ সাফ করতে হলে অন্তত ২৫টা ট্র্যাশট্রাকের সাহায্য নিতে হয় এবং শেষকালে যদি এই বিজ্ঞাপনপত্রের আবর্জনা-স্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হয় তাহলে নাকি ৫০ মাইল দূর থেকেও তার শিখা দেখা যেতে পারে[২৭]। আমাদের দেশে কত দূর থেকে এই আগুন দেখা যাবে জানি না, তবে আমাদের অবস্থাও যে আমেরিকার মতো হয়ে উঠছে তাতে কোনো

সন্দেহ নেই। এখানকার যেকোনো ডাক্তারের চেম্বারে ক্লিনিকে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে নানারকম ওষুধের সার্কুলার ফোল্ডার ব্রশিয়ার ইত্যাদির স্তূপ কি পরিমাণ জমা হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে। ভারতবর্ষে কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯৬০০০, বর্তমানে অন্তত একলক্ষ২৮। এদেশের প্রত্যেক ডাক্তার যদি প্রতি মাসে অন্তত কম ক'রে তিন কিলোগ্রাম ওজনের ওষুধের বিজ্ঞাপনপত্র পান তাহলে মাসে তিন লক্ষ কিলোগ্রাম এবং বছরে ছত্রিশ লক্ষ কিলোগ্রাম অর্থাৎ ৩৬০০ মেট্রিক টন ওজনের কাগজপত্র জমা হয়। এই পরিমাণ বিজ্ঞাপনপত্র বিলি করতে কত মেইলট্রেন কত ট্রাক কত পোস্টম্যান লাগতে পারে বলতে পারব না, তবে একথা ঠিক যে এই আবর্জনাস্তূপে আগুন লাগালে তা পঞ্চাশ মাইলের অনেক বেশি দূর থেকে দেখা যাবে এবং সেই ভস্মস্তূপ দিয়ে হয়তো সিন্থেটিক্সজাতীয় পরিধেয় কিছু তৈরি হতে পারে, কিন্তু জমির সার হবে না, কেবল ড্রাগের সংখ্যা বাড়বে বিজ্ঞাপন বাড়বে ড্রাগের দাম বাড়বে যেমন প্রতিদিন বাড়ছে এবং কোটি কোটি লোকের অর্ধচিকিৎসায় বিনা-চিকিৎসায় মৃত্যু হবে।

ম্যানিপুলেটিভ ও কমব্যাটিভ বিজ্ঞাপনের, বিশেষ ক'রে ভোগ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনের, ইদানীংকালের যে প্রধান কৌশলের কথা আগে বলেছি অর্থাৎ সেক্স-ওরিয়েণ্টেশন, তা ছাড়া দ্বিতীয় কৌশল হল প্যাকেজ ডিজাইন অর্থাৎ ক্রমাগত প্যাকেজের ও ডিজাইনের পরিবর্তন। ভিতরে কি বস্তু আছে না-আছে সেটা বড় কথা নয়, কারণ বেচাবিদ্যাবিশেষজ্ঞরা বলেন যে প্যাকেজটাই নাকি আসল, তার ভিতরের বস্তুটা তেমন কিছু নয়। তা ছাড়া আরও একটা মস্তবড় জ্ঞানের কথা হচ্ছে কি, লোকে যে 'কেন' জিনিস কেনে সেটা নাকি একটা সাংঘাতিক রহস্যময় ব্যাপার যা নিয়ে গবেষণা করার জন্য কোম্পানির মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে বড় বড় মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী অ্যানালিস্ট ডিজাইনার প্রভৃতি মোটাবেতনে পুষে থাকেন। এহেন একজন উচ্চস্তরের গবেষক হলেন ল্যুই চেশকিন যাঁর বক্তব্য হল ভোক্তারা বা ক্রেতারা আসল জিনিসটা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কেবল ব্র্যাণ্ডের নাম জানে, ট্রেডমার্ক জানে আর লেবেল ও প্যাকেজ দেখে আকৃষ্ট হয়। তাঁর মতে একটা কোনো জিনিস ভাল মানে যে গুণের দিক থেকে ভাল তা নাও হতে পারে, আসলে চোখের দিক থেকে দেখতে ভাল। কাজেই বিজ্ঞাপনের নিয়মিত ব্রেনধোলাইয়ে যে কাজ হয় তা মানতেই হবে, কারণ চেশকিন বলেছেন যে দীর্ঘকাল তিনি প্রত্যক্ষ সামাজিক অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন যে লোকে বিজ্ঞাপনের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়, কিন্তু সেই

প্রভাব সম্বন্ধে তারা সচেতন নয় অর্থাৎ কতকটা অজ্ঞাতসারেই বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে যায়[২৯]। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনে কাজ না হলেই বা চলবে কেন, কারণ খাদক-সমাজে ক্রেতারা যদি একই জিনিস বেশি ক'রে না কেনে অথবা তার বিকল্প বহু জিনিস কিনতে আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ না করে, তাহলে প্রধানত অনাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনহার বজায় রাখা সম্ভব হবে কি ক'রে এবং তা না সম্ভব হলে মনোপলিস্টদের মুনাফার অঙ্কই বা মোটা হবে কি ক'রে! কাজেই মনোপলিস্টদের খাদকসমাজে কেবল খাদক নয়, রাক্ষস তৈরি করার প্রয়োজন, যারা কেবল খাইখাই চাইচাই করবে আর পরিতৃপ্তির কোনো দিগন্ত খুঁজে পাবে না[৩০]।

সুপারমার্কেট ডিপার্টমেন্টস্টোর চেইনস্টোর হায়ারপার্চেজ বা ধারেকিস্তিতে কেনা ইত্যাদি হল খাদকসমাজে খাদক ধরাব সুবিস্তৃত জাল এবং খাদকদের অতিভোজী গোগ্রাসীতে পরিণত করার টোপ। খাদকপতঙ্গ কিভাবে সুপার-মার্কেটের পণ্যজালের দিকে ধাবমান হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন বিখ্যাত মোটি-ভেশানাল অ্যানালিস্ট জেমস ভাইকেরি। যেমন সাধারণত দেখা যায় যে প্রতি মিনিটে স্বাভাবিক মানুষের চোখের পলক পড়ে বত্রিশবার, কিন্তু ভাইকেরি বলেছেন যে মানুষ যখন উত্তেজিত হয় তখন চোখের পলক মিনিটে পঞ্চাশ ষাট পর্যন্ত বেড়ে যায় এবং যখন শান্ত থাকে তখন কুড়ি পর্যন্ত কমে যায়। হাজার-ডলারি অ্যানালিস্ট ভাইকেরি তাই ফিল্মক্যামেরা নিয়ে মহিলা মক্কেলদের অনুসরণ করেন সুপারমার্কেটে। উদ্দেশ্য হল ভোগ্যদ্রব্যের হরেকরকমের প্যাকেজ কনটেনার কার্টন ও শোকেসের বাহার দেখে তাদের কিরকম উত্তেজনা হয় তারই স্টাডি করা, চোখের পলক গুণে। যেমন গবেষণাব বিষয়বস্তু তেমনি গবেষক। কিন্তু সে যাই হোক তবু ভাইকেরি ক্যামেরা ঘুরিয়ে চোখের পলক রেকর্ড করতে থাকেন এবং তাতে যা দেখেন তা নাকি ভয়ানক চমকপ্রদ। অর্থাৎ সুপারমার্কেটে প্রবেশ করার পরেই মহিলাদের চোখের পলক কমতে কমতে প্রায় চোদ্দতে নেমে আসে, যা স্বাভাবিক অবস্থার অনেক কম যেহেতু তখন ভদ্রমহিলারা নাকি হিপনটিক ট্র্যান্সের স্টেজে, যাকে সমাধিভাব বলে তাই।

এই হিপনটিক হতভম্বতার কারণ হল সুপারমার্কেট এমন সব জিনিসপত্রে ঠাসা থাকে যা নাকি কিছুকাল আগেও রাজারানীরা ছাড়া চোখেই দেখতে পেত না কেউ। অতএব মিসেস মিড্‌ল যাকে বলে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবাক-নির্বাক। তা ছাড়া হাজাবডলারি অ্যানালিস্ট একথাও বলেছেন যে স্টোরে ঢুকলে মনে হয় যেন প্রোডাক্টগুলো অর্থাৎ জিনিসপত্রগুলো চারিদিক থেকে চিৎকার ক'রে বলছে—আমাকে ছাখো আমাকে কেনো আমাকে কেনো অতএব তার জন্যও আরও মিসেস মিড্‌লদের চোখের পলক চোদ্দতে নেমে আসে, কিন্তু তারপর সমাধিঘোর ক্রমে কাটতে থাকে যত কেনা জিনিসগুলো ক্রমে চেকিংকাউন্টারে যেতে থাকে, তখন চোদ্দ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত পলক বেড়ে যায়, তারপর যখন ক্যাশডিপার্টমেণ্টের দিকে এগোয় তখন ঘনঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পলক বেড়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত ওঠে, কারণ কেনামালের দাম শোধ করার মতো ক্যাশটাকা নেই ক্রেতার কাছে[৩১]। বছর পনের ষোল আগে একবার বিখ্যাত ধনকুবের ডুপণ্টরা আমেরিকান গিন্নিদের সুপারমার্কেটে শপিংহ্যাবিট সার্ভে করেছিলেন এবং সার্ভেরিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বর্তমানে সুপারমার্কেটের ক্রেতাদের প্রধান বক্তব্য এই যে মাল যাই হোক বা যারই হোক যদি তা চোখে লাগে তাহলে মনে ধরবে এবং তখনই ক্রেতা বলবে I WANT IT এবং এই রিপোর্ট ২৫০ সুপারমার্কেটে ৫৩৩৮ জন ক্রেতার অভ্যাস দেখে লেখা হয়েছিল[৩২]। তবে মাল কেনা হল অথচ ক্যাশটাকা নেই তার জন্য চিন্তা নেই, কারণ খাদকসমাজে ক্রেডিটকিস্তিহায়ারপার্চেজ ইত্যাদির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে, কারণ ক্রেতাদের ক্রেডিট-কনডিশন্‌ড বা ঋণধাতস্থ করাও ব্যবসায়ীদের একটা চতুর কৌশল, যেহেতু তাতে খাদকসমাজের মধ্যবিত্ত পতঙ্গদের নিরন্তর আয় বাড়ানোর এবং তৎসহ ভোগ্যদ্রব্যের তালিকা বাড়ানোর ও তৎসহ সামাজিক স্টেটাস বাড়ানোর একটা সক্রিয় চেষ্টা থাকে। এবং যে চেষ্টা না থাকলে বর্তমান খাদকসমাজ থাকে না অথবা সাপ্লাই দ্বারা ডিম্যাণ্ড নির্ধারিত হয় না এবং তা না হলে আবার মনোপলি ক্যাপিটালের বর্তমান রাজত্ব বজায় থাকে না।

ক্রেতাদের হিপনোটাইজ করার, বিশেষ ক'রে মিসেস মিড্‌লদের বিমোহিত করার বড় কৌশল হল ভাল ডিজাইনের প্যাকেজ। একথা আমেরিকার প্যাকেজ ডিজাইন কাউন্সিলের একজন বড়কর্তা বেশ বড় গলা করেই বলেছেন এবং তাঁর মতে ভাল প্যাকেজের টোপ যেকোনো ধুরন্ধর ক্রেতাকেও গেলানো সম্ভব। অতএব ডীপ ইম্প্যাক্ট প্যাকেজ বা মর্মভেদী মোড়ক নিয়ে স্পেশালাইজ করার জন্য কালার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট আছে, যেখানে কোন্ শ্রেণীর ক্রেতার

৩১. Vance Parkard : *The Hidden Persuaders*, Ch 10—'Babes in Consumer-land'.

৩২. প্যাকার্ড, ঐ

কাছে কি ডিজাইনের কি রঙের প্যাকেজ সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে তাই নিয়ে গভীর গবেষণা করা হয় এবং লুই চেশকিন যাঁর কথা আগে বলেছি তিনি এই ধরনের গবেষকদের মধ্যে নামজাদা। চেশকিন বলেন যে শিক্ষা ও আয়ের দিক থেকে উন্নতশ্রেণীর ক্রেতারা হাল্কা ও নিউট্রাল রং পছন্দ করে বেশি এবং শিক্ষা ও আয়ের দিক থেকে যারা অনুন্নত তাদের কাছে উজ্জ্বল রঙের আকর্ষণ বেশি যেমন লাল গোলাপি ইত্যাদি[৩৩]। বস্তুত চেশকিন বিজ্ঞাপন-জগতের লেবেল প্যাকেজ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের সর্বক্ষেত্রে খুব বড রকমের বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। যেমন সাহিত্যসংস্কৃতিক্ষেত্রে তেমনি বিদ্যাবিদ্বানের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্যাকেজ ও তার ঔজ্জ্বল্যই আসল। যেমন বইয়ের মলাট, বিশ্ববিদ্যালয়েব ডিগ্রি যার যত বেশি ঔজ্জ্বল্য চমকপ্রদতা তার

শারদীয়া সংখ্যা

একাই একশো

দাম ৪·৫০ সডাক ৫·৪০

৮ জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের

৮ খানি উপন্যাস

অসংখ্য সিনেমার ছবি

৮টি গল্প ২টি রম্যরচনা

....

আমার প্রথম প্রেম

এ পর্যায়ে লিখেছেন

[সাতজন চিত্রতারকার নাম]

শারদীয় সংখ্যা

দাম চার টাকা

হিটলারের প্রেমিকা ও ছেলেমেয়েরা

এই প্রবন্ধে নাজি শাসকদের স্ত্রী প্রেমিকা রক্ষিতা ছেলেমেয়েরা যাঁরা আজও বেঁচে আছেন তাঁদের সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সংবাদ থাকবে।

'চুম্বনের' ওপর মতামত দিয়েছেন

অর্ধশতাধিক চিত্রতারকা

বিশেষ প্রবন্ধ

বিদেশী ছবিতে যৌন আবেদন
ইত্যালীয় চলচ্চিত্রে যৌন বিপ্লব
যৌন আবেদন সৃষ্টির রহস্য

এ ছাডাও

চিত্রতারকাদের গ্লামার অ্যালবাম

ভিতরের সারবস্তু তত কম, যদিও তাতে বাজারের চাকরির ও বিক্রির সুবিধে। তা ছাড়া ভোগ্যদ্রব্যের যৌনভাবপ্রধান বিজ্ঞাপনের মতো সহিত্যেরও বাজার-প্রিয়তা যৌনভাবপ্রাধান্যের উপর নির্ভরশীল হয়েছে অত্যন্ত উৎকটভাবে।

৩৩. প্যাকার্ড : ঐ পৃ ৯৫

সাহিত্যগ্রন্থ, বিশেষ ক'রে ক্রিয়েটিভ কথাসাহিত্য, এবং যে ক্রিয়েটিভ প্রত্যয়টি গত দুশোবছরের বুর্জোয়া ননসেন্স ছাড়া কিছু নয়, তার অনর্থক বিচারবিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই এখানে, প্রবৃত্তিও নেই, তবু সাহিত্যপত্রিকার বিজ্ঞাপনের একটু আভাস দিয়েছি এখানে। এগুলি বিজ্ঞাপনের মর্মলিপি কারণ হুবহু প্রতিলিপি আরও ভয়াবহ এবং শোনা যায় এইসব পত্রিকা, এবং পুস্তকও বটে, কেনার জন্য নাকি অনেক সময় পত্রিকাস্টলে ক্রেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়। বর্তমান খাদকসমাজের প্রভাবে বঙ্গদেশের পাঠকসমাজের এবং ক্রিয়েটিভ সাহিত্যিকসমাজের এই হাল, তাই বাকি কথা না বলাই ভাল। অন্তত আপাতত থাক।

টেকনোস্ট্রাকচারনির্ভর ধনতান্ত্রিক অ্যাফলুয়েন্ট সমাজের যখন এই অবস্থা, তখন অনেকেরই মনে হতে পারে সমাজতান্ত্রিক সমাজের গতি কোন্ দিকে, কারণ সেখানেও যখন বিজ্ঞানটেকনোলজিনির্ভর শিল্পায়নের প্রশ্ন আছে এবং ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়, তখন সেখানেও অ্যাফলুয়েন্ট সমাজের লক্ষণ কি দেখা দিতে পারে না অর্থাৎ খাদকসমাজের উপসর্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না কি? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর হল—না। প্রথম প্রাঞ্জল কারণ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজে মূলধনের ব্যক্তিগত বা একচেটে আধিপত্যের কোনো সুযোগ নেই এবং দ্বিতীয় কারণ হল সেখানে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের বিশেষ রীতি আছে, অন্তত উৎপাদনের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। সোভিয়েট ইউনিয়নেও নেই, চীনেও নেই। যদিও সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভুলত্রুটির জন্য এবং প্রশাসনবিভাগ পরিচালনদফতর ও শ্রমিককর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক যান্ত্রিক শাসকশাসিতের সম্পর্কে পর্যবসিত হওয়ার জন্য সেখানে একটা নতুন ধরনের শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে এবং তৎসহ পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক খাদকসমাজের উপসর্গও সেখানে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, তাহলেও আমেরিকান সমাজ ও সোভিয়েট সমাজের মধ্যে মৌল পার্থক্য অবশ্যই আছে, যা তার শোধনবাদী ভূমিকা সত্ত্বেও অস্বীকার করা যায় না[৩৪]। তবে এদিক দিয়ে চীনের সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষা এবং মাও-সে-তুঙের বৈপ্লবিক দূরদর্শিতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কনজিউমার বা ক্রেতা বা যারা সাধারণ মানুষ প্রধানত তাদের দিকেই সজাগ দৃষ্টি চীনের কমিউনিস্ট পরিকল্পকদের গোড়া থেকেই ছিল, যা সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক ও পার্টিপ্রধানদের ছিল না এবং ছিল না বলে বহু মারাত্মক ভুলের খেসারত দিতে দিতে সম্প্রতি তাঁরা কিছুটা

সচেতন হচ্ছেন[৩৫]। প্ল্যানপরিকল্পনার মধ্যে যে কেন্দ্রনির্ভর অচলতার সমস্যা সাধারণত দেখা দেয় তা চীনে খুব সহজ একটি উপায়ে সমাধান করা হয়েছে এবং সেটি হল উৎপাদন ও রিটেলিং বা খুচরোবিক্রির বাজারটাকে পাইকারি স্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা। চীনের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অন্তর্বানিজ্যের মন্ত্রকের কাজ হল পণ্য উৎপাদনকেন্দ্র বা কলকারখানার সঙ্গে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে সোজা কনট্র্যাকটের বা চুক্তির ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদকের সঙ্গে রিটেলারের যোগসূত্র সর্বদা রক্ষা করা। এই চুক্তি অনুযায়ী শুধু যে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় তা নয়, প্রতিটি দ্রব্যের কোয়ালিটি স্ট্যাণ্ডার্ড ডিজাইন প্যাকেজ ডেলিভারি এবং মূল্যও নির্ধারিত হয়, যার কোনোরকম এদিকওদিক হবার উপায় নেই[৩৬]। কাজেই চীনের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় সোভিয়েটের মতো ভেজাল ঢোকার সুযোগ হয় নি, যেহেতু গোড়া থেকেই চীনের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রনায়করা যথাসম্ভব ভেজালের প্রত্যেকটি রন্ধ্র বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাই আজ চীনে দেখা যায় যে ক্রেতা বা সমাজের মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুপাতে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ধনতান্ত্রিক খাদকসমাজের মতো বিপরীত ব্যাপার হয় না অর্থাৎ উৎপাদন বা সরবরাহের দ্বারা চাহিদা পরিচালিত হয় না[৩৭]। তাই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই, মাহাত্ম্যও নেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে, যা ধনতান্ত্রিক অ্যাফলুয়েণ্ট সমাজে এবং খাদকসমাজে আছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞাপন, বিশেষ ক'রে কম্‌ব্যাটিভ ও ম্যানিপুলেটিভ বিজ্ঞাপন, সামাজিক অপচয় ছাড়া কিছু নয়। বিপুল অপচয় যেমন—

বিজ্ঞাপন ও মনোপলি ক্যাপিটালের মায়াপুরী আমেরিকায় প্রতিদিন প্রত্যেক মানুষের কাছে অর্থাৎ খাদকসমাজের অধিবাসীর কাছে জমা হয় প্রায় ১০০ পাউণ্ড solid waste। যেমন আমেরিকানরা বছরে ৩০০০০০০ টন কাগজ ৪০০০০০০ টন প্ল্যাষ্টিক ৪৮০০০০০০০০০০ ক্যান অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে ২৯০ ক্যান ২৬০০০০০০০০০০ বোতল অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে ১৩০ বোতল বাতিল ক'রে দেয় ওয়েস্ট হিসেবে। তৎসহ আছে ৭০০০০০০ গাড়ি এবং ১৪২০০০০০০০ টন ধোঁয়া গ্যাস বাষ্প[৩৮]। এই ধোঁয়া গ্যাস বাষ্পের মিশ্রণে

যে স্মগ তৈরি হয় তার জমাটবাঁধা মেঘ, যা বর্ষার মেঘ নয়, মারাত্মক কার্বন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড ভারাক্রান্ত মেঘ আজ টোকিও নিয়ইয়র্ক ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি শহরের উপর থম্থম্ করছে, যার ফলে মানুষের দমবন্ধ হয়ে আসছে এবং শহর ছেড়ে প্রাণপণে ছুটছে মানুষ বাইরে যেখানে একটু নির্মল বাতাস একটু নির্মল আলো আছে প্রকৃতির ৩৯। কিন্তু কোথায় আলো কোথায় বাতাস যাতে মানুষ বাঁচতে পারে। কোথাও নেই। মুনাভার বিষে আলোবাতাস বিষিয়ে গেছে। মারণাস্ত্রের মুনাফা আর অনাবশ্যক ভোগ্যমালের মুনাফা যা একমাত্র বিজ্ঞাপননির্ভর। তাই আজ ধনতান্ত্রিক শহরে শহরে বাঁচার মতো আলো নিভে যাচ্ছে, বাতাস বিষিয়ে যাচ্ছে আর মুনাফা বাড়ছে বিজ্ঞাপন বাড়ছে।

এবং যেখানে আলো নিভুনিভু বাতাস বিষাক্ত, সেই ধনতান্ত্রিক খাদক-সমাজ সমগ্র মানবসমাজকে একটি বিশাল সেল্সম্যানের সমাজে পরিণত করেছে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ সেল্সম্যান, কেউ ভেজিটেবল বেচছে কেউ ভোগ্যদ্রব্য বেচছে কেউ সততা নিষ্ঠা বেচছে কেউ চরিত্র নীতি বেচছে কেউ বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা বেচছে। কেনাবেচামুনাফার বিপুল বাজারে প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে লোভনীয় প্যাকেজ হতে, আকর্ষণীয় লেবেল হতে, যার যার মালিকক্রেতার কাছে চড়াদামে বিকোবার জন্য। এবং প্রত্যেকেই বলছে 'আমাকে কেনো আমাকে কেনো'।

কলকাতার সমাজ

গ্যাসের আলোয় কলকাতা শহরে ভূতপ্রেতব্রহ্মদৈত্যরা বড় বড় বাড়ির ছাদের কার্নিসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায়। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। একশো বছর আগেকার কথা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাগরিক পরিপার্শ্ব তার চেয়ে আরও অন্তত একশো বছরের প্রাচীন। সুতানুটির এই প্রাচীন লোকালয়ে কেরোসিনের আলোয় তো বটেই, গ্যাসের আলোতেও ভূতপ্রেত থাকা আশ্চর্য নয়, এবং ঠাকুমাদের গল্পের আসরে শিশুমানস-চক্ষে তাদের যথেষ্ট জীবন্ত হয়ে ওঠার কথা। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে, আমাদের শৈশবেও এই ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্য বিশেষ কমেনি, বিশেষ ক'রে সার্কুলাররোডবেষ্টিত আদি কলকাতার বাইরে তো নয়ই! দক্ষিণে বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ, যে অঞ্চলে আমাদের আশৈশব কেটেছে অথবা পুবে শুঁড়া বা বেলেঘাটা, উত্তরে কাশীপুর, বরানগর দমদম প্রভৃতি অঞ্চলে দিনের আলোয় লোকজন তখন বেশি চলাফেরা করত এবং একজন পথিকের সঙ্গে অন্য একজন পথিকের দৈহিক ব্যবধান থাকত কয়েক গজ, নিকটবর্তী কাউকে ডাকতে হলে বেশ গলা চড়িয়ে ডাকতে হতো। উত্তর-দক্ষিণ-পুবে আজকের জমজমাট শহরতলিতে তখন গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রাম্যসমাজেরই প্রাধান্য ছিল। সন্ধ্যা হলে শহরের কর্মজীবনে প্রায় ছেদ পড়ত এবং দিনের যেটুকু কোলাহল তাও স্তব্ধ হয়ে যেত! এমন অনেকদিন হয়েছে, সন্ধ্যার পর কেরোসিনের আলোয় প্রায়ান্ধকার নির্জনতা থেকে ভূতপ্রেতের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে আমরা টিম্‌টিমে গ্যাসের আলোর সীমানায় কালীঘাটে ভবানীপুরে এসে পৌঁছেছি। এও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। খুব বেশিদিনের কথা নয়। তখন কলকাতা

শহরের মানুষ ভূতপ্রেতের ভয়ে দৌড়ে পালাত। এখন পঞ্চাশ বছর পরে, কলকাতায় মানুষের ভয়ে মানুষ দৌড়ে পালায়। তখন কেরোসিন ও গ্যাসের আলোয় কলকাতা শহর ছিল প্রায়ান্ধকার। এখন বৈদ্যুতিক আলোয় বাইরে কলকাতা শহর বিবাহবাসরের মতো উজ্জ্বল, ভিতরে গভীর অন্ধকার। তখন কলকাতার পথে চলমান পুরুষ পথিকদের পরস্পরের মধ্যে (মেয়েদের বাইরে চলাফেরা সামান্য ছিল) যে কয়েকগজ ব্যবধান ছিল, এখন পুরুষ-নারী কোনো পথিকের মধ্যেই আর সে-ব্যবধান নেই। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই কলকাতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দৈহিক দূরত্ব একেবারে কমে গিয়েছে, বাকি সমস্ত দূরত্ব বেড়েছে, যেমন মানসিক দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব। তখন ছিল নির্জনতার ভয়, এখন শুধু জনতার ভয়, ক্রুদ্ধ হিংস্র জনতার ভয়। কাজেই কলকাতা শহরের মানুষেরও সমাজের জীবনে যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন হয়েছে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বেশ দ্রুতগতিতে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

সামনের আর একটা দশক শেষ হলেই কলকাতা শহরের বয়স হবে পুরো তিনশো বছর। এমন কিছু প্রাচীন শহর নয়, তবে নগরবিজ্ঞানসম্মত 'আধুনিক' শহরের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচীন। যদিও মাত্র দশ পুরুষের বা জেনারেশনের শহর, পুরো চৌদ্দ পুরুষেরও নয়, এবং তার মধ্যে আমরা মাত্র শেষের দুই পুরুষের কথা বলছি। সামাজিক পরিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে এই শেষের দুই পুরুষের পরিবর্তনের গতি ও ছন্দ আগেকার আট পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুততালের, এবং তার মধ্যে গত এক পুরুষের অগ্রগতিকে প্রায় ঘোড়ার গ্যালপিং গতির সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার কাছে আগেকার অগ্রগতি মানুষের পায়ে-হাঁটা গতি ছাড়া কিছু নয়।

জঙ্গলজঙ্গলভর্তি কয়েকটি এদেশী গ্রামসন্নিবেশ থেকে কলকাতা শহরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয়েছে, বিদেশী ইংরেজ শাসকদের আমলে। অনেক বড় বড় জলাশয় ছিল কলকাতায়, পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল, বিশেষ ক'রে শহরতলি অঞ্চলে, এখন সেখানে লোকালয় গ'ড়ে উঠেছে, অনেকক্ষেত্রে বড় বড় স্কাইস্ক্রেপার। ঝোপঝাড় গাছপালা জঙ্গলও যা ছিল তাও সব নির্মূল হয়ে গেছে। তার বদলে কিছু কর্পোরেশনের গাছ গজিয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সেই সব গাছের রঙ সবুজ নয়, অনাদরে হলদে। সবুজ রঙ শহর থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন, এমনকি তৃণের সবুজ পর্যন্ত। তার ফলে চোখ দুটো প্রায় অন্ধ হবার উপক্রম। শহরে সভ্যতা প্রায় চশমা-সভ্যতা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, যেরকম দ্রুতগতিতে শহরে গোলমাল বাড়ছে, লাউডস্পীকার রেডিও হর্ন অটোর শব্দ, ট্রামবাসের শব্দ, স্কুটার মোটরবাইকের শব্দ, জনতার স্লোগানের শব্দ, নাচগানহল্লার শব্দ এবং সাম্প্রতিক বীরত্বব্যঞ্জক বোমাবাজির শব্দ, তাতে

নাকি ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ আগামী বছর পঁচিশের মধ্যে বড় বড় শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা একেবারে কালা হয়ে যাবে। সবুজের অভাবে অন্ধ এবং শব্দের দৌরাত্ম্যে কালা হয়ে যাবার পর, বাকি থাকে 'বোবা' হয়ে যাওয়া। তারও যে খুব বিলম্ব আছে তা মনে হয় না। প্রায় আমরা বোবা হয়ে গেছি। বাইরের জীবনের সকল রকমের বিকারে আমরা আজ প্রায় নির্বিকার। ন্যায় বা অন্যায় সমস্ত ব্যাপারেই আমরা বোবা। এই অন্ধ কালা ও বোবার পথে দ্রুত অগ্রগতি, পৃথিবীর অন্যান্য আরও অনেক বড় বড় শহরের মতো কলকাতা শহরেরও হয়েছে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, এবং সবচেয়ে বেশি হয়েছে গত কুড়িপঁচিশ বছরের মধ্যে। ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক শহর ব'লে, অন্যান্য স্বাধীন শহরের দিক থেকে কলকাতা কোনো ব্যতিক্রম নয় এবং হবার কোনো কারণও নেই।

নিসর্গের জঙ্গল নির্মূল ক'রে কলকাতা শহর জনতাজঙ্গলে পরিণত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'জনতারণ্য' বলেছেন—

ওই হে নগরী, জনতারণ্য শত রাজপথ গৃহ অগণ্য
কতই বিপনি কতই পণ্য কত কোলাহল কাকলি!
কত-না অর্থ কত অনর্থ আবিল করিছে স্বর্গমর্ত
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি—

বিশ শতকের গোড়ায় (১৯৩১) দেখা যায়, কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হয়েছে। দুশো বছরে পনের-বিশ থেকে দশ লক্ষ, তখনকার 'আর্বানাইজেশন' বা নগরায়নগতির বিচারে খুবই উল্লেখ্য অগ্রগতি, যদিও পাশ্চাত্ত্য শিল্পশহরের মতো কলকাতার পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি হয়নি, হয়েছে পরাধীন ঔপনিবেশিক শহরের মতো প্রশাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে, এবং খানিকটা নব্যশিক্ষাসংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে। তাহলেও বিশ শতকের গোড়ায় যখন দশলক্ষ লোকের শহরসংখ্যা সারা পৃথিবীতে ছিল মাত্র উনিশ-কুড়িটি, তখন কলকাতার একটা স্থান ছিল তার মধ্যে। নগরায়নের বর্তমান ত্বরিতগতির ফলে ১৯৭০ সালে পৃথিবীতে দশলক্ষাধিক লোকের শহরসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮২টির মতো এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে হবে ৫৬৪টির মতো, ঠিক দ্বিগুণ। এই গতি বজায় থাকলে, থাকবার কথা, বর্তমান শতাব্দীর শেষ দুই দশকের মধ্যে এরকম বড় শহরের সংখ্যা হবে ২২০০-মতো। তখন কলকাতা শহরের অবস্থা কি হবে তা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অনুমান করতেও আতঙ্ক হয়।

আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছর খুব বেশি সময় নয়। তা না হলেও, অদূর বা সুদূর কোনো ভবিষ্যতের কথাই আপাতত চিন্তা না করাই ভাল। কারণ বর্তমান সমাজের চালকশক্তির যে ঊর্ধ্বশ্বাস দিক্‌জ্ঞানহীন গতি, তাতে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা থাকবে, থাকলে তার কি রূপ হবে, অথবা আদৌ থাকবে কি

না, সে বিষয়ে পৃথিবীর বরেণ্য বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের মনে গভীর সন্দেহ জেগেছে। কাজেই কলকাতার ভবিষ্যতের কথা আপাতত চিন্তা না করাই ভাল। কলকাতার বর্তমান শহুরে সমাজের যে রূপের বিকাশ হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তা যে-কোনো চিন্তাশীল মানুষের মনকে মুশড়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯০১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে কলকাতার লোকসংখ্যা দশ লক্ষ থেকে বেড়ে পনের লক্ষের মতো হয়। তিরিশ বছরে পাঁচ লক্ষ লোকবৃদ্ধি বেশি নয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়ে সাত লক্ষের মতো, অর্থাৎ আগের তিরিশ বছরে যা বাড়ে তার চেয়ে দশ বছরে বাড়ে বেশি। এর একটা বড় কারণ হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মওকায় যা-হোক কিছু বাণিজ্য ক'রে দু'পয়সা মেরে নেবার প্রলোভনে, বাঙালীদের, বিশেষ ক'রে অবাঙালীদের, কলকাতা শহরে আগমন। কিন্তু ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে চার লক্ষ, ১৯৪২ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে আরও চার লক্ষ এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে আর দু'লক্ষ লোক বেড়ে এখন পৌর কলকাতার লোকসংখ্যা হয়েছে একত্রিশ-বত্রিশ লক্ষের মতো। ১৯৪১-৩১ সালের কুড়ি বছরেব মধ্যে নগরবৃদ্ধির গতি প্রায় স্থিতিশীল দেখা যায়, এবং ১৯১৯-৩১ সালের দশ বছরের মধ্যে এই গতি বেশ নিম্নমুখী। এর কারণ কি?

তাহলে কি বলতে হবে যে কলকাতার কলেবরবৃদ্ধির স্তর এমন এক চরম সীমায় পৌঁছেচে, যে পরে তার নিম্নমুখী গতিই সম্ভব? ঠিক তা নয়, কারণ কলকাতার লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দৈহিক আয়তন-বৃদ্ধিও হয়েছে, এবং এই প্রসারণের ফলে শহরতলি গ'ড়ে উঠেছে, তারপর অনেক শহরতলি পৌর এলাকাভুক্ত হয়েছে। কলকাতায় পৌর এলাকার লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার ক'মে যাওয়াব কারণ প্রধানত তিনটি: প্রথম কারণ, আসল কলকাতায় লোকবসতির চাপবৃদ্ধি, বাড়িভাড়াবৃদ্ধি ও স্থানাভাবের ফলে মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ শহরতলিতে ও শহরপ্রান্তে দূরে স'রে গিয়েছে, অনেকে বসতবাড়ি তৈরিও ক'রে নিয়েছে। বঙ্গবিভাগের পর ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৭০ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষের মতো যে পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাস্তু এসেছে, তাদের অধিকাংশই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং তার বেশ বড় একটা অংশ কলকাতার প্রান্তের ও নতুন শহরতলির বাসিন্দা। কলকাতার শাখা প্রশাখা বিস্তার ও প্রসারণ এই উদ্‌বাস্তুদের উদ্‌যোগেই বেশি হয়েছে এবং অবিন্যস্তভাবে হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, শহরতলির দূর প্রান্ত পর্যন্ত, এবং আরও দূরে অনেক অনেক উপনগর পর্যন্ত শহর থেকে লোকজন কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে, মোটরবাস ও বৈদ্যুতিক ট্রেনের সুবিধার জন্য। তৃতীয় কারণ, দুর্গাপুর চিত্তরঞ্জনের মতো নতুন শিল্পনগরাঞ্চল কলকাতা শহর থেকে

বেশ কিছু লোক আকর্ষণ করেছে এবং বাইরে থেকে আকৃষ্ট হয়ে কলকাতা শহরে যারা আসত তাদের কিছু অংশ নতুন শিল্পনগরকেন্দ্রে গিয়েছে। প্রধানত এই কয়েকটি কারণে আসল কলকাতায় লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমেছে ১৯২০-৫১ সালের মধ্যে, কারণ এই সময়েই বাইরের বসতিকেন্দ্রগুলি গ'ড়ে উঠেছে বেশি। তার ফলে বহু উপনগর প্রান্তনগর শহরতলি নিয়ে কলকাতার চারিদিক বেষ্টন ক'রে একটা নতুন নগরবিন্যাস হয়েছে, যাকে ১৯৫১ সালের লোকগণনায় 'কলকাতার নাগরিক জনকুণ্ডল' ('Calcutta Urban Agglomeration') বলা হয়েছে। কলকাতার বর্তমান নাগরিক অস্তিত্ব এই সমগ্র জনকুণ্ডল নিয়ে। কলকাতার 'মেট্রোপলিটন' অঞ্চল এর চেয়ে অনেক বড় অঞ্চল এবং অনেক বিক্ষিপ্ত গ্রামাঞ্চলও তার অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সুসংবদ্ধ জনগোষ্ঠী ('কমিউনিটি') বলতে যা বোঝায়, 'মেট্রোপলিটন' অঞ্চল ঠিক তা নয়। 'মেট্রোপলিটন' এলাকায় নানারকমের বিক্ষিপ্ত সমাজ-জীবনের একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিক বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার যে নাগরিক জনকুণ্ডলের কথা ১৯৫১ সালের সেন্‌সাসে বলা হয়েছে, তার সামাজিক রূপ স্বতন্ত্র, গ্রাম্য জীবনের স্পর্শ তার মধ্যে বিশেষ নেই, এবং তা আদৌ বিক্ষিপ্ত নয়, বেশ সুসংহত। ৭৪টি নগরাঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাব মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৭১ লক্ষ। কলকাতার ক্রম-প্রসার্যমান নাগরিক সমাজের আসল আওতা অথবা তার জনকুণ্ডলায়নের তাৎপর্য এবং প্রকৃত প্রভাব বিচারের দিক থেকে সাম্প্রতিক সেন্‌সাস কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত মনে হয়। আর একথা ভাবতে বাস্তবিকই আশ্চর্য লাগে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ছয়ভাগের একভাগ লোক, শতকরা ষোলজন, এই নগরাঞ্চলের বাসিন্দা এবং এই বিস্ফারিত নগরাঞ্চলেই কলকাতা শহরের বর্তমান সমাজ-জীবনের সমগ্রতা প্রতিফলিত।

কলকাতার পৌরাঞ্চলে যত লোক বাস করে, তার প্রায় দেড়গুণ বেশি লোক বাস করে এই নাগরিক জনকুণ্ডলে। তা ছাড়া এটাও লক্ষ্য করার মতো যে ১৯৫১৫৭ এর মধ্যে এই বিস্ফারিত নগরাঞ্চলের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার বছরে ২০%, কিন্তু কলকাতার পৌরাঞ্চলের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার হল ৭%। অর্থাৎ বিস্তৃত নগরাঞ্চলে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার কলকাতার পৌরা-ঞ্চলের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। ভাববার মতো ব্যাপার। কেন এ রকম অবস্থা, অর্থাৎ কলকাতাবেষ্টিত এই জনকুণ্ডলায়ন? এই লোকসমূহ কারা? কোথা থেকে এরা এল, কেন এল, কিসের মোহে এল, এবং কেনই বা কলকাতা শহরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে এ রকম চাকবদ্ধ জনবসতি গ'ড়ে তুলল? এমন কি তার জন্য আগেকার মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলোরও চেহারা একেবারে পাল্টে গেল? সাধারণভাবে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং জীবনভোগ ও

জীবিকার্জনের নাগরিক আকর্ষণের ফলে গত দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে যারা এসেছে তাদের একটা বড় অংশ ছাড়া এই জনকুণ্ড-লায়নের বিকাশে যারা সর্বাধিক সাহায্য করেছে, তারা পূর্ববঙ্গের বিয়াল্লিশ লক্ষ উদ্‌বাস্তুদের একাংশ ('বাঙলাদেশের' শরণার্থীরা নয়)। কলকাতা শহরের পঞ্চাশোত্তর কালের সমাজ-জীবনে এই জনকুণ্ডলের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা 'নাগরিক গ্রাম' ('Urban Village') এবং 'নাগরিক জঙ্গল' ('Urban Jungle') বলেন, কলকাতা শহরের চতুর্দিক আজ সে রকম শত শত 'গ্রাম' ও 'জঙ্গলে' ভরে গিয়েছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে বাস করে, মানুষের মতো নয়, জঙ্গলের জন্তুর মতো, তরুণতরুণী যুবকযুবতী বালকবালিকা মহানগরের মায়ামৃগের পশ্চাদ্‌ধাবন ক'রে ব্যর্থ হয়, এবং বুকভরা গ্লানি ক্ষোভ ও ক্রোধের বিষ শহরের জনস্রোতে ঢেলে দেয়। অধিকাংশ আমেরিকান শহর ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের শহরের মতো কলকাতা শহর আজ এই নাগবিক গ্রাম ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত, যে সামাজিক দৃশ্য পঞ্চাশ বছর আগে তো দূরের কথা, কুড়ি বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। নিম্নমধ্য ও দরিদ্রদের বসতিকেন্দ্রগুলি 'নাগরিক গ্রাম' যেখানে সর্বপ্রকারের বহিরাগত ও দেশান্তরিতদের বাস, এবং নানারকমের ক্রিমিনাল ও সমাজবিরোধীদের বাসস্থান হল 'নাগরিক জঙ্গল'। এই দুই নতুন সমাজের প্রসারের ফলে কলকাতার যে তিনস্তরবদ্ধ ট্রেডিশানাল শহুরে সমাজের গড়ন ছিল, অনেকটা সুনির্দিষ্ট গড়ন, তা বেশ খানিকটা তরলিত হয়ে গিয়েছে। প্রায় একপুরুষকাল আগে পর্যন্ত কলকাতার যে ধরনের বনেদী শহুবে সমাজের গড়ন প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল, তার রূপ ছিল কতকটা এইরকম: অভিজাত বাঙালী ও অবাঙালীদের সমাজ, বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সমাজ (প্রধান স্তর), তার মধ্যে অবাঙালী মধ্যবিত্তদেব একটি পৃথক উপস্তর, এবং অন্তরাল-সমাজ, যেখানে পর্দার অন্তবাল থেকে সমাজেব যাবতীয় দুষ্কর্ম ও দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হতো। এই তিনটি স্তরের সীমানাও ছিল নির্দিষ্ট, এবং সেই সীমানার মধ্যে যে-যার সামাজিক জগতে বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাত। বিভিন্ন সামাজিক স্তবের মধ্যে পারস্পরিক অনুপ্রবেশের কোনো সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কন্‌ট্রোল রেশনিং, কালোবাজার দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত বীভৎস হত্যাকাণ্ড, বঙ্গবিভাগজনিত লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তু, স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রকল্পজনিত বিপুল মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবদলের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে এমন একটা ওলটপালট হয়ে গেছে, তার সমস্ত স্তর ও মূল পর্যন্ত এমনভাবে ন'ড়ে উঠেছে, চিরায়ত নীতিবোধ মূল্যবোধ মানবিকতাবোধ এমন সজোরে ধাক্কা খেয়েছে, বিশেষ ক'রে ভাবপ্রবণ তরুণমনে, যে তাকে

গতানুগতিক 'পরিবর্তন' বা 'social change' না ব'লে একটা বৈপ্লবিক 'রূপান্তর' বলা যায়। স্বভাবতই তার দাপট ও ঝাপ্‌টা সবচেয়ে বেশি লেগেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও প্রধান শহর কলকাতার সমাজ-জীবনে।

কলকাতার অভিজাত সমাজের স্তর আগেকার বনেদী গণ্ডির সংকীর্ণতা অতিক্রম ক'রে আরও বৃহত্তর হয়েছে, নব্যধনিক ও হঠাৎ-অভিজাতরা এই স্তরের কলেবরবৃদ্ধি করেছেন, প্রধানত মুদ্রাস্ফীতির কালোটাকা, নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য ও মোটা বেতনের চাকরির কৃপায়। তাঁদের সামাজিক জীবনের ধারাও আর আগেকার মতো নেই। পাল্‌কি ও ঘোড়াগাড়ির যুগ থেকে তারা অটোমোবিলযুগে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাই তাঁদের 'মোবিলিটি' অনেকগুণ বেড়েছে এবং অনেকবেশি ছিমছাম ও দুরন্ত হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২১-২২ সালে কলকাতায় প্রাইভেট মোটরের ড্রাইভার ও ক্লিনারের সংখ্যা ছিল ৫১৪ জন, ১৯৩১-৩২ সালে ২১০০ (সেন্‌সাস রিপোর্ট অনুযায়ী)। ১৯৩১ সালের কলকাতার সেন্‌সাসেও দেখা যায় যে পাল্‌কির মালিক ও বেয়ারাদের সংখ্যা ছিল ১২৫০-র মতো এবং যদি পাল্‌কি পিছু চারজন বেয়ারা ধরা যায়, তাহলে অন্তত তিনশো পাল্‌কি চলত কলকাতায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৩১ সালে, যখন মোটরপ্রতি দু'জন ড্রাইভার ক্লিনার হিসেব করলে প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা ছিল একহাজারের মতো। বর্তমানে কলকাতায় প্রাইভেট অটোর সংখ্যা প্রায় সত্তর-আশীগুণ বেড়েছে এবং মোটর ও যান্ত্রিক বিবিধ অটোসংখ্যা দেড়লক্ষাধিক। কলকাতার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনবৃদ্ধির হার অনেকগুণ বেশি মনে হয়, যেন তিনচার দশকের মধ্যে আমাদের পাল্‌কি থেকে ক্যারেজে এবং ক্যারেজ থেকে যান্ত্রিক অটোর যুগে দ্রুত উত্তরণ হয়েছে। কলকাতার জীবনের গতি, সমাজের গতি, চলার গতি কয়েক দশকের মধ্যে প্রায় শতগুণ বেড়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, জলাশয়ের জল শুকালো, তার উপর শহর গড়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ও শুকালো। আমরা বলতে পারি, গোযান অশ্বযান থেকে অটোমোবিল সমাজের গতি যত দুরন্ত হলো, তত নাগরিক মানুষের গতির লক্ষ্য ও চলার লক্ষ্য গেল হারিয়ে। জীবনের ও সমাজের লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়ে গেল চলার আবর্তে। বেগের আবেগে যখন মানবিক ও সামাজিক সমস্ত আদর্শ মানুষের দৃষ্টিপথে প্রায় লুপ্ত তখন একটিমাত্র লক্ষ্য কলকাতার মধ্যগগনে দীপ্যমান, টাকার লক্ষ্য আর স্টেটাসের লক্ষ্য। যোব-চার্নকের আমল থেকে, অর্থাৎ কলকাতার জন্মকাল থেকে, এই অচঞ্চল লক্ষ্য ক্রমে উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং শহর ও শহুরে সমাজ যত বড় হয়েছে তত অন্যান্য লক্ষ্য ক্রমে ম্লান হয়ে গেছে। টাকা ক্ষমতা ও স্টেটাস অভিমুখে মনে হয় আজ যেন সমগ্র

নাগরিক সমাজ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। যেনতেনপ্রকারেণ টাকা চাই এবং তজ্জনিত ক্ষমতা ও সামাজিক স্টেটাস চাই। তাতে ব্যক্তিগতভাবে অনেকের লাভবান হবার কথা, যারা প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পারে তাদের তো অবশ্যই, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সমাজের সমূহ লোকসান হবার কথা, এবং কলকাতার নাগরিক সমাজের তাই হয়েছে ও হচ্ছে।

কলকাতার যে নবঅভিজাত সমাজের কথা বলছিলাম, তার দৃষ্টি যে এই লক্ষ্যের দিকেই দৃঢ়নিবদ্ধ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। আভিজাত্যের মানদণ্ড-গুলি পর্যন্ত বদলে গেছে। ভোগ্যপণ্যের বেহিসেবী ব্যক্তিগত বিলাসিতা তার মধ্যে অন্যতম। পোষা বেড়াল-বাঁদরের বিয়েতে লাখ টাকা উড়িয়ে দেওয়া, বাগানবাড়িতে বয়স্য বারাঙ্গনা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাজার হাজার টাকা ব্যয় ক'রে আমোদ করা, লক্ষ্ণৌ-বারাণসীর বাইজীর নাচের আসরে মোহর আর অলঙ্কার প্যালা দেওয়া, উৎসবপার্বণে বিবাহে শ্রাদ্ধে অকাতরে টাকা খরচ করা, দীনদরিদ্র অনাথ আতুর ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের ঘটা ক'রে দানধ্যান করা এবং দেশের 'দরিদ্রনারায়ণদের' ঢালাই খিচুড়ি ভোজন করিয়ে সেবা করা—এইসব অতীতের আভিজাত্যের নিদর্শন বর্তমান কলকাতায় দেখাও যায় না এবং এগুলি আর আভিজাত্যের লক্ষণ ব'লে গণ্যও হয় না। আধুনিক নাগরিক আভিজাত্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে তার সংযোগ কেবল আত্মপ্রচারের মাধ্যমে। তাই ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যের বৈচিত্র্য ও বিলাসিতা প্রদর্শনই আধুনিক আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অঢেল অনাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে আজকের সমাজ তাই পণ্যভোগীদের সমাজে ('কনজিউমার সোসাইটি') পরিণত হয়েছে। আধুনিক অভিজাতরা কলকাতার এই পণ্যভোগী সমাজের প্রসার ও পরিপুষ্টির সহায়ক। এই বিচিত্র পণ্যসম্ভার জৈবিক জীবনের প্রয়োজনে নয়, যান্ত্রিক স্টেটাসপ্রধান জীবনের প্রয়োজনে উৎপন্ন। অভিজাত ও বিত্তবানদের সঙ্গে সমাজের ঊর্ধ্বসোপানমুখী মধ্যবিত্তের (যাঁদের 'আপার-মিড্‌ল' বলা হয়) একাংশও আজ কলকাতার সমাজে কাঁধ মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। কলকাতা শহরের সর্বত্র আজ তাই এই ভোগ্যপণ্যের বিচিত্র বাজার এবং ততোধিক বিচিত্র ক্রেতাবিক্রেতায় ভরে গিয়েছে, যা একপুরুষ আগেও অভাবনীয় ছিল। সমস্ত কলকাতা শহরটা একটা বিশাল 'সুপার মার্কেটে' পরিণত হয়েছে এবং সেখানে বাজারের ও পণ্যের কত যে বৈচিত্র্য, কত রকমের যে ভেণ্ডার পেড্‌লার হকার দোকানদার তার হিসেব নেই।

কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্তের (মিড্‌ল-মিড্‌ল) বৃহত্তর অংশ অবশ্য প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত ও অবসন্ন! শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকলেই। অধ্যাপক শিক্ষক উকিল কেরানী দোকানদার শিল্পী সাহিত্যিক কেউ বাদ নেই।

মুদ্রাস্ফীতি বেতনবৃদ্ধি ভাতাবৃদ্ধি এবং তৎসহ অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের (অনাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের নয়) উৎপাদনহ্রাসের ফলে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির চক্রে তাঁরা নিয়ত ঘূর্ণায়মান। বিপুল নিম্নমধ্যশ্রেণী ('লোয়ার-মিড্‌ল'), যাঁরা ভদ্রলোক-শ্রেণীবাচ্য, তাঁরা ক্রমে নিম্নগামী হবার ফলে কিছুতেই আর তাঁদের ভদ্রলোকত্ব বজায় রাখতে পারছেন না। তাঁরাও জীবনসংগ্রামের এই চক্রবৎ আবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছেন এবং এই আবর্তনের যেন শেষ নেই মনে হচ্ছে। নিম্নমধ্য-বিত্তের বিশাল স্তর টুকরো টুকরো হয়ে ধ'সে পড়ছে এবং মহানগরের পাতালে অবস্থিত সুবিস্তৃত অন্তরাল-সমাজের অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে পূর্বোক্ত 'নাগরিক জঙ্গল' অঞ্চল যেমন প্রসারিত ও ঘনীভূত হচ্ছে, তেমনি 'নাগরিক গ্রামাঞ্চলের'ও ক্রমবিস্তার হচ্ছে।

এর মধ্যে কলকাতার অন্তরাল-সমাজের যে পরিবর্তন হয়েছে তা যুগান্তকারী বলা যায়। তার আকার ও ভূমিকা উভয়ই ভয়াবহ। খুনী চোর ডাকাত গুণ্ডা জুয়াচোর জালিয়াত জুয়াড়ী স্মাগলার বারাঙ্গনা, যেনতেন-প্রকারেণ দিনগুজরানের বিরাট দল নিয়ে বড় বড় শহরে অন্তরাল-সমাজ গ'ড়ে ওঠে এবং কলকাতা শহরেও গ'ড়ে উঠেছে। অসামাজিক অবৈধ পেশাজীবী ও বৃত্তিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক বেড়েছে, সামাজিক বৈধ বৃত্তির ক্রমিক সংকোচনের ফলে। তার উপর সর্বপ্রকারের সমাজবিরোধীদের ভূমিকারও বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। অন্তরালবর্তী সমাজ চিরকালই ছিল উপরের সমাজের তলায়, কিন্তু তা অন্তরালেই থাকত। গত পঁচিশ তিরিশ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তরকালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতার নরহত্যাতাণ্ডবের সময় থেকে, এই অন্তরালসমাজের প্রাধান্য বেড়েছে এবং তার সামাজিক গোত্রান্তর হয়েছে। তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাময়িক সুবিধাবাদী প্ররোচনা ও পোষকতার ফলে আজ কলকাতা শহরে এই অন্তরালসমাজ থেকে বিশালকায় এক 'মস্তানসমাজের' উদ্ভব হয়েছে। এই মস্তানরা আজ আর অন্তরালে চলাফেরা করার প্রয়োজনবোধ করে না, সমাজের প্রকাশ্য মঞ্চে বীর নায়কের মতো চলেফিরে বেড়ায় এবং অনেক ক্ষেত্রে 'সেভিয়ার' বা পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অসহায় মানুষের কাছে 'অবতারের' সম্মান পায়। তাদের দাবি অনুযায়ী নিয়মিত ভোগসেবা করতে না পারলে, স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। কলকাতার সামাজিক জীবনে (এবং বাংলারও) এই মস্তানশ্রেণীর সমর্যাদায় গভীর ও ব্যাপক অনুপ্রবেশ, ইদানীং-কালের সবচেয়ে উল্লেখ্য সামাজিক ঘটনা।

মানবসমাজের 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্রবিন্দু হল 'পরিবার' এবং 'পরিবারে'র কেন্দ্র হল 'বাসগৃহ'। কলকাতা শহরে সমাজের এই কেন্দ্রবিন্দু পরিবার

কিভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে নিদারুণ গৃহসংকটের ফলে, তার সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াসহ করুণ ধারাবিবরণ দিতে হলে একটি মহাগ্রন্থ রচনা করতে হয়। একটি ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তা নয়। এখানে অতিসংক্ষেপে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ ক'রে কলকাতার, বর্তমান রাজনৈতিক সংকট, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক বিপর্যয়, যুবসমস্যা ছাত্রসমস্যা প্রভৃতি যেকোনো সংকট ও সমস্যার সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত বিচারবিশ্লেষণ করতে হলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে প্রথমে পরিবারের দিকে এবং সেই পরিবারেব বাসগৃহের দিকে, যেখানে সামাজিক মানুষের প্রথম রূপায়ণ হচ্ছে জীবনের শৈশব কৈশোর ও যৌবনের পর্যায়ভেদে। সেদিকে তাকালে দেখা যাবে, বাইরে তার যতই ঝলমলে চেহারা হোক, ভিতরটা একেবারে ঝাঁঝরা এবং তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ।

কলকাতার বৃহৎ নগরজনকুণ্ডলের (urban agglomeration) বর্তমান (১৯৫১) জনবসতির ঘনতা হল প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১২৫০০, পৌরকলকাতায় আরও অনেক বেশি, পঞ্চাশ বছরে অসম্ভব বেড়েছে। এই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জনঘনতা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০৭ এবং ভারতের ১৮২। ১৯৫১ সালে কলকাতার পৌরাঞ্চলের জনঘনতা ছিল প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৭৪ হাজার, উন্নত অঞ্চলে একলক্ষাধিক, যার তুলনায় আমেদাবাদ শহরে ৫৭ হাজার, দিল্লী শহরে ৪১ হাজার এবং আমেরিকার বড় শহর নিউইয়র্কে ২৮ হাজারের মতো। সাধারণ গড়পড়তা জনঘনতা অবশ্য কলকাতার বিশেষ অঞ্চল বা ওয়ার্ড অনুযায়ী ধরলে যথেষ্ট কমবেশি হবে এবং ঘনতার এই তারতম্য বরাবরই অঞ্চলভেদে কলকাতায় ছিল, সব শহরেই থাকে। উত্তর পূর্ব দক্ষিণ কলকাতার অনেক অঞ্চলে জনঘনতা গড়ের তুলনায় অনেক বেশি, এবং গত দশ বছরের নতুন নতুন প্রান্তীয় শহরতলিতে তা প্রায় মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে বলা যায়। কলকাতা বোধহয় পৃথিবীর সমস্ত শহরকে আজ জনঘনতার দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে। পুরনো বসতির ঘনতা ও নতুন বসতি অনেক বেড়েছে, কিন্তু জনসংখ্যানুপাতে বাসগৃহের সংখ্যা বাড়েনি। তার ফলে বাসগৃহপ্রতি লোকসংখ্যা (প্রধানত পারিবারিক) অনেক বেড়েছে। তার ফলে নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন জল বিদ্যুৎ ড্রেন যানবাহন আবর্জনা ইত্যাদি। পরিসাংখ্যিক তথ্য দিয়ে এখানে তা বোঝাবার দরকার নেই, অনেকেই তা জানেন। শুধু এইটুকু বলা যায় যে এমন অনেক অঞ্চল আছে কলকাতায় যেখানে স্তূপাকার আবর্জনার দুর্গন্ধে প্রবেশ করা যায় না এবং দূষিত বায়ু সেবন ক'রে সেখানকার

লোকজনকে প্রতিদিন বেঁচে থাকতে হয়। গৃহ ও পরিবারের সমস্যা ও সংকট এক কথায় বলা যায় 'ভয়ংকর'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বছর পনের-ষোল আগে (১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত) শহরের গৃহসমস্যার একটা সমীক্ষা করেছিলেন, যা পরে আর করা হয়নি। সেই সমীক্ষায় দেখা যায়: শহরের শতকরা ২৮ জন লোক কাঁচাঘরে বাস করে, ২০ জনের মতো বাস করে হোটেলে মেসে দোকানে। এতে প্রায় অর্ধেক লোকের হিসেব পাওয়া গেল। শহরের শতকরা ৫৮টি পরিবার (ব্যক্তি নয়) একঘরের গৃহে বাস করে, ২০টি পরিবার দুইঘরের গৃহে। শতকরা প্রায় ৫০ অর্থাৎ অর্ধেক পরিবারের কোনো বৈদ্যুতিক আলো নেই, এমনকি পৃথক জলকলও নেই, ৭৭টি পরিবারের স্বতন্ত্র ল্যাট্রিন নেই, অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে যৌথ ব্যবহার-যোগ্য ল্যাট্রিন আছে আর ১০টি পরিবারের আদৌ কোনো ল্যাট্রিনই নেই, যত্রতত্র সেই সব পরিবারের নারীপুরুষদের দৈহিক মলমূত্রাদি নিঃসরণ করতে হয়, নারীপুরুষ যুবকযুবতী নির্বিশেষে। শতকরা ৫৪টি পরিবারের ব্যক্তিপ্রতি বাসের জায়গা হলো টেনেটুনে তিরিশ বর্গফুটের মতো। পরিবারের ব্যক্তি বলতে স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে যুবকযুবতী শিশু বৃদ্ধ সবই বোঝায়। চিৎ হয়ে শবাসনে শুয়ে থাকলে একজন মানুষের জায়গা লাগে কুড়ি বর্গফুটের মতো, আর জ্যান্ত মানুষের মতো একটু নড়লেচড়লে অথবা পাশ ফিরলে তিরিশ বর্গফুটের বেশি লাগে। এরকম কোনো পরিবারের লোকদের যদি রাতের ঘুমন্ত অবস্থার কথা ভাবা যায়, তা হলে চার-পাঁচজন ব্যক্তির হাত পা মাথা প্রভৃতি দেহাংশের পরস্পরসংলগ্নতা কিরকম জ্যামিতিক রূপ ধারণ করবে তা ফলিত গণিতবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানীরা শুধু এইটুকু বলতে পারেন, যে-শহরে (যেমন কলকাতায়) অর্ধেকের বেশি পরিবার এইভাবে বসবাস করে, সেখানে পারিবারিক জীবনে, নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে, যুবক-যুবতীর যৌনজীবনে চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে বাধ্য। কলকাতা শহরে সেই বিপর্যয় সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে, যদি না বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। আধুনিক নগরবিজ্ঞানীরা বড় বড় শহরে অ্যাপার্টমেণ্টগৃহের আধিক্য লক্ষ্য ক'রে বলেছেন যে এরকম পার্টিশনের মতো দেয়ালঘেঁষা ঘরে বাস করার জন্য নাগরিকদের পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের প্রাইভেসি বা গোপনতা ব'লে কিছু থাকছে না, কাজেই শহরের ঘরবাড়ির নতুন 'বায়ো-টেক্‌নিক' প্ল্যানিং করা উচিত, অর্থাৎ গৃহপ্রকল্পের যান্ত্রিক দিকের সঙ্গে জৈবিক দিকটার দিকেও নজর রাখা উচিত। কলকাতার গৃহপ্রকল্প প্রসঙ্গে সেকথা আপাতত অবান্তর ব'লে মনে হয়, কারণ যেখানে শতকরা দশটি পরিবারের ল্যাভেটরি ব'লে কিছু নেই, শতকরা সাতাত্তরটি পরিবারের বারোয়ারী

ল্যাভেটরি এবং স্নানঘর ও জলকল নেই অর্ধেকের বেশি পরিবারের, সেখানে পারিবারিক গোপনতা তো দূরের কথা, নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত প্রাইভেসিও নেই। জীবন যৌবন মানসম্ভ্রম সমস্ত কিছু এরকম পরিবেশে জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সম্ভ্রমবোধ পর্যন্ত ধুলোয় মিশে যায়।

এর সঙ্গে বস্তির কথা অন্তত উল্লেখ না করলে চিত্রটি সম্পূর্ণ হয় না। কলকাতায় প্রায় তিন হাজার বস্তি আছে, যেখানে এক লক্ষ নব্বুই হাজারের মতো পরিবার অর্থাৎ আট লক্ষ লোক বাস করে। বস্তিবাসী শতকরা দুটি পরিবারের পৃথক জলকল স্নানঘর ল্যাভেটরি আছে, বাকি আর কারও তা নেই। অর্থাৎ বস্তিজীবনকে একরকমের প্রকাশ্য বারোয়ারী জীবন বলা যায়, যেখানে জীবনের গোপনতা পবিত্রতা শালীনতা ব'লে কিছু নেই, এবং তা রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব না হয় এবং এরকম একটা অবস্থায় মানুষকে বসবাস করতে হয়, তা হলে কলকাতা শহরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, যুবকযুবতীর প্রেম ও যৌন-জীবন কেমন ক'রে সুস্থ থাকতে পারে ভাবা যায় না। সুস্থ না থাকাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি তার নিজের পথে নির্মম প্রতিশোধ নিতে বাধ্য। নিচ্ছেও তাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কলকাতায় আজ আর্থিক পেশা হিসেবে পতিতাবৃত্তি অবৈধ ও নিসিদ্ধ, কিন্তু রক্ষিতাবৃত্তিতে বাধা নেই। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২১ সালে কালকাতায় পেশাদার পতিতার সংখ্যা ছিল প্রায় ষোল হাজার, যখন কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষের মতো। এমনিতে কলকাতায় নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় অর্ধেক এবং পঞ্চাশ বছরে লোকসংখ্যা বাড়লেও পুরুষ-নারীর আনুপাতিক হার বিশেষ কমে-বাড়েনি। তার ফলে যৌনাকাঙ্ক্ষার অস্বাভাবিক চোরাগোপ্তা নিবৃত্তির পথ কলকাতায় বরাবরই বেশ প্রশস্ত। বর্তমানে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মদনভস্মের মতো 'বিশ্ব মাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে'র মতো ব্যাপার ঘটেছে। একদিকে গৃহসংকট, পারিবারিক সংকট, অর্থসংকট, অন্যদিকে কলকাতা শহর পণ্যবাজারে পরিণত হবার ফলে 'ফুল' (full) পতিতাবৃত্তি এবং তার চেয়ে অনেক বেশি 'হাফ্'-পতিতাবৃত্তি শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ হুতোমের ভাষায়, 'হাফ-গেরস্তর' সংখ্যা শহরে অত্যধিক বেড়েছে ও বাড়ছে। নিষিদ্ধ হবার ফলে, পতিতাবৃত্তি আদৌ কমেনি, আইনশৃঙ্খলারক্ষকদের আয় বেড়েছে মাত্র।

যে-শহরে অর্ধেকের বেশি পরিবারের একটি মাত্র বাসগৃহ এবং মাথাপিছু পঁচিশ-তিরিশ বর্গফুট শোয়াবসার জায়গা, তা ছাড়া জলকল আলোর অভাব, সেই শহরে পরিবারের নিজস্ব কোনো আকর্ষণশক্তি ব'লে কিছু থাকতে পারে না, তার বিকর্ষণশক্তি প্রবল হতে বাধ্য। আজকের কলকাতায় শতকরা প্রায় ষাটটি পরিবারের এই বিকর্ষণশক্তি বৃদ্ধির সামাজিক প্রতিফল কি হয়েছে?

প্রথমত, গৃহের বদলে বাইরের আকর্ষণ বেড়েছে, পাড়ায় পাড়ায় তরুণ ছেলেদের ষ্ট্রীটকর্ণার গ্যাঙ ও দল গ'ড়ে উঠেছে, চায়ের দোকানে, পানের দোকানে, ফুটপাথে, রাস্তার কোণে মোড়ে তরুণদের আড্ডার দল গ'ড়ে উঠেছে। ঘরের টান নেই, ঘরে জায়গাও নেই শোয়াবসার বা নিভৃতে কথাবার্তা বলার। কাজেই রাস্তা ও চায়ের দোকানই হয়েছে ঘর। এই সব আড্ডার দল যে কতরকমের রূপধারণ করতে পারে তা কলকাতার গত দশ বছরের ইতিহাস থেকে জানা যায়। নানারকমের 'ক্রাউডে'র বা জনতার ইন্ধন যোগায় এই সব দল, যেমন 'ওপ্‌ন ক্রাউড' 'ক্লোজ্‌ড ক্রাউড' 'বেটিং ক্রাউড' ইত্যাদি। যেকোনো সময়, যেকোনো উত্তেজনা-প্ররোচনায় এই সমস্ত হঠাৎ-জনতা স্থানীয় জীবনযাত্রা লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতে পারে। তার সঙ্গে রাজনীতির মশলা থাকলে, তার বিস্ফোরণশক্তি আরও মারাত্মক হতে পারে। কলকাতায় তাই হয়েছে এবং মূলত অধিকাংশ গৃহ ও পরিবারের বিকর্ষণশক্তি বৃদ্ধির ফলে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে বিকর্ষণশক্তি যে কেবল দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেড়েছে তাই নয়, সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারেও বেড়েছে, সামাজিক জীবনধারার ভোল বদলের জন্য।

পরিবারের টান কমে গেলে আরও অনেক রকমের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা কলকাতায় হয়েছে, এবং যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। শুধু ছাত্রদের কথা সামান্য একটু উল্লেখ করছি। ছাত্রসমস্যার কথা। এদিকে ঘরে বসে লেখাপড়া করার স্থানাভাব, অনুকূল পরিবেশের অভাব, আর্থিক অভাব অনটন তো আছেই। ওদিকে বিদ্যালয়ে ভীড়, ক্লাসে ভীড়, লেখাপড়া সেখানেও বিশেষ হয় না। তাতে বিদ্যালয়ের মালিক বা কর্তাদের অথবা শিক্ষকদের কোনো সমস্যা থাকে না, কিন্তু ছাত্রদের সমস্যা থাকে এবং সেটা খুব বড় সমস্যা, জীবনমরণ সমস্যা বলা যায়। 'পরীক্ষার' সমস্যা। কাজেই 'পরীক্ষা' নিয়ে ছাত্রবিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ছাত্র বা তরুণদের মধ্যে যেহেতু বাইরের সমাজের মতো শ্রেণীভেদ তেমন প্রকট নয়, তাই মুষ্টিমেয় ছাত্রগোষ্ঠীর বিক্ষোভ অনেক সময় ব্যাপক রূপ ধারণ করে। কলকাতার মতো শহরে এই ধরনের ছাত্রবিক্ষোভ বেশি হয় তার কারণ শহরই হলো সবচেয়ে বড় বিদ্যাকেন্দ্র এবং শহরের সামাজিক গড়নটাই আজকাল যে-কোনো ধরনের জনতাবিক্ষোভের অনুকূল। আর একথাও ঠিক যে জনতাচালিত বিক্ষোভ, তা যত ক্ষুদ্র জনতাই হোক, রীতিমত উচ্ছৃংখলতাপ্রবণ।

কলকাতা শহরের পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের এটা একটা খসড়া মাত্র। এই খসড়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ আশাভরসার কথা কিছু বলতে পারি নি, সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই। আশার কথা C. M. P. O. বলবেন,

C. M. D. A. বলবেন, রাষ্ট্রনেতারা বলবেন, রাজনৈতিক পার্টির নেতারা বলবেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের কোনো সূত্র অনুযায়ী আপাতত বর্তমান লেখকের পক্ষে কোনো ভরসার আভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতার পুনর্গঠন, অর্থাৎ সমস্ত ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে কলকাতা গড়াও সম্ভব নয়। নয়া-দিল্লীর মতো নয়া-কলকাতা শহর আর একটা গড়া যেতে পারে, কিন্তু তা গড়ার আগেই বৃহত্তর নগরজনকুণ্ডল কলকাতা শহব বেষ্টন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। কলকাতার সমাজে গত পঞ্চাশ বছরে অবাঙালীর প্রাধান্যও যথেষ্ট বেড়েছে, কাজেই বর্তমান কলকাতার সামাজিক দুর্গতির জন্য এবং জীবনের ধারা বদলের জন্য শুধু যে বাঙালীরাই দায়ী তা নয়, সকল শ্রেণীর অবাঙালীরা কম দায়ী ন'ন। ঔপনিবেশিক শহর কলকাতার মূল আর্থিক বৃত্তিগত যে চরিত্র, অর্থাৎ উৎপাদনবিমুখ চাকরি-বাণিজ্যগত চরিত্র, তারও রূপ বদলানো এখন অসম্ভব। তা হলে কলকাতা শহরেব ও তাব শহুরে সমাজের ভবিষ্যৎ কি? এ যুগের প্রসিদ্ধ নগরস্থপতি নগরবিজ্ঞানী ও নগবদার্শনিক ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। অবশ্য আমেরিকার বড় বড় শহর সম্বন্ধে তিনি কথাগুলি বললেও, কলকাতা শহরের ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক। রাইট বলেছেন: 'To put a new outside upon any existing city is simply impossible now. The carcass of the city is far too old, too far gone ···Hopelessly, helplessly, inorganic it lies there.' পুরনো শহরকে আর কোনোভাবেই নতুন রূপ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তার মৃতদেহ অনেককালের বাসি এবং তার বিকৃতিও ব্যাপক। কাজেই রাইটের ভাষায় 'decentre and reintegrate', বিকেন্দ্রীকরণ ও নবপূর্ণাঙ্গতা হবে ভবিষ্যৎ নগরপরিকল্পনার লক্ষ্য। রাইটের স্বপ্ন হল, ভবিষ্যতের শহর হবে 'Broadacre' শহব, যে-শহর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকবে অথচ কোথাও থাকবে না (' would be everywhere and nowhere') যে-শহর গ্রামের সঙ্গে বৈষম্যের দূরত্ব ঘুচিয়ে সমগ্র জাতির প্রতিমূর্তি হয়ে উঠবে, যে-শহরে প্রত্যেকটি মানুষ অখণ্ড মানুষ হবে, এবং নিরাপদে নিশ্চিন্তে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে ('each man will be a whole man, living a full life in security'), ভগ্নাংশিক জীবন কাটাবে না। কিন্তু তা করতে হলে তো সমগ্র সমাজের কাঠামটাও ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে গড়তে হবে। সেটা কে করবে?